আলবদর ১৯৭১

মুনতাসীর মামুন

'আলবদর এক বিস্ময়!' ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধে দায়ী জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মুখপাত্র *দৈনিক সংগ্রাম* প্রশংসা করে লিখেছিল। সত্যিই ছিল তারা 'বিস্ময়'। পৃথিবীর জঘন্যতম খুনি হিসেবে আলবদররা ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিয়েছে। ১৯৭১ সালে এক বিদেশী সাংবাদিক রায়ের বাজার বধ্যভূমি দেখে আলবদরদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, এরা মনুষ্যপদবাচ্য নয়।

আলবদররা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। গণহত্যা, ধর্ষণে অংশ নিয়েছে। নির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের রূপান্তরিত হয়েছিল আলবদর বাহিনী। আলবদর বিশেষজ্ঞ পাকিস্তানের মনসুর খালেদ লিখেছেন, এদের সংখ্যাছিল ৭৩ হাজার। ছাত্র সংঘের সদস্য ছাড়াও অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেকেই যোগ দিয়েছিল আলবদর বাহিনীতে। এদের প্রধান ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিজামী। উপ-প্রধান ছিলেন আলী আহসান মুজাহিদ। কাদের মোল্লা, কামরুজ্জামান–এরাও ছিলেন আলবদরদের নেতা। মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে এখন তাদের বিচার চলছে।

আলবদরদের ইতিহাস এতদিন ছিল রহস্যাবৃত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ঐতিহাসিক ড. মুনতাসীর মামুন সেই রহস্য উন্মোচন করেছেন। আলবদরদের উত্থান, কীর্তিকাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। বাংলা ভাষার আলবদরদের সম্পর্কে প্রথম বই *আলবদর ১৯৭১*। ইতিহাস পাঠ যে কতো রোমাঞ্চকর–এই গ্রন্থ পাঠে তা বোঝা যাবে।
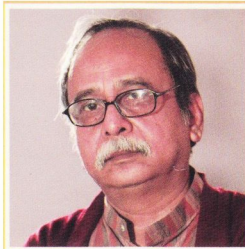
মুনতাসীর মামুনের লেখালেখি শুরু ছাত্রজীবন থেকে। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা ও গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অর্জন করেছেন পিএইচ.ডি। বর্তমানে সেই বিভাগের অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গ, ঢাকা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। বর্তমানে দেশে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ভাষ্যকার হিসেবে হয়ে উঠেছেন অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুশোরও বেশি। যার মধ্যে উলেখযোগ্য ১৪ খণ্ডে উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা, কোই হ্যায়, দুই খণ্ডে ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, পাকিস্তানি জেনারেলদের মন, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ১-২ মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি।

গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখ্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৯৩) ও একুশে পদক (২০১০)।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই!
আমারবই.কম

আলবদর : ১৯৭১

আলবদর : ১৯৭১

মুনতাসীর মামুন

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

আলবদরদের হাতে শহীদ
বুদ্ধিজীবীদের

আলবদর : ১৯৭১

আলবদর : ১৯৭১

মুনতাসীর মামুন

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

আলবদরদের হাতে শহীদ
বুদ্ধিজীবীদের

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের কতগুলো বিষয় আছে যা সম্পর্কে বিস্তারিত গ্রন্থ আজও লেখা হয়নি। এগুলো হলো–মুক্তিফৌজ, রাজাকার, আলবদর, শান্তিকমিটি, বীরাঙ্গনা ইত্যাদি। বিভিন্ন বিবরণে এদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ কোথাও নেই। অবশ্য, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এসব বিষয়ে তথ্যেরও নিদারুণ অভাব।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার সময় এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। পরে এক সময় নিজেই উদ্যোগ নিই এসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনার। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দু'টি বিষয়ে আমার লেখা দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে–*শান্তি কমিটি ১৯৭১*, *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*। আলবদর নিয়ে তথ্য ছিল কম। হঠাৎ মনসুর খালেদের বইটি পেয়ে মনে হলো–এ বিষয়ে একটি বই রচিত হতে পারে। আলবদর বাহিনী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। আলবদরদের সদস্যরা নিজেদের সম্পর্কে তথ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে বিনষ্ট করেছে। এদের একটা অংশ যারা সাধারণ সদস্য ছিল, ১৭ ডিসেম্বর তারা সাধারণের ভিড়ে মিশে গেছে। অন্য এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। কিছু আলবদর বিদেশ চলে গেছে। এইসব আলবদররাই পরে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি গড়ে তোলে ১৯৭৫ সালের পর।

মূলত সেলিম মনসুর খালেদ গ্রন্থ এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে *আলবদর ১৯৭১* রচিত হলো। এ বাহিনীর হিংস্রতা ছিল তুলনারহিত। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ রূপান্তরিত হয়েছিল আলবদর বাহিনীতে, তাদের সঙ্গে ছিল কিছু অবাঙালি ও স্বাধীনতা বিরোধী অন্যান্য দলের যুবকরা। পাকিস্তানী বাহিনীর অধীনে ছিল এরা। অপারেশন চালাবার সময় পাকিস্তানী কমান্ডারের আদেশ তাদের মানতে হতো কিন্তু মূলত স্বশাসিত বাহিনী হিসেবেই এরা কাজ করেছে। আজকে যাদের বিচার হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাদের সিংহভাগ ১৯৭১ সালে ছিলেন আলবদর কমান্ডার।

আলবদর বাহিনী পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করলেও তাদের নির্দিষ্ট একটি লক্ষ ছিল বাঙালি পেশাজীবীদের হত্যা। পাকিস্তানী বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার অংশ ছিল তা। ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহ তাদের এই হত্যাকান্ড তুঙ্গে ওঠে। শাদা পায়জামা পাঞ্জাবী, মুখে মুখোশ বা রুমাল বাঁধা–এই ছিল তাদের ইউনিফর্ম। মাইক্রোবাস, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জিপ ও তৎকালীন ইপিআরটিসির বাস নিয়ে তারা প্রতিরাতে বেরিয়ে পড়ত, নিজামী বা মুজাহিদের নির্দেশে। পদের ধরে নেয়া হতো তাদের প্রধানত রায়ের বাজার ও মিরপুর নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করে আশেপাশের জলায় ফেলে দেয়া হতো। একজন বিদেশী সাংবাদিক ১৬ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের জলাভূমিতে শতশত মৃতদেহ দেখে মন্তব্য করেছিলেন–"Its not only utterly shocking but we

are ashamed that we belong to human race which is capable of doing this." তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে লেখা হয়েছিল, এদের ক্ষেত্রে যেন জেনিভা কনভে শন প্রয়োগ করা না হয়। এরা মানুষ নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার পর একটি যথার্থ কাজ করেছিলেন তা হলো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন। জামায়াতে ইসলাম ও ইসলামী ছাত্রসংঘ শুধু ধর্মভিত্তিক দল ছিল না এ দু'টি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের খুনী-ধর্ষকদের দল। ১৯৭২ সালে সংবাদপত্রগুলি আর কোনো শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে না পেয়ে এদের ফ্যাসিস্ট হিসেবে সবসময় উল্লেখ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকলে আজ আর অবস্থা ১৯৭১ সালের মতো হতো না।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা লে. জে. জিয়াউর রহমান আলবদর বা জামায়াতীদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। শুধু তাই নয়, যে সব আলবদর, জামায়াতী জেলে ছিল তাদেরও মুক্তি দেন। এ ভাবে বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আলবদর বন্ধু হিসেবে। কতোটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে, কতোটা বিকৃত রুচির হলে, কতোটা ক্ষমতালোভী হলে এ ধরনের কাজ করা যায় তা অনুমেয়।

আলবদর বন্ধুর সহায়তা পেয়ে বড় আলবদর যেমন, নিজামী, মুজাহিদ, কামারুজ্জামান প্রভৃতি পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরতে থাকেন এবং আবার জামায়াতী ইসলামীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইসলামী ছাত্রসংঘের নাম বদল করে ইসলামী ছাত্র শিবির রাখা হয়। কেননা ছাত্রসংঘতো আলবদরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এসব অনেক ইতিহাস ছিল অজানা। এখনও বলা যেতে পারে আলবদরদের সম্পর্কে এক দশমাংসও জানা যায়নি। পরবর্তীকালে হয়ত কখনও বিস্তারিত ভাবে এর ওপর লেখা হবে। আমি আপাতত হাতের কাছে যেসব উপাদান পেয়েছি তা দিয়েই *আলবদর ১৯৭১*-এর কাঠামো নির্মাণ করেছি। কিছু উপাদান সংগ্রহে অপার সাহায্য করেছেন জনাব মতিউর রহমান, তবে, আলবদরদের সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত প্রতিবেদনটি তৈরির যাবতীয় প্রশংসা প্রাপ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের যা পরে পরিণত হয় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বইটির কিছু অংশ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে তা ছাপার জন্য জনাব তোয়াব খান ও শ্রী স্বদেশ রায় ধন্যবাদাহ।

এই সব ঘাতকদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে আমরা সক্রিয় ছিলাম। অবশেষে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলে ঘাতক আলবদরদের বহু প্রতীক্ষিত বিচার শুরু হয়। এই বই প্রকাশিত হওয়ার সময় হয়ত দুই একজনের বিচারের রায় হয়ে যাবে। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে রায় কার্যকর হওয়ার জন্য। আমরা সৌভাগ্যবান যে জীবিত থাকাকালীন আলবদরদের বিচার দেখে গেলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইতিহাস বিভাগ
২০১৩

মুনতাসীর মামুন

সূচিপত্র

আলবদরের ইতিহাস

আলবদর এখনও আছে

গোলাম আযমের মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়ে বহুদিন পর আলবদর প্রসঙ্গটি উঠে এল। আলবদর কী তা আমাদের জেনারেশনকে বোঝাতে হবে না। আলবদর মানেই নিষ্ঠুর মৃত্যুদূত। আমার শিক্ষকদের হত্যা করেছিল আলবদররা। এই একটি বাক্যই বলে দেয় আলবদরদের চরিত্র।

আমাদের অনেকের ধারণা, ১৯৭১ সালেই ১৬ ডিসেম্বরের পর আলবদররা হয়ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বা ভুল বুঝে স্বাভাবিক জীবন পালন করছে। এটা স্বাভাবিক যে এদের একটা অংশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত। গত শতকের আশির দশকে আলবদরদের পৃষ্ঠপোষক জেনারেল জিয়ার সময় জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির [পূর্বতন ছাত্রসংঘ] যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি শুরু করে তখন নতুন একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে। তা হলো রগকাটা। এরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরে পায়ের রগ কেটে দিত। এই যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার চেষ্টা এটাই বাংলাদেশে রগকাটা রাজনীতি হিসাবে পরিচিত। তখন, আমাদের অনেকের ধারণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের তরুণ আলবদররা নতুন এই জেনারেশনকে শিবিরের মাধ্যমে এই টেকনিক শিক্ষা দিয়েছিল।

সেই সময় যারা আলবদরের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা এখন আমাদেরই বয়সী, ষাটোর্ধ। এরা নিষ্ক্রিয় নয়। এরা সক্রিয় এবং তাদের আলবদরীয় আদর্শ জামায়াত-শিবিরের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জামায়াত-শিবির এখন আলবদরদের প্রকাশ্য ফ্রন্ট। এই ধারণা দৃঢ় হওয়ার একটি কারণ, পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি বই *আলবদর*।

শাহরিয়ার কবির পাকিস্তানে যখন নির্মূল কমিটি গঠন করেন তখন এই বইটি নিয়ে আসেন। উর্দুতে বইটি লিখেছেন সেলিম মনসুর খালেদ। পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন পরিচিত জমিয়তে তুলাবা পাকিস্তান নামে। তাদের প্রকাশনা 'তালাবা' বইটি প্রকাশ করে খুব সম্ভব ২০০৩ সালের পর। খুব সম্ভব ২০১০ সালের আগে। শাহরিয়ার যে বইটি এনেছে তা চর্তুদশ মুদ্রণ। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইটির মুদ্রণ সংখ্যা ১৩৭০০ কপি।

মনসুর ঢাকায় আসেন ২০০২ সালে। খুবই স্বাভাবিক। জামায়াত ইসলাম তখন ক্ষমতায়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জামায়াত কখনই কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার স্বাদ পায়নি। বাংলাদেশে পরাজিত শক্তি হওয়া সত্ত্বেও বেগম খালেদা জিয়া তাদের ক্ষমতায় আনেন। এদিক থেকে বিচার করলে, বেগম জিয়াও বাঙালিদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন।

মনসুরের বই পড়েই জানতে পারি আলবদররা এখনও বেঁচে বর্তে ভালোই আছে। তাদের আদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত হয়নি। মনসুর ঢাকায় এসে আলবদরের সাহায্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান, একজন আলবদর আফশোষ করে তাকে বলেছেন, 'জাতি এসব আত্মত্যাগীদের স্বীকার পর্যন্ত করে না। মুসলিম উম্মাহ এর মর্যাদা বোঝেনি। আমরা ঘরের মধ্যে [বাংলাদেশে] অগন্তুক আর পাকিস্তানে ভিনদেশী।'

মনসুরকে বিভিন্ন আলবদরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। আলবদরদের নেতা বা সুপ্রিম কমান্ডার নিজামী তখন মন্ত্রী। ফলে, পুরনো আলবদরদের নেটওয়ার্ক সক্রিয় করে তোলা হয় এবং তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। মনসুর স্থানীয় অনেক আলবদরের নাম উল্লেখ করেছেন। এগুলি ছদ্মনাম কী না জানি না তবে, কিছু নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত। আলবদর গঠন প্রক্রিয়া থেকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে। কোথাও কোথাও তথ্যে গরমিল থাকলেও আলবদরদের কার্যকলাপ তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তারা মনে করেন, আলবদররা জিহাদী। যে সব আলবদর মারা গেছে তারা শহীদ। যারা বেঁচে আছেন তারা গাজী। আর মুক্তিযোদ্ধারা এখনও তাদের কাছে 'দুষ্কৃতিকারী'।

মনসুর ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে আলবদরীয় ঘটনাগুলো উল্লেখ করতে চান যাতে নতুন কর্মিরা একনিষ্ঠভাবে জামায়াত করতে এবং আলবদর হতে উদ্বুদ্ধ হয়। তার আফশোষ, '১৯৭১ সালের এসব শহীদানের ও গাজীগণের নাম পাকিস্তানে আলোচনা করা কেউ পছন্দ করে না। এরাতো আমাদেরই ছিলেন যারা পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ বনানী ও নদনদীতে বুকের তাজা রক্ত উপহার দিয়েছেন। সেই তরুণ আমাদের জাতীয় সত্বারইতো অংশ ছিল।'

মনসুর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 'বাংলার সাংবাদিক, আইনবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনীতিক মহলের সঙ্গে বিস্তারিত দেখা সাক্ষাত করেছি। এর ফলে আলবদরের লক্ষ্যসমূহ আরো নিঁখুতভাবে উঠে এসেছে। এ ছাড়াও আলবদরের মুজাহিদদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।'

সুতরাং ধরে নেয়া যায়, আমার, আপনার আশেপাশেই আলবদর ও তার সাথীরা অপেক্ষা করছে। তারা ভাবেনি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। তাই এখন তারা খানিকটা শঙ্কার মধ্যে আছে এবং তাই এই বিচার প্রক্রিয়া বানচালের জন্য তারা নানা ষড়যন্ত্র করছে। সরকারের শৈথিল্য তাদের এ সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা শুধু অপেক্ষা করছে সরকার পতনের বা বিচার বানচালের। তারপরই আপনারা আপনাদের দোরগোড়ায় তাদের দেখতে পাবেন।

মুক্তিযুদ্ধ কী?

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা ছিল জামায়াত বা আলবদরদের জেহাদ। মনসুরের বইতে এ বিষয়টিই উঠে এসেছে।

আলবদর গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ অব্দি ঘটনা প্রবাহের বিবরণ। আমরা ভালোভাবেই জানি তখন কী ঘটেছিল। কিন্তু আলবদরদের ভাষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের আমাদের সম্পর্কে যে পূর্ব ধারণা ছিল আলবদরদের ধারণাও অবিকল একই রকম। মূল জিনিসটা এরকম যে, বাঙালিরা সম্পূর্ণ মুসলমান নয়। তারা হিন্দু ভারত দ্বারা প্রভাবিত। বাঙালি মুসলমান হলো তারা যারা মুসলিম লীগ বা জামায়াত সমর্থক এবং যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে 'হিজরত করে পশ্চিম পাকিস্তান এসেছে' তারাই 'সাচ্চা পাকিস্তানী বাঙালি।'

মনসুর মনে করেন, বাঙালিরা মূর্তি পূজক। বাংলাদেশের 'লোকেরা উর্দু মানে না, আর বাংলাভাষায় ধর্মীয় সাহিত্যের অভাব এবং হিন্দু সাংস্কৃতিক সমাজতন্ত্র' প্রভাব বিস্তার করে আছে। শুধু তাই নয়, মনের দিক থেকে বাঙালি মুসলমান তরুণ ও হিন্দু তরুণদের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। যে সব মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারাও ছিল হিন্দু মেয়েদের মতো।

বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী মনে করতেন, বাঙালি ছাত্রদের ওপর ছিল হিন্দু শিক্ষকদের প্রভাব। সে কারণে তারা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। আলবদর সমর্থক মনসুরও তাই মনে করেন।

আওয়ামী লীগের কারণে, জানিয়েছেন মনসুর, বাঙালিরা মনে করতে লাগলেন যে, রামমোহন রায় তাদের 'জাতীয় বীর' আর 'হিন্দু সংস্কৃতির পুর্নজন্মদাতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে গেলেন 'জাতীয় কবি'। অর্থাৎ লড়াইটা ছিল মূলত 'সাচ্চা মুসলমান' পাকিস্তানীদের সঙ্গে ভারতের এজেন্ট হিন্দু ভাবাপন্ন বাঙালিদের।

পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে মনসুর উল্লেখ করেছেন, বাঙালিরা বিহারি 'হত্যা' শুরু করে। আলবদররা তাই মনে করে।

তবে, অসতর্ক মুহূর্তে মনসুর উল্লেখ করেছেন, টিক্কা খানের বরাত দিয়ে যে, ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের আর্মি অ্যাকশানের প্রস্তাব ভুট্টো তাকে দিয়েছিলেন।

ভারত তো জন্ম থেকেই পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা করছিল। মনসুরের ভাষায়, ১৯৬৮ থেকেই পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য 'এজেন্টদের' ভারত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছিল। ১৯৭০ সালের শেষ থেকে ১৯৭১ সালের শুরুতে 'খোলামেলাভাবে তারা কাজ শুরু করে দেয়।'

আলবদররা মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যে সব তথ্য যোগাড় করেছিল সে অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীর ছয়টি সংগঠন ছিল–

১. মুক্তিবাহিনী (সাবেক ফৌজ, পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও হিন্দুস্তান আর্মির রেগুলার এজেন্ট)।
২. মুজিব বাহিনী (আওয়ামী লীগের বাঙালি, হিন্দু ও কমিউনিস্ট)
৩. আর্মডও গ্রুপ ও
৪. গুজব রটনাকারি গ্রুপ।

এ ছাড়া আরো দু'টি শাখা ছিল মুক্তিবাহিনীর–

১. মহিলা মুক্তি গ্রুপ ও
২. সায়েন্টিফিক গ্রুপ।

এবার মহিলা মুক্তি গ্রুপ সম্পর্কে আলবদরীয় ব্যাখ্যা শুনুন–

'এর বেশির ভাগ ছিল হিন্দু ছাত্রী। এরা আওয়ামী লীগ সমর্থন করত। এদের কাজ ছিল মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা সহজ করার জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাহায্যকারীদের কয়েক মুহূর্তের জন্য আত্মভোলা করে রাখার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।' মনসুর যা বলতে চাচ্ছেন, তা হলো, এরা পাকিস্তানীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে গোপন তথ্য উদ্ধার করত। তার ভাষায়, প্রাচীন আমল থেকেই প্রসটিটিউশন এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত ও মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের থেকে তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গোপন তথ্য উদ্ধার ও অতর্কিত শিকার করার চেষ্টায় থাকত।'

আর সায়েন্টিস্টিক গ্রুপ? এরা বিজ্ঞানের ছাত্র। সীমান্তে হিন্দুত্ববাদী আর এসএসের সাহায্যে 'এমন ধ্বংসাত্মক যন্ত্রচালিত জিনিষ তৈরি করত যেগুলি ধ্বংসের সাথে সাথে আশেপাশের এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ত।'

তার মতে, মুক্তিবাহিনী আসলে রাজনৈতিক কর্মী বা বাঙালিদের কোনো সংগঠন ছিল না। ভারতীয় সৈনিক, রুশ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থক তরুণ, আর এস এস প্রভৃতির 'সমন্বিত বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী।'

যুদ্ধের খুব একটা বর্ণনা দেননি মনসুর। উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তানীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরনো আমলের। পুরনো আমলের কিছু বিমান ছিল যার মধ্যে একটি ছিল নষ্ট

আর ভারতীয় বিমান বাকীগুলি ধ্বংস করে দেয়। তবে, পাকিস্তানী অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৩০টি বিমান ভূপাতিত করে। এটি আবার এক পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকীর মত। অথচ, আমরা জানি, এখানে একটি ভারতীয় বিমানও ভূপাতিত করা যায়নি। মনসুর জানিয়েছেন, 'আমাদের এই প্রতিরক্ষা পুঁজিতে ৭৩ হাজার রাজাকার, স্কাউট প্রভৃতি নিয়ে সেনা টিম মোতায়েন ছিল।'

এই ইতিহাস পড়ে বোঝা যায়, পাকিস্তানী মন কীভাবে কাজ করে এবং ইতিহাস সম্পর্কে তাদের ধারণা কী। শাহরিয়ার আমাকে জানিয়েছেন, পাকিস্তানে এখন ইতিহাস পড়ানো হয় না। এর একটা কারণ বোধহয়, নিজেদের মনমতো ইতিহাস সৃষ্টি করা। ইতিহাস না জানলে একটি জাতি কী রকম সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, উগ্র জঙ্গিবাদী ও বিকৃত মনের অধিকারী হতে পারে পাকিস্তানীরা তার উদাহরণ। দুঃখের বিষয়, এই আমলে শতচেষ্টা করেও আমরা ইতিহাস সব শাখায় অবশ্য পাঠ্য করতে পারিনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরাও কি পাকিস্তানী হয়ে যাব? বিএনপি-জামায়াত ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের উত্থান এই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করছে।

মনসুরের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী জানা যায়, পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী হিসেবে জামায়াতের ৭৩ হাজার সশস্ত্র কর্মি ছিল। কমবেশি এরা সব আলবদরদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সক্রিয় বা আদর্শগতভাবে। তবে, এ সংখ্যা আরো বেশি কারণ, রাজাকার আলবদরদের মধ্যে জামায়াত ছাড়াও উগ্রবাদী এবং অবাঙালি ছিল।

আলবদর কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো

আলবদর কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো, কীভাবে হলো, সে সম্পর্কে তথ্য কিন্তু খুব কম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা শুনেছি, জানতাম, ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মিরা প্রতিষ্ঠা করেছে আলবদর এবং তারা পেশাজীবীদের হত্যা করেছে। সংঘের প্রধান মতিউর রহমান নিজামী। আলবদরদের প্রধানও তিনি।

একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়–এই বইতেই আলবদর সম্পর্কে যা তথ্য আছে এবং সে তথ্যই এতদিন ব্যবহৃত হতো। এখন এর সঙ্গে আরো কিছু সূত্রের সাহায্যে আলবদরদের সম্পর্কে একটি বিবরণ নির্মাণ করেছি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই মোটামুটি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরা বুঝতে পারছিলেন দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এ পরিস্থিতিতে কী করা যেতে পারে তা নিয়ে জামায়াতে আলোচনা শুরু হয় এবং করণীয় ঠিক করে জামায়াত নয়, বরং জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলাম জামায়াত ই তুলাবা, এখানে যা পরিচিত ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘ নামে।

সৈয়দ ভালি রেজা নসর পাকিস্তানের ধর্মীয় দলগুলো নিয়ে গবেষণা করে একটি বই লিখেছেন, নাম–*দি ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রিভ্যুলেশন: দি জামাত ই ইসলামী অব পাকিস্তান*। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস বইটি প্রকাশ করে ১৯৯৪ সালে।

নসর লিখেছেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জামায়াতের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় কারণ পাকিস্তানের কোনো অংশেই তাদের কোনো স্থান ছিল না। সরকারি সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে তারা পিপিপির বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছিল। এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সঙ্গে জামায়াতের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জামায়াত দেখল জাতীয় রাজনীতিতে স্থান করে নিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করাই উত্তম। এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়েছিল ইসলামী জমিয়ত তুলাবা মে মাসে যখন তারা সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগল।

অন্যকথায় বলা যেতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিকভাবে নিজের জায়গা করে নেয়ার জন্য জামায়াত ও তার ছাত্র সংগঠন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আমরা দেখি, মুক্তিযোদ্ধাদের ঠেকাতে যে সব সংস্থা গড়ে উঠেছিল, যেমন, রাজাকার, শান্তি কমিটি বা আলবদর–সবখানে সর্বতোভাবে যোগ দিয়েছিল জামায়াত ও ছাত্রসংঘের কর্মিরা। অবশ্য, সেনাবাহিনীর সঙ্গে জামায়াতের যোগাযোগ সবসময়ই ছিল। পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* প্রকাশ করার অর্থ দিয়েছিল আই এস আই। বাংলাদেশ হওয়ার পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জিয়াউর রহমান প্রথম সেনাবাহিনীর পাকিস্তানীকরণ শুরু করেন যা পরে এগিয়ে নেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ। পাকিস্তানের পলিসি সুচারুরূপে সব পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য জেনারেল জিয়াউল হক খুশি হয়ে তাকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'নিশান ই পাকিস্তান' প্রদান করেছিলেন। জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ২৬ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট কার্যকর করা হয় এবং রংপুরে এরশাদ এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

পাকিস্তানীকরণের কারণেই জিয়াউর রহমান জামায়াতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং রাজাকারদের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। একই পলিসি অনুসরণ করেন এরশাদ। পরবর্তীকালে খালেদা জিয়া তাদের ক্ষমতার অংশীদার করেন যা পাকিস্তানেও সম্ভব হয়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শুরু থেকেই জামায়াত প্রধানত সামরিক বাহিনীর সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করেছে। একটি বিষয় খেয়াল করবেন, বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখন কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ ও সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রেফতার করেছে, নির্যাতন করেছে, জামায়াতীদের নয়।

নসরের বক্তব্যের সমর্থন পাই মনসুররের গ্রন্থেও। তিনি উল্লেখ করেছেন, ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য প্রাদেশিক মজলিসে সুরা ও জেলা নাজেমদের এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। সামগ্রিক আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনটি বিকল্প খোলা আছে–

১. 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা' যা করছে তা সমর্থন
২. যা হবার হোক, নিজেদের সরিয়ে রাখা
৩. পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেয়া যাতে পাকিস্তানের অখন্ডতা অক্ষুন্ন থাকে এবং এ কারণে নিজের দায়িত্ব পালন করা।

এই সভায় প্রাদেশিক সুরার রোকন মুস্তাফা শওকত ইমরান এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন যার মূল কথা হলো, পাকিস্তানের এই অংশকে 'হেফাজত' করতে হবে যেভাবে মসজিদ 'হেফাজত' করা হয়। একজনও 'বিচ্ছিন্নতা'বাদীদের সমর্থন করেনি। চারদিন এই বৈঠক হয়। ঐকমত্যের যে সিদ্ধান্তটি হয় তাহলো, এখানকার জনগণ দুটি শক্তির

মাঝখানে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে। একদিকে হচ্ছে 'দুশমন' [অর্থাৎ ভারত] নিয়োজিত হিন্দু ও কমিউনিস্ট যারা দেশকে টুকরো টুকরো করে হিন্দুস্তানের হাতে তুলে দিতে চায়। অন্যদিকে, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে এদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকজন। সুতরাং কী করতে হবে? এই দুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। 'আমরা একদিকে ইসলামী শক্তি নিয়ে দুশমনের সাথে ময়দানে সংঘাতে অবতীর্ণ হবো, অন্যদিকে ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে তার সংশোধনের মতো আমাদের মতো করে চেষ্টা করব।'

এরপর ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে ছাত্রসংঘের কর্মিদের এক বৈঠক হয়। সেখানে ঢাকা জামায়াতের নাজেম শাহ জালাল চৌধুরী তাদের নীতি ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, কোনো সার্কুলার জারি করা যাবে না, কারণ 'তা হবে মৃত্যুকে আহ্বান করার শামিল'। এ সিদ্ধান্তটি উল্লেখযোগ্য। জামায়াত যে পাকিস্তানী বাহিনীর অন্তর্গত হয়ে কাজ করেছিল বা বিভিন্ন বাহিনী তৈরি করেছিল সে সম্পর্কে কাগজে কলমে খুব কম প্রমাণ রেখেছে। এ বিষয়ে তারা খুব সতর্ক ছিল। তাদের কার্যকলাপের প্রধান প্রমাণ তাই তাদের মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম*।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় প্রাদেশিক সূরার চারজন সদস্য সারা 'পূর্ব পাকিস্তান সফর' করে তাদের কর্মসূচি কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেবেন। ১৫ ও ১৬ মার্চ চারজন সফর শুরু করলেন। কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন। খালেদ লিখেছেন, 'এই সফরে কর্মী সমাবেশে ফি আমানিল্লাহ্ বলা হতো। আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারি করে ইসলাম ও পাকিস্তানের অক্ষুন্নতার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হতো। দোয়া নিয়ে সাথীরা পরস্পরের নিকট থেকে এমনভাবে বিদায় নিত যেন আর কখনও এই দুনিয়ায় পরস্পরের দেখা হবে না।'

ছাত্র সংঘ তৃতীয় বিকল্প বেছে নিয়েছিল অর্থাৎ হিন্দুস্তানের অনুচরদের থেকে পাকিস্তান রক্ষা। এবং পাকিস্তান রক্ষার জন্য কর্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানী শাসক অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এবং সর্বত্র প্রচার করা যে পাকিস্তানকে হেফাজত করাই মূল কাজ। এ কারণেই, গণহত্যা শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে জামায়াতের আমীর গোলাম আজম সদলে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করেন এবং জামায়াত/সংঘ কর্মিরা শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনী, আলবদর ও আল শামসে দলে দলে যোগদান করে।

এটি ছিল প্রকাশ্য দিক। অপ্রকাশ্য নীতি ছিল অন্য। তারা ধরে নিয়েছিল সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগ ও বামধারার দলগুলোকে দমন করে ফেলবে। দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেবে। পাকিস্তানপন্থী দলগুলো তখন সুযোগ পাবে সেই শূন্যতা ভরাট করার। সেনাবাহিনী যদি জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহলে জামায়াত হয়ে উঠবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং পূর্বপাকিস্তানের রাজা হয়ে যাবে তারা। অন্যদিকে রাজাকার, শান্তি কমিটির সদস্য এবং আলবদর হয়ে পাকিস্তান রক্ষার নামে বিরোধীদের নিঃশেষ করে দিতে পারবে।

আলবদরদের যাত্রা শুরু

আলবদর সম্পর্কে তথ্য যা পাওয়া যায় তাতে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। আলবদর শিরোনামে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়াই দুষ্কর। এ নিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর পাইনি। এখন যে সব তথ্য পেয়েছি তা পুনর্বার পরীক্ষা করে ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেল। এপ্রিলের শেষের দিক থেকে আলবদর তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে ছাত্রসংঘকেই আলবদরে রূপান্তর করা হয়। সুতরাং, ছাত্রসংঘ ও আলবদর একই।

মেজর রিয়াদ হুসাইন যিনি আলবদর তৈরির প্রক্রিয়ায় শুরু করেন তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আলবদর নামেই সংঘের তরুণদের সংগঠিত করা হয়। আবু সাঈদ আলবদরদের সম্পর্কে লিখেছেন আগস্ট [১৯৭১] মাস থেকেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আলবদরে রূপান্তর করা হয়। রেজা নসর ও তার পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইসলামী জমিয়ত ই তুলাবা আলবদর ও আল শামস নামে দু'টি প্যারামিলিটারি ইউনিট গঠন করে। আলবদরের প্রায় সব সদস্য ছিল তুলাবার। অর্থাৎ ছাত্রসংঘ আর আলবদরের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সে কারণেই ছাত্রসংঘের নেতারাই ছিলেন আলবদরের, আল শামসের নেতা। এ ছাড়াও তৃণমূল পর্যায়ে বা অপারেশনাল পর্যায়েও 'কমান্ডার' ছিল। এ কারণে তুলাবার নাজিম ই আলা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরদের প্রধান। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের প্রধান হওয়ার কারণে মুজাহিদ রূপান্তরিত হন পূর্ব পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধানে। বিভিন্ন জেলার ছাত্রসংঘের নাজেম বা প্রধান রূপান্তরিত হন ঐ এলাকার বদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে। *যব উ নাজিম ই আলা থি* [১৯৮১] গ্রন্থের সম্পাদককে এক সাক্ষাৎকারে মতিউর রহমান নিজামী জানিয়েছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আলবদর ও আল শামসের কর্মিদের যোগাড় করতেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের সদস্যরাই এই দুই ইউনিটের সদস্য ছিল। এ কারণেই নিজামী লিখেছিলেন 'বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই

ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।' [দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.১১.১৯৭১]

আলবদররা যে ভালো কাজ করছে সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিল জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম– 'দেশের প্রতিরক্ষা ও দুশমনদের সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। শান্তিকমিটির কর্ম তৎপরতা এবং দুশমনদের উপর রেজাকার ও বদর বাহিনীর মারণাঘাত সে সচেতনতা বোধেরই বাস্তব স্বাক্ষর বহন করছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ কামনাই আমরা করি।' [দৈনিক সংগ্রাম, ৬.৯.১৯৭১]

৭ই নভেম্বর আলবদর দিবস পালন করা হয়। 'আলবদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র গণ-মিছিল বের করা হয়। পবিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথম আলবদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে'। [সংগ্রাম, ৮.১১.৭১] সেখানে বক্তৃতা করেন, ছাত্রসংঘের ঢাকা শহরের সভাপতি শামসুল হক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মীর কাশেম আলী।

এখানে উল্লেখ্য এর চার বছর পর, বঙ্গবন্ধু ও চারজাতীয় নেতাকে হত্যার পর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সংঘটিত হয় 'সিপাহী বিপ্লব'। বলা যেতে পারে তা ছিল নতুনভাবে আলবদর দিবস পালন। আলবদর দিবস কিন্তু আলবদর নামে কেউ বক্তৃতা দেয়নি কেন? কারণ, ছাত্রসংঘইতো তখন আলবদর, এর নেতারাই আলবদরের নেতা।

আর একটি উদাহরণ দিয়েই এ পর্ব শেষ করব। রাজাকার আলবদরদের হিংস্রতায় খুব সম্ভব আশঙ্কিত হয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগী জুলফিকার আলী ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতি মাহমুদ বোধহয় কিছু মন্তব্য করেছিলেন [জমিয়াতে তুলাবার শক্ত ঘাঁটি ছিল লাহোরে। হয়ত তারা আশঙ্কা করছিলেন পাকিস্তানেও তুলাবা একই কাণ্ড শুরু করতে পারে]। এ কারণে আলী আহসান মুজাহিদ ক্ষিপ্ত হয়ে এক বিবৃতিতে ১৫ অক্টোবর বলেছিলেন–'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করছে। অথচ, সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা জনাব জেড এ ভুট্টো, কাউসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার আলবদর ও অন্যান্য দেশ হিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করছেন। এসব নেতার এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।' সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেন। [সংগ্রাম, ১৫.১০.১৯৭১]

১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, রংপুরে ছাত্রসংঘের এক সভায় মুজাহিদ নির্দেশ দেন বিভিন্ন পর্যায়ে আলবদর বাহিনী গঠন করার জন্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌঁছা যায় ছাত্রসংঘই আলবদর বাহিনী, আলবদর বাহিনীই ছাত্রসংঘ। ছাত্রসংঘের নেতারাই আলবদরের নেতা, আলবদরের নেতারাই ছাত্রসংঘের নেতা।

১৫ মে ঢাকায় প্রাদেশিক সুরার এক অধিবেশন হয়। সেখানে জামায়াত কর্মীদের নিয়ে আলাদা একটি রাজাকার ফোর্স গঠনের প্রস্তাব রাখা হয় ইস্টার্ন কমান্ডের কাছে। সেনাবাহিনীর অনেকের কাছে মনে হয়েছিল রাজাকাররা যথাযথভাবে কাজ করতে পারছে না বা করছে না বা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে। ছাত্রসংঘের হাইকমান্ডও তাই মনে করত। ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর রিয়াদ হুসাইন এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। খালেদকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন–'আমি দেখলাম যে, আমার সেক্টরে ইসলামী ছাত্র সংঘের বাঙালি ছাত্ররা বড় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিরক্ষা, পথ দেখানো ও তথ্য গোপন রাখার জিম্মাদারিগুলো আদায় করছে। এ কারণে আমি হাইকমান্ড থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো অনুমতি না নিয়ে কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে এসব ছাত্রদের আলাদা করলাম। তারা সংখ্যায় ছিল ৪৭ জন। সবাই ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী। ১৬ মে ১৯৭১ সালে শেরপুরে তাদের সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো।'

এরা এত নিষ্ঠার সঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছিল যে মেজর রিয়াদ মুগ্ধ হয়ে ২১ মে এক বক্তৃতায় বললেন, 'আপনাদের মতো সুন্দর চরিত্রের মুজাহিদ সুলভ প্রকৃতির অধিকারী ইসলামের সন্তানদের আলবদর নামে আখ্যায়িত করা উচিত।' মেজর রিয়াদ আরো জানিয়েছেন, 'তখন হঠাৎ আমার মনে বিদ্যুতের মতো এ চিন্তা ঝলক দিয়ে উঠল যে, এই সংগঠনটিকে আলবদর নামে আখ্যায়িত করা হোক। এই নাম এবং কর্মীদের আলাদা সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার অভিজ্ঞতা এতখানি সাফল্যমণ্ডিত হলো যে, দুই তিনমাসের মধ্যেই গোটা পূর্ব পাকিস্তানে এই নামেই সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণদের সংগঠিত করা সম্ভব ছিল।' মেজর রিয়াদ উল্লেখ করেছেন, আলবদরের প্রথম কমান্ডার ছিল কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র কামরান।

এ খবর পৌঁছে যায় জামায়াত নেতাদের কাছে, তাদের মুখপাত্র *সংগ্রামে* আলবদর আলশামস বাহিনী গঠনের ইঙ্গিত দেয়া হয়–এসব হত্যাকাণ্ডে যারা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সকলেই পাকিস্তানবাদী ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী বলে জানা যায়। শান্তিকমিটির সাথে জড়িত ব্যক্তিও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বলে প্রকাশ। 'এছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যারা সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদের গোপন পত্র মারফত দুষ্কৃতিকারীরা (মুক্তিযোদ্ধারা-লেখক) হুমকি দিয়ে চলেছে জানা যায়।

আমাদের সেনাবাহিনী দুষ্কৃতিকারী দমন অভিযান অব্যাহত রেখেছেন সন্দেহ নেই এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাঁরা যেভাবে দেশকে হিন্দুস্তানী

অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সুসংগঠিত হামলা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন তেমনিভাবে এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদের সত্বরই নির্মূল করতে সক্ষম হবেন।

দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী এসব দুষ্কৃতিকারী দমনের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বেও সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় এবং একাধিক নিবন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস পাকিস্তান ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য লোকদের সমন্বয়ে একটি বেসামরিক পোশাকধারী বাহিনী গঠন করে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে অতি তাড়াতাড়ি এসব দুষ্কৃতিকারীদেরকে নির্মূল করা সহজ হবে।' [*সংগ্রাম*, ২৮.৫.১৯৭১]

আবু সাইয়িদ তার গ্রন্থে জানিয়েছেন, আলবদর বাহিনীর সূত্রপাত জামালপুরে। জামালপুরে ছাত্রসংঘের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় এই বাহিনী। 'জামালপুর মহকুমার আলবদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামীর নেতৃত্বে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান।... আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্র সংঘকে আলবদরে রূপান্তরিত করা হয়...।'

আসলে মে মাসেই গঠিত হয় আলবদর বাহিনী। তারপর, প্রতি জেলার সংঘ প্রধান বদর বাহিনীর প্রধানে রূপান্তরিত হন ও তাদের অপারেশন শুরু করে। আশরাফ জামালপুরে ছাত্রসংঘের প্রধান হওয়ার কারণে জামালপুর বদর বাহিনীর প্রধানে রূপান্তরিত হন এবং অপারেশন শুরু করেন অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী হত্যা শুরু করেন। এমনও হতে পারে, আশরাফও মেজর রিয়াদের নেতৃত্বে শেরপুরে প্রশিক্ষণ নিয়ে জামালপুরে ফেরত এসেছিলেন। সাইয়িদ নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ করেননি। লিখেছেন ২২ এপ্রিলের পর। সেটি মে মাস হওয়াই স্বাভাবিক। যে ৪৮ জনের প্রশিক্ষণ হয়েছিল তাদের কমান্ডার ছিল কামরান।

আলবদরের কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ

খুন করা ছিল আলদরের প্রধান কাজ। কিন্তু কাগজে কলমে কিছু আদর্শের কথা বলা হয়েছিল সেগুলিকে বলা হতো আলবদরের কর্মসূচি। তাদের ছিল পাঁচ দফা কর্মসূচি–

১. ব্যাপক জনসংযোগ। শহর থেকে গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত সভা সমাবেশ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার কথা বোঝাতে হবে।

২. বাঙালি ও অবাঙালিদের মাঝে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য 'ভালোবাসার আবেগ' সঞ্চার করা।

৩. ভারতীয় অনুচর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

৪. পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে সহায়তা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় জন ছাত্রদের [ছাত্রসংঘের] সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

৫. সরকারি ও আধাসরকারি কর্মচারিদের মাঝে কারা শত্রুর অনুচর তা চিহ্নিত করার জন্য প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীকে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা।

আলবদরদের প্রশিক্ষণ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল–সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আলবদরদের এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেবে। এর মধ্যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ, ওয়ারলেস ব্যবহার, অস্ত্রাদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। খালেদ উল্লেখ করেছেন, আলবদরদের ভালোভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা যায়নি। কিন্তু এটি ঠিক নয়। পাকিস্তানী বাহিনী তাদের প্রয়োজনমতো যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। বুদ্ধিজীবী হত্যার সময় আলবদরদের প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল–'দৈনিক দরসে কোরান, দরসে হাদিসে রাসুল, ইবাদত জিকির' প্রভৃতি। একদিন শুধু জিহাদ, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া

হতো। খালেদ লিখেছেন-'আলবদর মুজাহিদদের রাত যদি তরবারির জিহাদে অতিক্রান্ত হতো তবে দিনের বেশিরভাগ অংশ আদর্শিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে অতিবাহিত হতো। অর্থাৎ সারাদিন যুদ্ধের ময়দানে ক্লান্ত অবসন্ন এই মুজাহিদ রাতের বেলা তাহাজ্জুদ ও আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটিতে কাটিয়ে দিত। এ ছিল এমন কর্ম যা পাক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও জওয়ানদেরকে ইসলামের কার্যগত দাবিগুলির প্রতি মনোযোগী করেছিল এবং এখনও আলবদরের নামে তাদের মাথা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় নুয়ে যায়।' খালেদ লিখেছেন অবশ্য, তারা চাকরি ও রাজনীতির বাস্তবতার কারণে আলবদর সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে চান না।

আলবদরদের নিয়মিত বেতন দিত ইস্টার্ন কমান্ড। এ তথ্য পাকিস্তানী কোনো জেনারেল স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করেননি। তাদের বেতন ধার্য করা হয়েছিল মাসিক ৯০ টাকা। কিন্তু ছাত্রসংঘের নেতৃত্বের প্রস্তাব ছিল এই টাকা প্রতিরক্ষা ফান্ডে দেয়া হোক। কিন্তু, ইস্টার্ন কমান্ড জানিয়ে দেয় এই বেতন নিতে হবে। তখন সংঘের নেতারা নির্দেশ দেন কোনো আলবদর যেন ব্যক্তিগতভাবে এ বেতন গ্রহণ না করে। বরং আলবদরদের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে এবং সেখানে এই টাকা জমা দেয়া হবে। তবে, যখন তারা অপারেশনে যেত তখন যাতায়াত ও খাদ্যের সুবিধা [ভাতা] নিত।

অন্য আরেকটি সূত্র অনুসারে আলবদরদের বেতন ছিল ১৫০ টাকা। রাজাকার, মুজাহিদ থেকেও তাদের নেয়া হতো। এবং এতে অবাঙালিও ছিল। এদের নির্দিষ্ট পোষাকও ছিল।–

'Source reports that Pak army has organized and formed Razakar Bahini in East Pakistan.

Badar Bahini : This Bahini is mixed with Punjabi, Bihari and Bengalee. Almost all the persons are educated and well trained. The Bahini, most of the persons, selected from Razakars and Muzahids. Their dress is Millizhian. Their monthly salary in Rs. 150. This Bahini has been deployed with local Razakars in different districts."

[*Bangladesh Documents,* vol-ii, Dhaka, 19]

রাজাকার, মুজাহিদদের থেকে আলবদরে অন্তর্ভুক্ত করা হতো–এ মন্তব্যে খানিকটা ভুল আছে। তবে এ দিক থেকে মন্তব্যটি ঠিক যে, রাজাকার, মুজাহিদদের একটা বড় অংশ জামায়াত/সংঘ কর্মি ছিল।

আমাদের এতদিন একটি ধারণা ছিল, আলাদাভাবে আলবদর নামে একটি ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল যারা হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করত এবং তারাও হানাদারদের সাহায্য করত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ছাত্রসংঘই আলবদরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এর বাইরেও কেউ চাইলে আলবদর হতে পারত। পাকিস্তান সরকার এদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিত। নিয়মিত বেতনও দিত। অর্থাৎ, সহযোগী বললে কম হবে।

এরাও পাকিস্তানী বাহিনীর মতো হানাদার বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল, যাদের পাকিস্তান সরকার নিয়মিত বাহিনীর মতো বেতন দিত। সুতরাং, বাংলাদেশে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, অপহরণের জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর মতো তারাও সরাসরি দায়ী।

প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর আলবদরদের শপথ নিতে হতো। খালেদ সেই শপথ উদ্ধৃত করেছেন–

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মআদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু

আমি মহান ও মহামহিম আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার ওপর আঁচড় লাগতে দেব না, শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের জানমালের হেফাজত করব। রাজনৈতিক বিরোধ ও রেষারেষিতে কারো ক্ষতি করতে দেব না। কোনো লোকের বিরুদ্ধে বা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক বা হিন্দু হওয়ার অজুহাতে শাসনমূলক কোনো পদক্ষেপ হাতে নেব না। যতক্ষণ না পূর্ণ তদন্তের পর গাদ্দারদের সহায়তা বা তাদের দ্বারা সরাসরি দেশের স্বার্থের ক্ষতি সাধনের বিষয়টি প্রমাণিত না হয়। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্ট এবং সাধারণ জীবন ধারা বহাল করার জন্য সবধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ নেব। যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ করার জন্য যারা পুল উড়িয়ে দেবে লুটতরাজ করবে, হত্যা করবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাব। আল্লাহ আমার সহায় ও সাহায্যকারী হোন, আমীন।'

বলা বাহুল্য এসব শপথের ধার ধারেনি আলবদররা। নিজামী মুজাহিদের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নিরীহ শিক্ষক হত্যা এর উদাহরণ।

ক. আলবদরের কাঠামো

আলবদরের প্রত্যেকটি ইউনিটে তিনটি ভাগ ছিল। এগুলি হলো–

ক. প্রতিরক্ষা
খ. তথ্য
গ. জনসংযোগ

১. প্রতিরক্ষা

এই প্রতিরক্ষার অর্থ সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা। অর্থাৎ 'দুশমনের' খোঁজ খবর, তার শক্তি সম্পর্কে জানা এবং তার যে কোনো আক্রমণ ঠেকানো। গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতি জেলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডারের নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে আলবদররা তৎপরতা চালাতো। অর্থাৎ পাকিস্তানীদের অধস্তন ইউনিট হিসেবে কাজ করত।

খ. জনসংযোগ

এই বিভাগের কাজ ছিল কাউন্টার প্রপোগান্ডা। আলবদররা জানতো, সাধারণ মানুষ আকাশবাণী, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বা অন্যান্য বেতার শোনে। তাদের মতে এসব খবরাখবর দ্বারা মানুষ 'সাংঘাতিক রকমের বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল। এসব খবরকে তারা মনে করত গুজব। কারণ, তারা মনে প্রাণে পাকিস্তানী রেডিয়োর খবর বিশ্বাস করত। সুতরাং, জনগণের 'কল্যাণের' জন্য 'পাকিস্তানী খবর' পৌঁছে দিতো। পাকিস্তানের অখণ্ডতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এ জন্য নিয়মিত সভার আয়োজন ছিল অন্যতম কার্যক্রম। এছাড়া স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের 'নিরাপত্তা বিধান করা'ও এদের দায়িত্ব ছিল।

গ. তথ্য

'দুশমন'দের 'দেশদ্রোহী' কার্যকলাপের খবর সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ ছিল এদের প্রধান দায়িত্ব। এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে আলবদররা তাদের 'আক্রমণে'র বা তৎপরতার পরিকল্পনা তৈরি করতো।

এ ছাড়াও প্রতিটি জেলা আলবদর ইউনিটের ছিল একটি করে মেডিকেল ইউনিট, সংঘের যেসব সদস্য মেডিকেলে পড়ত বা সংঘ/জামায়াত সমর্থক ডাক্তারদের দ্বারা এই ইউনিট গঠন করা হয়েছিল।

খালেদ আলবদরের একটি কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। ১৯৭২ সালে *আলবদর* পত্রিকায় এই কাঠামো প্রকাশিত হয়েছিল। কাঠামোটি ছিল এরকম–

১. ইউনিট ৩১৩ ক্যাডেট

২. ইউনিট ৩টি কোম্পানি, প্রত্যেক কোম্পানিতে ছিল ১০৪ জন মুজাহিদ

১. কোম্পানি ৩টি প্লাটুন, প্রত্যেক প্লাটুনে ৩৩ সাজি

১. প্লাটুন ৩টি সেকশন ট্রুপ প্রত্যেক ট্রুপে ছিল ১১ জন আলবদর।

প্রত্যেক ইউনিটের নেতৃত্বে ছিল একজন কমান্ডার। তারপর দুইজন ডেপুটি কমান্ডার। জেলা ভিত্তিতে সংগঠন হতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল–এসব কিছুই ছিল প্রাদেশিক মজলিশে সুরার অধীনে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে আলবদর কমান্ড কীভাবে গঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই মনসুর খালেদের গ্রন্থে।

অপারেশন সার্চ লাইটের পর, এর দায়িত্বে থাকা মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে বদলি করা হয়। তার জায়গায় আসেন মেজর জেনারেল আবদুর রহিম। ঢাকা জেলার আলবদর সংগঠিত করার জন্য সংঘের নেতারা দেখা করে জেনারেল রহিমের সঙ্গে। রহিমের সঙ্গে তাদের 'আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, হিন্দুস্তানী অনুচরদের দমন ও আলবদর বিষয়ে' আলোচনা হয়। রহিম মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আলাপ করে আলবদর গঠনের ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। জেনারেল রহিম, লে.

কর্নেল আহ্‌সানউল্লাহ্‌কে নির্দেশ দেন ঢাকা শহর আলবদর ইউনিট গঠন করার জন্য। আর আলবদরের ইনচার্জ করা হয় বিগ্রেডিয়ার বশীরকে। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আলবদরদের সদর দফতর স্থাপিত হয়। ঢাকায় আলবদরের তিনটি গ্রুপ গঠিত হয়–

'শহীদ' আবদুল খালেদ গ্রুপ–কমান্ডার : আবু মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর

'শহীদ' আজিজ ভাট্টি গ্রুপ–কমান্ডার : আবদুল হক

গাজী সালাউদ্দিন গ্রুপ–কমান্ডার : মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান

আবদুল মালেক ছিলেন জমিয়ত ইসলামী তুলাবার মজলিশে সুরার সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র। ১৯৬৯ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে ছাত্রইউনিয়ন ছাত্রলীগ ও ছাত্রসংঘের সংঘর্ষে আবদুল মালেক নিহত হন। ছাত্রসংঘ আবদুল মালেককে সব সময় শহীদ বলে উল্লেখ করে। খালেদ তার সম্পর্কে যে আলোচনা [শহীদের আলোচনা] করেছেন স্বাভাবিকভাবেই তা অতিরঞ্জিত। যেমন, আহত মালেককে মেডিকেলে নেওয়া হয়, 'সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের নেতা ছিল। সে আবদুল মালেককে দেখে তৃপ্তির হাসি হেসে বলে, লেট হিম ডাই।' জামায়াতের এই ধরনের প্রচারের বিপরীতে অন্যান্যরা কখনই সুবিধা করতে পারেনি।

আজিজ ভাট্টি ছিলেন পাকিস্তানী সৈনিক। খুব সম্ভব ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত হন। আর গাজী সালাহউদ্দিন ইতিহাসখ্যাত গাজী সালাহউদ্দিন।

১৯৭১ সালের মে মাসের শুরুতে চট্টগ্রামের নৌঘাটি ও সেনানিবাসে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্তারা দু'টি মিটিং করেন। এরপর ১০ মে লে. কর্নেল আজম ও ফাতেমীর সঙ্গে ছাত্রসংঘের নেতাদের বৈঠক হয়। আলোচনায় চট্টগ্রামের নাজেম বলেন, সেনাবাহিনীকে তারা একটি শর্তে সহায়তা করবে তা হচ্ছে কোনো অপারেশনই তাদের পরামর্শ ব্যতিরেকে হবে না। এ নিয়ে দুপক্ষের 'চুক্তি' ও হয়। জুনের মাঝামাঝি, ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। কোম্পানি তিনটি হলো–

খালেদ বিন ওয়ালেদ

জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর

তারেক বিন রিয়াদ

পুরো চট্টগ্রাম জেলায় ৩৭টি আলবদর প্লাটুন গঠন করা হয়। ২৪ ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের মেজর জামাল দার, ক্যাপ্টেন পারভেজ সেকান্দার ও মনোয়ার খান আলবদরদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আলবদরদের সদর দফতর ছিল হোটেল ডালিম। এ হোটেলটি হিন্দু মালিকানায় ছিল যা আলবদররা দখল করেছিল।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, শান্তিকমিটি ও রাজাকার বাহিনীতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল জামায়াত ও সংঘের লোকজন। একই লোক একই সঙ্গে

রাজাকার, শান্তি কমিটি ও আলবদরে কাজ করত। যেমন, চট্টগ্রামে ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা মীর কাসেম আলী একই সঙ্গে ছিলেন আলবদর হাইকমান্ড, চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রেসিডেন্ট এবং জেলা রাজাকার ও চট্টগ্রাম শহর আলবদর প্রধান। মোহাম্মদ আবদুল বারী ছিলেন মোমেনশাহীর ইসলামপুর থানার আলবদর ক্যাম্প ইনচার্জ, জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটির প্রচার সম্পাদক ও ছাত্রসংঘের সদস্য। তিনি *দৈনিক সংগ্রামে* লিখেছিলেন–'আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থী ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাচ্ছি সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে দ্রুত এদেশের সর্বত্র আলবদর বাহিনী গঠন করুন। বদর বাহিনী ছাড়া শুধু রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে রাজাকার, বদর বাহিনী বা মুজাহিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা সবাইকে মনে করি সমান। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তার দালালদের শায়েস্তা করতে আজ তাই এদেশের সর্বত্র আলবদর বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন।' [১৬.৯.১৯৭১]

একাত্তরের ঘাতক দালালেরা : কে কোথায়? গ্রন্থ থেকে জানা যায় ২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এ কমিটিতে প্রধান জল্লাদ বা খুনী হিসেবে আশরাফুজ্জামানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন–১. মোস্তফা শওকত ইমরান ২. নূর মোহাম্মদ মল্লিক ৩. এ. কে. মোহাম্মদ আলী ৪. আবু মো. জাহাঙ্গীর ৫. আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস ও ৬. সর্দার আবদুস সালাম।

‘খ্যাতিমান’ কুখ্যাত কিছু আলবদর

এই শিরোনাম দেখে আপনারা বিভ্রান্ত হতে পারেন। পরপর পরস্পরবিরোধী দু’টি বিশেষণ। কিন্তু এর কারণ আছে। আলবদর ঘৃণিত সুতরাং এর লিডাররা স্বাভাবিকভাবেই কুখ্যাত। কিন্তু এরা তাদের নির্মমতার জন্যে ‘খ্যাতি’ অর্জন করেছেন। আলবদরদের একটি বড় অংশ আগেই বলেছি ১৯৭২ সাল থেকেই সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মিশে গেছে। শুধু তাই নয় অনেকে রাজনীতি সমাজ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। মীর কাশেম আলীর গ্রেফতার দেখে ৩০ বছর বয়সী কেউ বিস্মিত হতে পারেন কেননা মীর কাশেম এখন এ দেশে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একজন যিনি তার পক্ষে [তাকে যেন যুদ্ধাপরাধী না করা হয়] লবি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এক লবিস্ট ফার্মকে ২৫০ লাখ ডলার দিয়েছেন। এতো টাকা যিনি লবিস্টকে দিতে পারেন তার টাকার পরিমাণ কতো? আলবদর কমান্ডার থাকার সময়ই লুটপাটের মাধ্যমে তার সম্পত্তির ভিত্তি। এখন ইসলামী ব্যাংক, ইবনে সিনার মালিক হলেও আমাদের বা পূর্ববর্তী জেনারেশনের কাছে এই নামটি একটি ভয় জাগানিয়া নাম। বা মতিউর রহমান নিজামী যদিও শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু দেখে সুফি দরবেশ মনে হতে পারে [তার ডেপুটি মুজাহিদ তাকে ‘অলি’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন] তিনি ছিলেন ১৯৭১ সালে জামায়াত-ই-তুলাবার নিজাম-ই আলা, সেই সুবাদে আলবদর বাহিনীর প্রধান। মুজাহিদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তুলাবার সভাপতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আলবদরের প্রধান। মীর কাশিম আলী চট্টগ্রামের ইত্যাদি। আলবদররা কী ধরনের হিংস্র ছিল তার খানিকটা বিবরণ পাওয়া যাবে *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়* গ্রন্থে। আমি অন্যভাবে একটি উদাহরণ দিই। গত প্রায় চারদশক ধরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। আমার ছাত্রদের মধ্যে সবধরনের মতাদর্শের তরুণ আছে। আমি প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের মতাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হই। তারা জানে আমিও একটি মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা যখন তালেব এলম হিসেবে আমার কাছে এসেছে আমি তাদের সমদৃষ্টিতে দেখেছি। এবং এটি দৃশ্যমান। তাই গত চারদশকে আমার বিরুদ্ধে ছাত্ররা কোনো অভিযোগ তোলেনি। যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। আমার দ্বারও সবসময় তাদের জন্য উন্মুক্ত। চারদশক আগে সে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই আলবদররা সাদা

পাজামা ও কুর্তা পরে, মুখে কালো কাপড় বেঁধে তাদের শিক্ষকদের সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে হত্যা করেছে। এইসব শিক্ষকদের অধিকাংশ রাজনীতির সঙ্গে কখনও জড়িত ছিলেন না। পড়াশোনা ও ছাত্র ছাড়া কিছু চিনতেন না। তা হলে ভেবে দেখুন তাদের মনোভঙ্গি কেমন ছিল!

১৯৭১ সালের পুরোটা সময় আলবদরের নেতারা নিরন্তর সভাসমিতি করে 'হিন্দুস্থান'কে ধ্বংস করতে বলেছে ইসলামের নামে। সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আলবদরের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে নিজামী লিখেছিলেন–

'আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাকসেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিনশত তেরজন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' [সংগ্রাম, পৃ. ১১, ১৯৭১]

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা ছিল নিজামীদের ভাই। অগাধ বিশ্বাস ছিল তাদের ওপর। নিজামী তাদের 'ভাই' বলায় *সংগ্রাম* আপ্লুত হয়ে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছিল–'মূলত আমাদের সেনাবাহিনীতে তিন ধরনের জেহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত মোজাহেদ বীর জোয়ানরা থাকার দরুনই বেঈমান দুশমনরা আমাদের চাইতে সামরিক শক্তিতে পাঁচগুণ বেশি শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাক সেনাবাহিনীর সাথে চরমভাবে পরাজয় বরণ করে।

...আমাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই পাক সেনাবাহিনীই গত ২৪ বছর ধরে আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন ছাড়াও জাতীয় প্রতিটি দুর্যোগে আমাদের সাহায্য করে আসছে। গত বছর উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত হতাহত মানুষ বিশেষ করে পচা লাশ দাফন থেকে নিয়ে সকল প্রকার সাহায্যের মধ্য দিয়ে যে মানবিক সেবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা থেকেই এদেশের মানুষের প্রতি অফুরন্ত দরদেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জনাব নিজামী তাদেরকে আমাদের ভাই বলে যথাযথই বলেছেন এবং সেনাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিক একাত্ম হয়েই আজ এদেশবাসী শত্রুর মোকাবেলা করবে।' [সংগ্রাম ৩.৮.১৯৭১]

এই গ্রন্থের তৃতীয়পর্বে নিজামীর আরো কিছু মন্তব্য ও প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের এক সভায় নিজামী বলেন, মুসলমানরা যখন দেশরক্ষায় ব্যর্থ হলো তখন 'আল্লাহ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেছেন।' [সংগ্রাম, ২.৮.১৯৭১] একই সভায় মীর কাশেম আলী বলেন, 'গ্রামে গঞ্জের প্রত্যেকটি এলাকায় খুঁজে খুঁজে শত্রুর শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।'

মুজাহিদ এক সভায় বলেন, 'ঘৃণ্য শত্রু ভারতকে দখল করার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদেরকে আসাম দখল করতেহ হবে। এ জন্য আপনারা সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।' [সংগ্রাম, ১৫.৯.১৯৭১]

জামালপুরের ইসলামপুর থানার আলবদর কমান্ডার আবদুল বারী আলবদরদের প্রশংসা করে লিখেছিলেন–'জামালপুরের বিভিন্ন জায়গায় সীমান্তবর্তী এলাকায় আলবদর বাহিনী সাহসিকতা ও সাফল্যের সাথে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা করেছে। আলবদর বাহিনীর তৎপরতা দেখে ভারতীয় অনুচর নাপাক বাহিনীর লোকেরা জামালপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে ক্রমাগত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আলবদর বাহিনীর বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিটি ছেলেই শিক্ষিত এবং নামাজ পড়ে। ধনসম্পদ ও নারীর প্রতি কোনো লোভ নেই। বদর বাহিনীর গত তিন মাসের কাজে কোনো চরিত্রগত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়নি। এ জন্যই জনগণের কাছে বদর বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মোমেনশাহী জেলার জনগণের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় নাম আলবদর। জামালপুরে রেজাকার, পুলিশ, মুজাহিদ ও রেঞ্জাররা পুল ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাহারা দিচ্ছে আর পাক ফৌজ ও আলবদর বাহিনী অপারেশন করছে।' [*সংগ্রাম*, ১৬.৯.১৯৭১]

অথচ এসব প্রচারণ যে সত্য নয়, বরং তারা যে ছিল নিছক খুনী, লুটেরা, ধর্ষক তার প্রমাণ আবদুল বারীর ডায়েরির অনেক এন্ট্রির কয়েকটি এন্টি–

'1. Haider Ali, 2. Nazmul Hoque Rs 2500.00'

[অর্থাৎ এই দুজনার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা নেয়া হয়েছে]।

'তিতপল্লার শিমকুড়া গ্রাম–জব্বারের কাছ থেকে ২৯.১০.৭১ [তারিখে] আর তিনহাজার নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। 26.10.1971 ...Prostitution Quarter. [অর্থাৎ বেশ্যাপাড়ায় যাওয়া]

24.10.71 Raping case...Hindu Girl.' [অর্থাৎ হিন্দু মেয়ে পেলে ধর্ষণ করা]

যাক, আর উদাহরণ দিয়ে ভারাক্রান্ত করব না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া এটিএম আজহারুল ইসলামের কথা। রংপুরের ছাত্রসংঘের সভাপতি হওয়ার সুবাদে আলবদরদের কমান্ডার ছিলেন তিনি। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, 'আজহারের নেতৃত্বে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার বাচ্চু খাঁ ও কামরুজ্জামানের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাড়ুয়ার বিল ও পদ্মপুকুরে গণহত্যা চালায়। তারা রামনাথপুর ইউনিয়নের বিষমত ঘাটাবিলের কোনাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, গায়দাপাড়া, কুটিরপাড়া, খিয়ারপাড়া, খালিশা হাজীপুরের পাইকারপাড়া, তেলীপাড়া, বাজারপাড়া, বানিয়াপাড়া ও কামারপাড়ায় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া রাজাকার, আলবদর বাহিনী রামকৃষ্ণপুরের মাষাণডোবা, সরকারপাড়া, বিখজিরের পাড়া, মধ্যপাড়া, বালাপাড়া, বিত্তিপাড়া, বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের বুজরুক বাগবাড়ি, মণ্ডলপাড়া, দোয়ানী, হাজীপুর, সর্দারপাড়াসহ অনেক বসতিতে গণহত্যা চালায়।

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী সাবেক অধ্যাপক মো. আফজাল হোসেন প্রামাণিক জানান, ঘটনার দিন পথেঘাটে যেখানে সেখানে মানুষের লাশ পড়ে ছিল। চাপ চাপ রক্তের ওপর উবু হয়ে পড়েছিল অনেকেই। ঘরবাড়িগুলোতে জ্বলছিল আগুন। দু-চারজন বৃদ্ধ

মানুষ ছাড়া এলাকায় কাউকে দেখা যায়নি। বানিয়াপাড়ার মেনহাজুল বিএসসি, হিন্দুপাড়ার প্রাণকৃষ্ণ স্যারকে হত্যা করা হয়েছে। বাচ্চু খাঁ, কামরুজ্জামান ও আজহারের তাণ্ডবলীলায় লাল হয়েছিল ঝাড়ুয়ারবিল ও পদ্মপুকুরের পানি।' [*কালের কণ্ঠ*, ২৪.৮.২০১২]

এ ছাড়া কারমাইকেল কলেজের ছয়জন শিক্ষক ও একজনের স্ত্রীকে হত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এরা কত ভয়ংকর ছিল তার প্রমাণ আজহার গ্রেফতার হওয়ার পর তার বাড়ি বদরগঞ্জ উপজেলার মানুষজন আনন্দ মিছিল বের করে।

১৬ ডিসেম্বর থেকেই আলবদদরা তাদের নথিপত্র সমূহ ধ্বংস করে বিভিন্ন জায়গায় পালাতে থাকে। এরপর থেকে, যখন যেখানে তাদের সংক্রান্ত প্রমাণাদি ছিল তা সিস্টেমেটিক্যালি ধ্বংস করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সরকারের প্রধান দুর্বলতা হলো তারা কখনও এসব প্রমাণাদি সংরক্ষণের চেষ্টা করেনি। হয়ত তাদের ইতিহাস বোধ নিম্নমাত্রায় এবং ভিশনেরও অভাব। তার ফল ভোগ করছি আমরা।

এ কারণে, আলবদরের একটি তালিকা আমরা প্রণয়ন করতে পারিনি। এমনকী শীর্ষস্থানীয় আলবদরদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশকেন্দ্রই প্রথম শীর্ষস্থানীয় আলবদরদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল ১৯৮৭ সালে। সে তালিকা উদ্ধৃত হলো–

একাত্তরের ঘাতক দালালররা কে কোথায় শীর্ষক গ্রন্থে আলবদর হাইকমান্ডের একটি তালিকা ছাপা হয়েছিল এখানে যা উদ্ধৃত করছি। সদস্যদের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে তা ১৯৮৭ সালের।

ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি

(আলবদর হাইকমান্ড)

১. মতিউর রহমান নিজামী (সারা পাকিস্তান প্রধান) সহ সাধারণ সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী

২. আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান প্রধান) ঢাকা মহানগর আমীর জামায়াতে ইসলামী। পরিচালক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

৩. মীর কাসেম আলী (প্রথমে চট্টগ্রাম জেলা প্রধান ছিলেন, পরবর্তীতে আলবদর বাহিনীর নেতৃত্বের ৩ নম্বর স্থান লাভ করেন) ঢাকা মহানগরী নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী। পরিচালক, রাবেতা-ই-আলম (বাংলাদেশ) সদস্য (প্রশাসন), ইবনে সিনা ট্রাস্ট

৪. মোহাম্মদ ইউনুস কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরা সদস্য জামায়াতে ইসলামী। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক। পরিচালক, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতি।

৫. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক) সভাপতি, মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটি কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

৬. আশরাফ হোসাইন (বদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রধান) ঢাকায় ব্যবসা করেন
৭. মোহাম্মদ শামসুল হক (ঢাকা শহর প্রধান কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরা সদস্য, জামায়াতে ইসলামী
৮. মোস্তফা শওকত ইমরান (ঢাকা শহর বদর বাহিনীর অন্যতম নেতা) স্বাধীনতার পর পরই নিখোঁজ হন
৯. আশরাফুজ্জামান খান (ঢাকা শহর বদর বাহিনী হাইকমান্ড সদস্য এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের 'চিফ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) সৌদি আরবে চাকরি করেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রে।
১০. আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস (ঢাকা শহর বাহিনীর অন্যতম নেতা) মজলিশে সুরা সদস্য, জামায়াতে ইসলামী।
১১. সরদার আবদুস সালাম (ঢাকা জেলা প্রধান) কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী।
১২. খুররম ঝা মুরাদ লন্ডনে অবস্থানরত আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত জামায়াত নেতা। বিভিন্ন দেশে জামায়াতীদের তৎপরতা সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।
১৩. আবদুল বারী (জামালপুর প্রধান) ঢাকায় চাকরি করেন।
১৪. আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী জেলা প্রধান) দুবাইয়ে ব্যবসা করেন।
১৫. আবদুল জাহের মোহাম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম জেলা প্রধান) ঢাকায় সৌদি রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত সহকারী এবং গ্রন্থাগারিক
১৬. মতিউর রহমান খান (খুলনা জেলা প্রধান) জেদ্দায় চাকরি করেন।
১৭. চৌধুরী মঈনুদ্দীন (বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অপারেশনল ইনচার্জ) লন্ডন থেকে প্রকাশিত জামায়াতের 'সাপ্তাহিক দাওয়াত' পত্রিকার বিশেষ সম্পাদক এবং লন্ডনভিত্তিক জামায়াতীদের প্রধান সমন্বয়কারী।

এখানে তাদের যে অবস্থান দেখানো হয়েছে তথা ১৯৮৭ সালের। এরপর তাদের খোঁজখবর রাখার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি কারণ সমাজ রাষ্ট্রে এরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের পূর্ব ইতিহাস তখন কেউ মনে করতে চাইতেন না ইচ্ছে করেই। কখনও বা ভয়েও। কারণ, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলবদররা তখন স্থান করে নিয়েছিল।

এছাড়াও বিভিন্ন বিবরণে, আত্মজীবনীতে আরো কিছু নাম পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কেউ কখনও আলবদর, আল শামসদের সুসংবদ্ধ তালিকা প্রণয়ন করেনি।

মনসুর খালেদের *আলবদর* গ্রন্থে আলবদরদের বিভিন্ন অপারেশনের বিবরণ থেকে আমি একটি তালিকা প্রণয়ন করেছি–

ঢাকা শহর

আসাদুজ্জামান, কমান্ডার
খুররম মাহমুদ
আবু মো. জাহাঙ্গীর, কমান্ডার [নিহত]
আবদুল হক, কমান্ডার [নিহত]
নূর মো. মল্লিক
মোহাম্মদ আলী
আবু নসর ফারুকী
ইকরামুল হক
ফেদাউল ইসলাম
রেজাউল ইসলাম
এফ. এম. কামাল
মোস্তাফা শওকত ইমরান
হুসাইন খান
মুহম্মদ মাসুম

চট্টগ্রাম

আবদুল জাহের মুহম্মদ আবু নাসের
আবু জাফর, কমান্ডার
মুহাম্মদ নাঈমুর রহমান
ইফতেখারুল ইসলাম
সলিমুল্লাহ
এনামুল হক মন্তু, কমান্ডার
সৈয়দ আকরাম হোসাইন
আবু ওসমান
শাহ জামান
আবদুর রহমান
মীর হাসান
মুহম্মদ মনসুর
আবু সরওয়ার

খুলনা

আহমদুর রহমান
মকবুল আহমদ [নিহত]

রাজশাহী

মজহারুল ইসলাম
মতিনউদ্দিন
আবদুস সালাম

বগুড়া

মুহম্মদ আবুল হাসান

রংপুর

মুহাম্মদ আবু আতের
মুহম্মদ আবুল হাসান ইকবাল
মুহাম্মদুর রহমান [নিহত]
একরামুল হক [নিহত]
মুহম্মদ ইলিয়াস ফাজেল [নিহত]
আবদুস সালাম [নিহত]
মুহম্মদ কাবিল [নিহত]
মকবুল হামিদ [নিহত]
হাসানুর রহমান [নিহত]
মুহম্মদ আসলাম [নিহত]
কামাল হোসাইন [নিহত]
আবদুল লতিফ [নিহত]
ওবায়েদ হোসাইন [নিহত]
হাফিজুর রহমান [নিহত]
আহমদ কামরান [নিহত]
শমসের আলী [নিহত]
মন্টু [নিহত]
আব্বাস [নিহত]
দানিশ [নিহত]
সোলায়মান [নিহত]
মোহসেন আলী [নিহত]
এনামুর রহমান [নিহত]
আবরী [নিহত]

কক্সবাজার
আবদুল আউয়াল
সিরাজুল ইসলাম [নিহত]
মুখতার আহমদ দরাজ [নিহত]
বশীর আহমদ [নিহত]

রাঙ্গামাটি
আনিসুল আলম

ময়মনসিংহ
নাজমুস সাকীব
ইকবাল
সিরাজ
মোহাম্মদ ইউসুফ [নিহত]

নারায়ণগঞ্জ
নজরুল, কমান্ডার

নরসিংদী
আবু ওসমান

ফরিদপুর
মুহাম্মদ কামাল
শামসুল ইসলাম

জামালপুর
ইসলামউদ্দীন
আবদুল জব্বার
আতু নবীর
কবীর আহমেদ
মাইনুর রহমান
আবদুল জব্বার
বাবানুল ইসলাম
নুরুল আমীন [নিহত]

শেরপুর
কামরান [খুব সম্ভব মালোয়েশিয়ায় অধ্যাপনা করেন]
মকবুল আহমদ [নিহত]

ফরিদউদ্দিন [নিহত]
আবদুস সামাদ [নিহত]

নাটোর
আবদুল কাইয়ুম
ফারুকুর রহমান
গোলাম আলী মিয়া
আবুল হাশেম
আজিজুদ্দিন
আবদুল জব্বার
কুরবান
আসগর

ফেনী
ফজলুর রহমান
মুহাম্মদ ইলিয়াস, কমান্ডার
রুহুল কুদ্দুস, কমান্ডার
হামিদউদ্দিন [নিহত]

নোয়াখালি
আবদুল খালেক মিয়া
আবদুর রব [নিহত]
নুরুল ইসলাম [নিহত]
আবুল খায়ের [নিহত]
ওয়াহিদুল হক [নিহত]
আবদুল আওয়াল [নিহত]
আহমুদুল হক [নিহত]
নুরুল করিম [নিহত]
হাফেজ মো. মহসীন [নিহত]

চাঁদপুর
মো. আবু তাহের [নিহত]

সংকলিত প্রতিবেদনগুলোতে আলবদর হিসেবে যাদের নাম পাওয়া গেছে তাদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছি। এদেরও বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেতে পারে।

ঢাকা

আলিয়া মাদ্রাসা ইউনিট

সৈয়দ নুরুল হক : কমান্ডার

সাঈদ আহমদ

সাব্বির আহমদ

হেলালউদ্দীন

আলতাফুর রহমান

ওয়াহিদুল হক

জোবায়ের

শফিকুল্লাহ খান

হাবিবুর রহমান

আব্দুল্লাহ

মো. শাহজাহান ভুইয়া

মো. আক্তারুজ্জামান

ওসিউদ্দিন আহমেদ

মো. মোমদেদুজ্জামান

ফিরোজ মাহবুব কামাল

এসএম জহুরুল ইসলাম

মো. আবুল হোসেন

মো. কবিরুদ্দীন

মো. শামসুল ইসলাম খান

মো. আবদুল মতিন

মো. নসব-এ খুদা

এস এম আবদুল হাই

মো. মাজেদ আলী

খোন্দকার নাজমুল হুদা

এই এস খান

আবু হানিফা আফ্রিদি

মকবুল হোসেন
আয়ুব আলী
} ড. আবুল কালাম আজাদকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত; মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ৫.১০.১৯৭২ সালে

জুবায়ের

সিরাজুল ইসলাম, মনোহরদী

এস. এ. তারেক কমান্ডার, মোহাম্মদপুর

সৈয়দ মোহাম্মদ রিজভী, কমান্ডার, মহাখালী

মো. [illegible] ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি

মুহীউদ্দিন

এ. কে. এম. আলী

মুহাম্মদ নাজমুল হক

শামসুল হক

সর্দার আবদুস সালাম

ইউসুফ আলী চৌধুরী

নারায়ণগঞ্জ

মো. মুইনুদ্দীন

মো. নাসিরুদ্দীন

মো. জামাল উদ্দীন

জালাল উদ্দীন মো. মনসুর আলম

মো. সোলায়মান

মো. বোরহানউদ্দীন

মো. রিজওয়ান আলী

গাইবান্ধা
লুৎফর রহমান কমান্ডার

ময়মনসিংহ
নাজমুল হক
খলিলুল্লাহ
মুজিবুর রহমান
'মওলানা' আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী
মুহীউদ্দিন

জামালপুর
আবদুল মান্নান
আবদুল হক
এম. পাহলোয়ান

যশোর
শেখ আবদুল মতিন
মাস্টার মতিয়ার রহমান
আফছার উদ্দীন
'মওলানা' ফজলুল হক
'মওলানা' দ্বীন মোহাম্মদ

খুলনা
সিদ্দিক জামাল, জেলা কমান্ডার
এ. কে. এম. ফারুকী, মহকুমা কমান্ডার
আনসার উদ্দীন

রাজশাহী
আবদুল হাই ফারুকী, জেলা কমান্ডার
আবদুল নঈম

পটুয়াখালী
মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
বসিরউল্লাহ
মোহাম্মদ জালালউদ্দিন
ওবায়দুর রহমান
আবদুল জলিল সিকদার
হাবিবুর রহমান

বরিশাল
মাহমুদ হোসাইন আল মামুন, জেলা কমান্ডার
মোহাম্মদ আবদুল জলিল
ওবায়দুর রহমান
আমিনুল ইসলাম

চাঁদপুর
মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, জেলা কমান্ডার
আবদুর রব
আবদুল বাসার
[illegible]ল্লাহ

টাঙ্গাইল
ছোমহামউদ্দীন আহমদ
আজিজুর রহমান
আবদুল খালেক, অধ্যাপক
হাকীম হাববীর রহমান
হাবীবুর রহমান, অধ্যাপক
আবদুল্লাহেল ওয়াছেক, এডভোকেট
আবদুল জব্বার, মোক্তার
এস. এম. রেজা
আবদুল বাসেত, ডাক্তার
এম. এস. আবদুল কাদের, অধ্যাপক

গাইবান্ধা
লুৎফর রহমান, কমান্ডার

কুমিল্লা

আবু খায়ের, হাজিগঞ্জ, কোম্পানী কমান্ডার শাহমুস্তবা জাহাঙ্গীর, (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, ৩য় বর্ষ সম্মানের ছাত্র, ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি) পিতা শাহ আলম চৌধুরী, চরখালী মুরাদনগর কুমিল্লা। প্লাটুন কমান্ডার সামছুল হক, (ছাত্রসংঘ জেলা শাখার সেক্রেটারি) পিতা–আবদুল জাব্বার, কাশীনাথপুর কোতয়ালী কুমিল্লা। আবদুর রব, পিতা আবদুল লতিফ, নরপায়া, লাকশাম, কুমিল্লা। আবদুল বারি, পিতা ডাঃ আবদুল আজিজ, জঙ্গালপুর, কোতয়ালী কুমিল্লা। আবদুল জলিল পিতা মৃত মুকসুদুর রহমান, সায়েস্তানগর চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা। মো. ইসমাইল পিতা আলী আহমদ, জাঙ্গালীয়া কোতয়ালী, কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম পিতা মো. হোসেন মাষ্টার শ্রীরামপুর, কচুয়া, কুমিল্লা, এ. কে. এম আতিকুল হক পিতা মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া প্রতাপপুর চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা। সৈয়দ আহমদ ছিদ্দিক পিতা মওলানা নুর মোহাম্মদ, মোগলটুলী, কোতয়ালী, কুমিল্লা। খোরশেদ আলম পিতা মো. সোনা মিয়া, দৌলতপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. হারুন মিয়া, পিতা আছমত আলী, বলারামপুর, কোতআলী কুমিল্লা। শহিদুল হক পিতা আবদুল মজিদ, কাশীনাথপুর, কোতআলী, কুমিল্লা, মঞ্জুরুল কাদের পিতা আবুল হোসেন, কোটবাড়ী কুমিল্লা। মো. মহসীন, পিতা মো. সুরুজ মিয়া কাশীনাথপুর কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. আমান হোসেন, পিতা মইদার আলী, বলারামপুর, কোতয়ালী কুমিল্লা। ছগীর আহমদ চৌধুরী, পিতা আবদুর রসিদ চৌধুরী, বজ্রপুর কুমিল্লা। মো. আবদুল মান্নান, পিতা মো. তানু মিয়া, ছারপাড়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। এ, মজিদ সরকার, পিতা এ, হামিদ সরকার, শিবপুর, কচুয়া, কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম মজমুদার, পিতা ডাঃ ইজ্জত আলী, জোটপট্টি কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা মো. এ আউয়াল, শ্রীরামপুর কচুয়া কুমিল্লা। আবু সুফিয়ান, পিতা আজিজুর রহমান হরিচাইল কচুয়া কুমিল্লা। এ ছালাম পিতা তৈয়বুর রহমান হরিপুর লাকসাম কুমিল্লা। মো. আমিনুল হক পিতা মজিবুল হক, কুরকুটা ঐ। মো. নাজমুল হুদা পিতা সেকান্দার আলী দেবপুর হাজিগঞ্জ। মো. একরামুল হক পিতা মো. শামছুল হক, নাটোরা চৌদ্দগ্রাম, আবদুর রহমান পিতা জব্বার আলী, ছোট বেরুলা লাকসাম কুমিল্লা। মো. আবদুল হাই, পিতা আলহাজ মো. হোসেন চৌদ্দদোনা, লাকসাম কুমিল্লা। মো. আলী পিতা মো. আব্বর আলী মোহাম্মদপুর লাকসাম, কুমিল্লা। মো. শহিদউল্লা পিতা মো. সুলতান আহমদ গুলিয়ারা, ঐ, মো. আবুল হাশেম, পিতা আনোয়ারউল্লা শ্মশানপুর, ঐ। আজিজুর রহমান মজুমদার, পিতা আবদুল জাব্বার মজুমদার চৌদ্দদোনা, ঐ, আবু তাহের পিতা মফিজুর রহমান, বেতীহাটা ঐ। খালেদ বিন জমির, পিতা অধ্যাপক জমিন উদ্দিন উজীর দীঘির দক্ষিণপাড়, কোতয়ালী, কুমিল্লা। এ রহিম পিতা সেকান্দার আলী বেতাহাটা লাকসাম কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম পিতা মাস্টার বজলুর রহমান, আদ্রা, ঐ। নুরুল আমীন, পিতা মুন্সী সেকান্দর আলী, দৌলতপুর, ঐ। মোস্তফা কামাল, পিতা খলিলুর রহমান নওসোদা, ঐ। গোলাম মোস্তফা, পিতা মকবুল আহমদ কুরকুটা ঐ।

সুলতান আহমদ ভুইয়া পিতা এ হাকিমভুআ চক্রনিধি ঐ। মোবারক হোসেন পিতা সিদ্দিকুর রহমান, দৌলতপুর ঐ, মকবুল আহমদ, পিতা আলী আজম, হেজাখালী, ঐ, মুসলিমুর রহমান, পিতা আলী মিয়া, কামাডডা, ঐ; আবুল কাসেম আনসারী, পিতা-আমীর হোসেন, কুমড়ার ডোগা, ঐ এ, আউয়াল, পিতা-সুন্দর আলী সরকার, মস্তফাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা; নুরুল ইসলাম, পিতা-আলী আহমদ, সোমেশপুর, লাকসাম, কুমিল্লা। এ রউফ, পিতা-সুন্দর আলী, মস্তফাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা। ইউনুস মিয়া, পিতা-আলী আহমদ, গোপালনগর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। নইমুল হক, পিতা-মওলানা সিরাজুল হক, বিটেশ্বর, লাকসাম, কুমিল্লা। সুলতান আহমদ, পিতা-আমীর হোসেন, মুরাদ গ্রাম ঐ, হেদায়েত উল্লা, পিতা-নুরুজ্জামান, বুছইয়া, ঐ, হোসেন আহমদ, পিতা আলি আজম, শ্রীহাসা, ঐ, সিরাজুল ইসলাম, পিতা-সফর আলী ঐ; আবুল বাসার, পিতা-সিরাজ উদ্দীন, দাউদপুর ঐ; আবুল বাসার, পিতা-ফজলুর রহমান, শ্রীহাসা, ঐ; রুহুল আমিন, পিতা-ধনামিয়া, বিষ্ণুপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, আনিসুল হক, পিতা-মোহাম্মদ আলী, নসাডডা, লাকসাম; মঞ্জুর মোরশেদ, পিতা-আবুল হোসেন, কোটবাড়ী, কোতয়ালী, এরশাদ উল্লাহ, পিতা এ, কাদের, মুলপাড়া, ফরিদগঞ্জ, কুমিল্লা; আফাজ উদ্দিন, পিতা-আব্দুল হামিদ, ঐ শাজাহান, পিতা-আবুল কালাম, ঐ, আবু সালেহ পিতা-মান্নান, ঢোলঘর, লাকসাম, কুমিল্লা; নুরুল আমিন, পিতা-মো. ইয়াছীন, কামতলী, ঐ আব্দুল অদুদ, পিতা-আব্দুল রফিক, চর্ষা, কুমিল্লা, এ, কে, এম, আব্দুল হান্নান, পিতা-আজহার আলী, খোদকিষ্ট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ঐ, মকবুল আহমদ, পিতা আলী আজম, হেজাখালী, ঐ, মুসলিমুর রহমান, পিতা আলী মিয়া, এ. কে, এম আবুল বাসার মজুমদার, পিতা দুদা মিয়া মজুমদার, দৌলতপুর; আতিক উল্লাহ, পিতা ইয়াকুব আলী, সোবেশপুর, ঐ, নূর মোহাম্মদ, পিতা ফজর আলী, জাহানাবাদ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী আবু তাহের, পিতা নুরুল হক, রুদ্রাপুর, লাকসাম, কুমিল্লা, আমিন উল্লা, পিতা-মজিবুল হক, সরাসপুর, ঐ, খোরশেদ আলম, পিতা মাস্টার নোয়াব আলী, ভোসই, ঐ, হেদায়েত উল্লাহ, পিতা মজিবুল হক, দেবপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, সেরাজুল ইসলাম, পিতা সৈয়দ আলী, গালিমপুর, বরুরা, কুমিল্লা, (এ, কে, এম আজম বাহান চৌধুরী, পিতা জয়নাব আলী চৌধুরী, বরুরা, কুমিল্লা, মো. খোরশেদ আলম, পিতা ডাঃ এম, এ, বারী, দেইচর, বরুরা, কুমিল্লা; রুস্তম আলী পাটওয়ারী, পিতা রজব আলী পাটওয়ারী, শাকপুর, ঐ, এ. বি. এম. শহিদুল হক খন্দকার, পিতা আবদুস ছামাদ খন্দকার, ঐ। এ, হাই, পিতা এ জলিল, নীদপুর, কচুয়া, কুমিল্লা, খোরশেদ আলম, পিতা মো. মোজাফফর, কইত গ্রাম, মুরাদনগর, কুমিল্লা, এম, আবদুল কুদ্দুস, পিতা এ, রহমান, দাওঘর; ঐ, এ, টি, এম. নাসির উদ্দীন, পিতা এ, রহমান, ঐ, এ, মতিন, পিতা লুৎফুর রহমান, সলাপুর, লাকসাম, কুমিল্লা, মো. সোলেমান, পিতা মুসলিম মোহাম্মদ ইউসুফ, বাংঘর, লাকসাম, কুমিল্লা; আবদুল মোস্তাহার, পিতা, এ লতিফ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, মোস্তফা হোসেন, পিতা সাইয়েদুল হক, চাঁদপুর, লাকসাম, কুমিল্লা; নুরুল হক

মজুমদার, পিতা গোলাম কাদির মজুমদার; মুরাদ মুরাদগ্রাম, ঐ, সফিউল্লা, পিতা, সুলতান আহমদ, শাহাপুর, ঐ; নেয়ামত উল্লা, পিতা-মজিবুর রহমান, কুমারবাগ, ঐ; এ, হক, পিতা-রহমত আলী মাস্টার।

এইসব আলবদরদের বিভিন্ন অপারেশনে পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা ইনচার্জ ছিলেন। তাদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছি খালেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে। কখনও পাকিস্তাদের যুদ্ধাপরাধের বিচার করা গেলে এসব কর্মকর্তাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে–

ঢাকা
ব্রিগেডিয়ার বশীর
লে. কর্নেল আহসান
লেফটেন্যান্ট আলতাফ হোসাইন
সুবাদার খাদেম হোসাইন
কর্নেল মুস্তাফিজ

নারায়ণগঞ্জ
ক্যাপ্টেন ওমর ফারুক

চট্টগ্রাম
মেজর জামান দার ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স
ক্যাপ্টেন পারভেজ সেকান্দার [ঐ]
ক্যাপ্টেন মনোয়ার খান [ঐ]
ক্যাপ্টেন আনোয়ারুল হক
ক্যাপ্টেন আবদুল করিম

ময়মনসিংহ
ক্যাপ্টেন আবদুল কুদ্দুস
ক্যাপ্টেন আহসান

খুলনা
ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ হায়াত খান

রংপুর
মেজর গোলাম রসুল ৪৮ পাঞ্জাব
মেজর আফজাল হোসাইন

ফরিদপুর
মেজর আল্লা মোহাম্মদ ২৯ বালুচ
ক্যাপ্টেন হেদায়েত উল্লাহ

জামালপুর
মেজর রিয়াজ হুসাইন ৩১ বেলুচ
মেজর আইয়ুব
মিয়া মহম্মদ হাওলাদার

ফেনী
ব্রিগেডিয়ার ইসলাম
মেজর বুখারি
ক্যাপটেন ইসহাক ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

শেরপুর
মেজর আইয়ুব খান
ক্যাপ্টেন এহসান সিদ্দিকী

আলবদরদের অপারেশন

মনসুর খালেদের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলবদরদের বিভিন্ন অপারেশন। বাংলাদেশে যেসব আলবদরদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এগুলি রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আলবদরদের এখানে চিত্রিত করা হয়েছে 'দেশ প্রেমিক' হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধারা 'দুষ্কৃতিকারী'। আলবদর নিহত হলে 'শহীদ'। এ সব বিবরণ যে অতিরঞ্জিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব বিবরণের দু'টি বৈশিষ্ট্য–

ক. আলবদরদের আদর্শ, নিষ্ঠা, বীরত্বকাহিনী তুলে ধরা।

খ. প্রতি অপারেশনের সঙ্গে জড়িত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, যা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না।

উদাহরণ স্বরূপ তাদের দু'একটি অপারেশনের বিবরণ দিচ্ছি খালেদের বই থেকে–

ভারত সীমান্ত

'মাইনুর রহমান (জামালপুর) বলেন যে, ১২ নভেম্বরের শীতের রাতের কথা বলছি। হিন্দুস্তান আর্মির গেরিলা আক্রমণের জবাব দেয়ার জন্য পাক বাহিনীর ২০০ সিপাহী ও আলবদরের ৪০ জন ক্যাডেট নিয়ে গঠিত একটি আক্রমণকারী দল গারো পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল। রাত ১১টার দিকে আমাদের গ্রুপ পাহাড়ি রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছল। ঘোর শীত ছিল। দ্বিতীয়ত ছিল অন্ধকার। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছিল। রাইফেলের ওজন বেড়ে পাথরে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থায় পথ চলতে চলতে আমরা রাত সাড়ে ৩টার সময় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়লাম। তাদের একটি ফাঁড়ি ঘেরাও করে ফেললাম। এক ঘণ্টা অনবরত লড়াইয়ের পর দুশমন যুদ্ধাস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল। ভারতীয় ফৌজের সাহায্যকারী দল আসতে আসতে আমরা পাকিস্তানী পর্বতমালায় এসে গেলাম। সারাদিন ছিলাম আমরা অভুক্ত।'

আলবদর আকরাম হোসাইন মনসুরকে জানিয়েছেন ২৭ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পথে তারা মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্পের খবর পায়। ২৭ জন আলবদর

সেই ক্যাম্প ঘেরাও করে। ২৬ জনকে তারা গ্রেফতার করে। এর মধ্যে '১১ জন হিন্দু, ৩ জন হিন্দুস্থানী সৈনিক বাকীরা জাতীয়তাবাদী।' এ ছাড়াও তারা ৩৮টি রিভলবার, ৪৭টি হেভি মেশিনগান উদ্ধার করে। পাঠক ৪৭টি হেভি মেশিনগান নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘোরাঘুরি করছে। ভাবা যায়!

আলবদরদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর এক জায়গায় সংঘর্ষ হলো। মুক্তিবাহিনীতে ছিল বাবা, ছেলে আলবদর বাহিনীতে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল আলবদরের বাবা মারা গেছেন। তখন কী হলো? 'তরুণ তার বাবার লাশ দেখল। কিন্তু সে কাঁদলোও না চিন্তিতও হলো না। বরং ঈমান ও একীনের প্রমাণ দিয়ে সে বলল, তিনি আমার বাবা তা ঠিক কিন্তু তিনি তো আমার ধর্ম ও জাতির দুশমন।' এ গল্প করেছেন ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াত খান। তিনি আরো বলেন, তার সঙ্গে তিনি দেখা করে প্রশংসা করলে আলবদর বলে, 'আমাকে দ্বীনের খাতিরে যে কোনো বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমার পথে আমার মা বাধা দিলে তার সঙ্গেও লড়াই করতে হবে।'

মেজর রিয়াদ হোসেনও আরেকটি গল্প বলেছেন। একদিন এক আলবদর এসে তার ভাইকে গ্রেফতারের অনুমতি চায়। কেন? কারণ তার ভাই হিন্দুস্তানীদের সঙ্গে কাজ করছে। সে একজন স্পাই। মেজর বললেন, 'তুমি জানো, স্পাইয়ের শাস্তি কী? মৃত্যুদণ্ড। তাতে তোমার দুঃখ হবে না'। আলবদর জানালো, না দুঃখ হবে না কারণ তার ভাই একজন গাদ্দার। সে ১৩ কোটি মুসলমানের সঙ্গে গাদ্দারী করছে। তার মৃত্যুই উত্তম। 'যে টিউমার শরীরের জন্য বিপদজনক তা কি কেটে ফেলাই উত্তম নয়?'

আলবদরদের এসব 'বীরত্বগাথার' অনেক গালগল্প আছে। এর উদ্দেশ্য হলো, পাকিস্তানের তরুণদের মধ্যে আলবদরীয় ভাবাদর্শ তৈরি করা। নতুন এক জঙ্গী তরুণ সমাজ গড়ে তোলা যারা হবে জামায়াতের অনুসারী।

মনসুর খালেদের বর্ণনায়, আলবদররা যে এতো খুন খারাবী করেছে তার কোনো বর্ণনা নেই। সেটি স্বাভাবিক। আলবদররা যে নিরীহ পেশাজাবী, তাদের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে জবাই করত তার কোনো বর্ণনা নেই। অথচ এগুলোই ছিল তাদের মূল অপারেশন। এখানে সে রকম একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি। এ বর্ণনায় আপনারা জানতে পারবেন আলবদর কী! কী ভাবে তারা কাজ করত। তারা কী ধরনের মনোবিকারের রোগী। এ বর্ণনাটি তৎকালীন গ্রীণল্যান্ড মার্কেন্টাইল কোম্পানির চিফ অ্যাকাউনটেন্ট মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের। তাঁকে ধরে নিয়ে রাখা হয়েছিল ঢাকার মোহাম্মদপুরে আলবদরদের সদর দফতর ফিজিক্যাল সেন্টারে। সেখানে থেকে তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরের *দৈনিক বাংলায়।* এই বর্ণনাটি হয়ত অনেকে পড়েছেন। কিন্তু, আমার মনে হয় নতুন প্রজন্মের অনেকেই তা পড়েনি। এ বর্ণনা থেকে সামান্য হলেও আলবদরদের (বা নিজামী, মুজাহিদ, কামরুজ্জামান বা কাদের মোল্লার) মনের গড়ন জানা যাবে।

"১৪ ডিসেম্বর সকাল নয়টা। শান্তিবাগে আমার বাসায় আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরে ভারী পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন

রাইফেলধারি লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল–'ঘরে কে আছ, দরজা খোল।'

তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি মেসের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এল। আমাদের তারা মালিবাগের মোড়ে দাঁড় করানো একটি বাসে নিয়ে তুললো। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেললো, এবং একটি কাপড় দিয়ে কষে চোখ বেঁধে ফেললো। এছাড়া হাত দু'টো নিয়েও পেছনের দিকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরও কয়েক জায়গায়ও তারা বাসটি থামালো। মনে হলো আরও কিছু লোককে বাসে ওঠানো হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হলো, বাসটি মোহাম্মদপুর, দ্বিতীয় রাজধানী বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছে।'

'এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর বাস এক জায়গায় এসে থামলো। তারপর আমাদের হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি যে, আমি বদর বাহিনীর হাতে পড়েছি। খানিকক্ষণ পর আমাকে ও অপর আরেকজনকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এল উপর তলায়। দরজা খুলে একটি রুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ঠিক পাকা মেঝের ওপর নয়। গিয়ে পড়লাম কিছু লোকের ওপর। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কক্ষের অন্য সব লোকেরও আমার মতো হাত ও চোখ বাঁধা কি'না, শুধু বুঝতে পারছিলাম ঘরে আমার মতো আরও বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে। এদিকে কষে বাঁধার দরুণ আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছি। মাথায় শুধু একটি চিন্তা–কি করে এই বর্বর পশুদের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারবো?'

'আল্লা আল্লা বলে, আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। ভাবছিলাম বদর বাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা লাইনের ছেলে। আল্লাহর আহাজারিতে যদি বদর বাহিনীর লোকদের কিছু দয়া হয়। যদি দয়া পরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন একটু খুলে দেয়, নিদেনপক্ষে একটু ঢিলে করে দেয়। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিসফিস করে সে বললো–'সাবধান'। হাত খোলা দেখলে কিন্তু আপনাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে।' কচি কণ্ঠ। বুঝলাম অল্প বয়সী কোনো ছেলে এবং সে বদর বাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনিভাবে রাখলাম, যাতে–আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছিল, যে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল আট নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দু'হাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারা কক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখন সেখানে ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জি। আমার মতো প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ কাটা ছেঁড়ার দাগ। হাতের বা

পায়ের আঙ্গুল কাটা, কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত, কারো হাত পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

ছেলেটিই আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মতো করে দিল। আমি ভাবছিলাম–আমি কি করে এই জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচব। কক্ষটিতে শুধু একটি কাচের জানালা তবে মনে হলো বেশ মজবুত। এল টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটি সম্ভবত মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী এলাকার কোথাও হবে।

'এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদর বাহিনী বা রাজাকারের দলের লোকজন আরও কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন চারজন লোক আমাদের কক্ষে এল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এক এক করে সবাইকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে–আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; কেউ বলল–আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চীফ একাউনটেন্ট, আমি কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালের সার্জনের ছেলে। লোকগুলোর একজন বলে উঠলো, 'শালারা সব ইন্ডিয়ান স্পাই আর ইন্টারন্যাশনাল স্পাই।' একজন আবার বলল, 'শালা, তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এদ্দিন মন্ত্র পড়িয়েছ, আজি আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গবর্ণমেন্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গাদ্দারী করেছ। এবার টের পাবে।'

'জিজ্ঞাসাবাদের পর শুরু হলো প্রহার। এমনি ধুমধাম মার দেওয়া শুরু হলো যেন নিশ্বাস ফেলারও জো নেই। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া দরুদ পড়ছে, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মারধোর করে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লোকগুলো চলে গেল। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। এক অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,–ভাই, আপনার হাত কি খোলা? আমার হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন, লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নিচে নামিয়ে দেন, খানিক করে কোনোক্রমে দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনি আচ্ছন্ন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।'

'রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদর বাহিনীর জল্লাদরা এসে আমাদের খানিক পর পর দেখে গেল। রাত প্রায় সাড়ে ১২টায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাইনি। আমি আল্লাকে ডেকে যাচ্ছি–শেষবারের মতো আল্লার কাছে আমার যদি কোনো গুনাহ হয়ে থাকে তার জন্য পানাহ চাইছি।'

'রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলের গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিস ফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার

ভয়ের হিম স্রোত চকিতে ভরে উঠলো। খানিক পর একটা লোক এসে আবার আমাদের দেখে গেল। তারও খানিক পর কয়েকজন লোক আমাদের ঘরে ঢুকলো। তারাই আমাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল।'

'এরপর বদর বাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দু'জন দু'জন করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাব ভাব, ফিস ফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হলো–আর রক্ষা নেই। বাস ছেড়ে দিল, বাসের সব ক'টি জানালা উঠানো। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতকগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড় বড় এবং কোনাকুনি লাঠি দিয়ে আটকানো। কিন্তু তারা আমাদেরকে ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ, তার সুমুখে একটা বিরাট বিল, মাঝে মাঝে কোথাও পুকুরের মতো রয়েছে। বটগাছের আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম ১৩০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাঝে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরনের লুঙ্গি হাঁটুর ওপর উঠিয়ে রেখেছি। চোখ বাঁধা অবস্থায়ও যে আমি দেখতে পাচ্ছি তা বদর বাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারেনি। বদর বাহিনীর লোকজনের হাবভাবে স্থিরনিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। আমি এখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি-কি করে বাঁচা যায়।'

'দেখতে পেলাম–বদর বাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মত বন্দি একজন চিৎকার করে বলে উঠলেন–'আপনারা বাঙালি হয়ে আমাদের মারছেন। কোনো পাঞ্জাবী যদি মারত তাহলেও না হয় বুঝতাম, কেন আমাদেরকে হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কি অন্যায় করেছি?' ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের এক ঘা দিয়ে বদর বাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠল,–'চুপ কর শালা।' কে যেন একজন বলে উঠলো–'আমাকে ছেড়ে দিন, দশ হাজার টাকা দেব।' কোনো একজন মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন–'আপনারা আমার বাপ, ভাই। আমাকে মারবেন না।' চারিদিকে মাতম, আহাজারি, তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা সামনের ফাঁকা মাঠে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে–কোনো উপায় আর নেই।'

'আবার মনে হচ্ছে–বাঁচার কি কোনো উপায় নেই; জল্লাদদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার পেছনের লোকের গেঞ্জির সাথে আমার গেঞ্জি সে ভালো করে বেঁধে দিল। হঠাৎ সে সময় পেছনের লোকটি বলে উঠল–আজিজ ভাই, তুমি! তুমি আমাকে মারতে নিয়ে এসেছ! তুমি থাকতে আমারে মেরে ফেলবে! আপসোস! রাইফেলধারী লোকটি কোনো কথা না বলে চলে গেল।'

'বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে, ছুঁড়ছে গুলি। চারদিকে আর্ত চিৎকার, মাঝে মাঝে জল্লাদের দলের কেউ কেউ চিৎকার করে বলে

উঠছে—শালাদের খতম করে ফেল। সব ব্যাটাদের খতম করে ফেলবো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্তচিৎকারের সাথে পৈশাচিক হাসি। এমন নারকীয় তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমি জীবনপণ করে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সম্মুখের প্রায় তিরিশজনকে ততক্ষণে সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে খতম করে ফেলেছে বদর বাহিনীর পশুরা। ত্রস্ত হাতে আমি গেঞ্জির গিট খুলে ফেললাম। বামহাতের দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নিচে চাপা দিয়ে রাখলাম। হাত আবার পেছনে দিয়ে রাখলাম। বদরবাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন—আমার কাছে তোরা দায়ী থাকবি। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলল্লাহ। মাগো...। আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাবার পর 'এই' 'এই' বলে তাঁক ডাক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই। শুনতে পেলাম গুড়ুম গুড়ুম করে দু'টি আওয়াজ। অন্ধকারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পড়লো কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার দু'টি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু অন্ধকারে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আমি পানি ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। দূর থেকে আমার দিকে টর্চের এক ঝলক আলো ভেসে এলো আবার দু'টি গুলির শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলাম আবার পানির মধ্যে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম। এর পর শুকনো বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই, কিন্তু আমি তখন দিকভ্রান্ত। নিরাপত্তার জন্য নদীর পাড়ে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশি বাকি নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম, নদী থেকে। বাকী রাত কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক ঝুপড়ির মধ্যে। সকালে রোদ ওঠার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না—কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে চললাম এগিয়ে। খানিক চলার পর শুনতে পেলাম—কারা যেন আমায় ডাকছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম—এরা গ্রামবাসী। তাদের কাছে সব কথা বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বলল—ওটা হলো রায়ের বাজারের ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে আমি আটির বাজারে মুক্তিফৌজের কমান্ডারের সাথে দেখা করি। তিনি আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'দিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। তখনও বুঝিনি, এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সত্যি কি বেঁচে গেছি আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছেন।'

পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ
সেরা নিয়াজীর বিল্লি নিয়াজীতে রূপান্তর

যতই বীরত্বের কথা বলুক না কেন অক্টোবর নভেম্বরের থেকেই নেতৃত্ব স্থানীয় আলবদরা বুঝছিল, অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এক আলবদর বলছিলেন, তারা চারদিকে ঘেরাও হয় গেছেন। এ এক 'গোলযোগপূর্ণ বছর', এক কথায় 'ঘূর্ণাবর্ত'। তাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন তারা–

১. ভারতীয় দুষ্কৃতিকারী
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদী [প্রধানত আওয়ামী লীগ]
৩. কমিউনিস্ট
৪. হিন্দু
৫. কয়েকস্থানে নিজস্ব বাহিনী [এর অর্থ পরিষ্কার নয়]
৬. অবাঙালি। অবাঙালিদের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্ব ছিল। আলবদররা বাঙালি। সুতরাং, বিহারিদের কাছে আলবদররাও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

এ সব কারণে বিচলিত হলেও তারা বিপর্যস্ত হয়নি। কারণ, তারা বিশ্বাস করত, 'আলবদর ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তান ও দেশের জনগণকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে। পরকালে তারা প্রতিদান পাবে।'

এরমধ্যে ঈদ এল। তার মধ্যেও আলবদররা দুশমনদের ছায়া দেখছিল। হিন্দু দুশমনদের কল্পিত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য তারা ব্যবস্থা নিয়েছিল। এর বর্ণনা দিয়েছেন আলবদর বাহিনীর প্রধান একজিকিউসনার বা প্রধান জল্লাদ বা প্রধান খুনী। তার ভাষায়– 'পূর্ব পাকিস্তানে ঈদের আনন্দের উপর জয়ের ছায়া প্রবল। দুশমন আনন্দের দিনটিকে কান্নার দিনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছিল। দুশমন গোটা পূর্ব পাকিস্তানে ঈদের জামায়াতগুলিতে ধ্বংসকারী হাতিয়ার দিয়ে হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল। ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পারার পর ইসলাম পছন্দ জনতা এই অমানবিক হামলা প্রতিহত করা ও তাদের সাহায্যের জন্য ইসলামী চেতনায় উদ্দীপিত আলবদর

তরুণদের আহ্বান করেছে। আলবদর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সকল রাজাকারকে ক্যাম্পে ডেকে পাঠিয়েছে। তারা এই প্রতিজ্ঞা নেয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সব এলাকায় ঈদের নামায আদায় শুরু হবে, এবং ঈদের আনন্দ উদযাপন করা হবে। নিজেদের আরাম বিশ্রাম ত্যাগ করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকার কেন্দ্রিয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, পল্টন ময়দান এবং অন্যান্য ঈদের জামায়তের চারদিকে সশস্ত্র আল বদর যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। এটি বিস্ময়কর প্রাণ উদ্দীপক দৃশ্য ছিল! লোকেরা ঈদের নামাযে শরীক হয় এবং হাসি-খুশিভাবে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যায়। যখন সব লোক বাড়ি ঘরে চলে গেছে, তখন আলবদরের মুজাহিদরা নিজেদের অস্ত্র জমা রেখে দু রাকাত নামায আদায়ের জন্য কেবলামুখি দণ্ডায়মান হয়। নামাজ শেষ করে এই লোকেরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করছিল যে, ইয়া আল্লাহ পাকিস্তানের হেফাজত কর। এর পরে অশ্রুসিক্ত নয়নে একে অপরের সঙ্গে গলাগলি করল। এই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত দৃশ্য। তাদের কাছে নতুন কাপড় ছিল না। আর ছিল না নতুন জুতা। তারা নিজের ঘর, বাপ-মা, ভাই-বোন পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছ থেকে দূরে ছিল। কিন্তু তাদের কোন আফসোস ছিল না। বেদনার অনুভূতিও ছিল না। আমার এখনো চোখে ভাসছে সেই প্রিয় চেহারাগুলো, নুরুল আমীন, আব্দুল্লাহ ইউসুফ, বশীর আর অন্যান্য। এই প্রাণ উদ্দীপক আবেগভরা দৃশ্য এখনো আমি আমার দিলের আয়নায় দেখে নিই। পুনরায় এই চিন্তার জগতে হারিয়ে যাই যে, আমার সেই সাথী সেই প্রিয়জনরা আজ কোথায়। যারা নিজের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছিল। ঐদিন-জি হ্যাঁ-সেই ঈদের দিন, আল-বদরের বাহিনী দুশমনের গোপন আস্তানাগুলোর উপরে কহর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সেক্টরে তাদের নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছিল। ভারতের বহু অনুচর আটকাও পড়েছিল। তাদের কাছ থেকে বহু অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল।' এ ছিল আলবদরের ঈদ!

আর এই ছিল আল-বদরের কাছে সত্যিকার ঈদ আনন্দের, তবে উদাস দিবস। এই বর্ণনা ১৯৭৩ সালে। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত *হাম কদমে* সংকলিত।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে ছাত্র সংঘের বা আলবদরদের একটি দল তাদের সুপার বস মওদুদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্য। আলবদররা তাকে জানালো-'মওলানা, আমরা ফিরে গিয়ে জেহাদের ময়দানে যাব। আপনার দোয়ার ছায়াতলে আমরা পূর্বপাকিস্তানে পৌছব। সেখানে ভারত তার সৈন্য সামন্ত ও সহযোগীদের দিয়ে অঘোষিত যুদ্ধ চাপিয়ে রেখেছে।

মওদুদী জানান, সুস্থ থাকলে তিনিও লড়াইয়ে থাকতেন। তিনি জানালেন-

১. দুই পাকিস্তানকে ইসলামের বন্ধনই টিকিয়ে রাখতে পারতো কিন্তু শাসকরা সেদিকে মনোযোগ দেয়নি।
২. রাজনৈতিক দলগুলোই মাশাআল্লা বন্ধনকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহী দু'দল মিথ্যা সব ওয়াদা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

৩. যতটুকু ঐক্য ছিল ইয়াহিয়া খানের 'অন্ধ আর্মি অ্যাকশন' তা নষ্ট করে দিয়েছে। [তার এ মনোভাব গোলাম আযমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বরং গোলামরা মনে করতেন আর্মি অ্যাকশন ছিল পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখার উপায়]।
৪. ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে। সোভিয়েত, রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা তাতে সমর্থন যোগাবে। [আমেরিকা সমর্থন যোগায়নি]
৫. আল্লাহ না করুক এরকম পরিস্থিতি হলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।
৬. তা যদি না হয়, যে ক্ষতি হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের তা সামলাতে ৫০ বছর লাগবে। পরস্পরের আস্থায় আনতে সময় লাগবে।

এরপর মওদুদী যা বলেন প্রণিধানযোগ্য–

'একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন। সেনারা কারো ওপর বেশিদিন আস্থা রাখে না। তাদের স্বভাব হলো, বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর সর্বপ্রথম সাহায্যকারীদের আক্রমণ করে।'

মওদুদী আরো বলেন–

'আমার কাছে ইসলামী ছাত্রসংঘের ছেলেরা আমার ছেলের চাইতেও প্রিয়। ছাত্রসংঘের কোনো কর্মীর শাহাদাতের খবর আমার ওপর অভিঘাতের সৃষ্টি করে। কিন্তু আপনারা ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের যে পথে এগিয়ে যাচ্ছেন সে পথে হিজরত ও শাহাদাত একটি মাইলফলক। এ ধরনের আরজ এলে আজীমতের [অবিচল] পথ ত্যাগ করবেন না।'

শেষ রক্ষা হলো না। শের [বাঘ] নিয়াজী বিল্লি নিয়াজীতে পরিণত হয়ে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে রেসকোর্সের ময়দানের আত্মসমর্পণ করে যেখানে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানে আমাকে অনেকে বলেছেন, পাকিস্তান টিভিতে মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জন্য আত্মসমর্পণের চিত্র দেখানো হয়েছিল। এটি দেখেই পাকিদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে আসে। ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে তারা তখন আত্মহারা। দিকে দিকে মাতম। হিন্দু ভারতের কাছে, কমজোর বাঙালির কাছে ইসলামের দারোয়ানরা হেরে গেল! এ ঘটনা তারা মেনে নিতে পারছিল না।

বাংলাদেশেও আলবদররা বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না। পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ করতে হবে। তারাও ক্ষোভে দুঃখে কাতর হয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণের ঠিক আগের কিছু বিবরণ দিয়েছেন মনসুর তার গ্রন্থে–

আমরা অস্ত্র সমর্পণ করছি 'কর্নেল বললেন'–

'আবু আতের (চিলাহাটি রংপুর) বলেন, ৩ ডিসেম্বরের আগে এ রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু যেদিন যুদ্ধের ঘোষণা হল, অন্যায়ভাবে এবং কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই পাকবাহিনী চিলাহাটি ছেড়ে চলে এল আর তহসিল

নীলফামারি থেকেও তাদের সৈন্যদের বের করে নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে ১০ মাইল পেছনে কামারগঞ্জে গিয়ে শিবির স্থাপন করল। এসব কিছুই হঠাৎ করে এবং কোনো সলাপরামর্শ ছাড়াই করা হয়। আগের নিয়মে রণাঙ্গনের দিকে আল বদর চার মাইল সামনে ছিল। যদিও আমাদের এই দলটি পাকবাহিনীর কমান্ডের অধীনেই ছিল।

নতুন পরিস্থিতিতে আল বদরের মত পাকবাহিনীর তরুণ সৈনিকরাও খুবই চিন্তিত ও অসন্তুষ্ট ছিল। তারা একথা বুঝতে পারছিল না যে, বিনা কারণে নিজস্ব এলাকা ছেড়ে কেন চলে যাওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তান এলাকায় প্রবেশ করছিল। তাদের প্রথম লাইনের মোকাবেলা আল বদর দুই দিন ধরে বাংকারের মাধ্যমে করছিল। আল বদরের কাছে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিল।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে পাক আর্মি অনেক পেছনে থেকে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে। আর আলবদরকে পেছনে সরে আসার বার্তা পাঠায়। আমরা পেছনে সরে এসে ডোমার থানায় চলে এলাম। এরই ফাঁকে রণাঙ্গনে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল।

৭ দিন পর্যন্ত আমাদের মাঝে কোনো যুদ্ধ হয়নি। শুধু ভারতীয় হেলিকপ্টার মাঝে মাঝে চক্কর দিয়ে চলে যেত। আমাদের রাইফেল তাদের কিছুই করতে পারেনি। আমরা তখনও পাকিস্তানী আর্মির চেয়ে তিন মাইল সামনে খানসামা নামক স্থানে মোর্চা করে রেখেছিলাম।

অষ্টম দিন ভারতীয় বাহিনী হেলিকপ্টার ও ট্যাংকের সাহায্যে আল বদরের মোর্চা (বাংকার) গুলোর ওপর হামলা চালায়। তখন আল বদর ক্যাম্পে মাত্র ৯৫ জন ক্যাডেট ছিল। এক ঘণ্টা পর্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল। গাছের জঙ্গলের কারণে দুশমন আমাদের শক্তির সঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। তারা সামনে আসতে ইতস্তত করছিল।

আমাদের পেছন থেকে পাক আর্মি ট্যাংকের গোলাবর্ষণ শুরু করে। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যা ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত ছিল। আর ভারতীয় বাহিনী নতুন করে ফোর্স আসা সত্ত্বেও পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু পাক আর্মি এডভান্স করেনি। তবে সাপ্লাই লাইন ঠিক রাখে এবং আমাদের কাছে নতুন অস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সিপাহী বেশারত বড় দুঃসাহস নিয়ে লড়াই করে। তিনি চায়না এন্টি ট্যাংক গানের সাহায্যে দুশমনের দুটি ট্যাংক ধ্বংস করেন। কিন্তু আরেকটি ট্যাংকের গোলার আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। তার সঙ্গে ৩ জন রাজাকার ও ৭ জন আল বদর শহীদ হয়ে যান।

পরের দিন বারটার সময় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। তখন পাক আর্মি অন্যায়ভাবে পশ্চাদপসরণ করে। তারা ৭ মাইল পেছনে সরে আসে।

আল বদর ৪ মাইল সামনে ভারতীয় বাহিনীর সামনা সামনি ছিল। পাক বাহিনীর আর্মি আরো পেছনে সরে এসে দরওয়ানি রেলওয়ে স্টেশনে শিবির স্থাপন করে। পরের দিন কর্ণেল সাহেব আল বদর কমান্ডারকে ডেকে বললেন, এখন আপনারা নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা নিজেরা করুন। আমরা অস্ত্র সমর্পণ করছি।

এ কথা বলেই কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি একটি জীপের উপর সাদা পতাকা উড়িয়ে দুশমনের সারির দিকে চলে গেলেন।

এবার পাকিস্তানী ছিল সামনে আর আলবদর পেছনে। পাক আর্মির অফিসাররা হেলিকপ্টারের সাহায্যে ঢাকা রওনা হয়ে গেল। আমরা আল বদররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম অথবা দেশ ত্যাগ করলাম।'

তোমরা চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের গাদ্দার

ক্যাপ্টেন আব্দুল করিম (চট্টগ্রাম) বলেন যে, '১৬ ডিসেম্বর সকালে আমি আলবদর ক্যাডেট সলিমুল্লাহকে বললাম যে, পাকিস্তানী বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করছে। সে তখন তা মানতে অস্বীকার করে এবং এক ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমি যখন তাকে বললাম যে, এটি ঠাট্টা নয় সত্যি। তখন তার উপর কিয়ামত কাণ্ড ঘটে গেল। তার চোখ দুটি যেন ফেটে পড়ল এবং দুঃখের প্রচণ্ডতায় ঢলে পড়ছিল। আমি তাকে ধরলে সে আমার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে বললাম যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত সেনারা এটা চাচ্ছিল না যে, কিন্তু তাদেরকে একাজ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

একথা শুনে সে দাঁড়িয়ে গেল। রাগে তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। সে বলল, 'এ হুকুম কে দিয়েছে?' আমি বললাম, 'খুব সম্ভব ইয়াহিয়া খানের হুকুম।'

সলিম উল্লাহ গর্জে উঠলেন, 'ওহে ইয়াহিয়া খানের হুকুম মান্যকারীরা। তোমাদের কী কায়েদে আজমের এই হুকুম মনে নেই যে, কখনো যদি পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য লড়াই করতে হয় ময়দানে লড়বে, সমুদ্রে লড়বে, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়বে, কোনো অবস্থাতেই দুশমনের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করবে না।'

আমি নীরব ছিলাম, আর সালিম উল্লাহ'র আবেগ আশ্রিত গর্জন অব্যাহত ছিল। 'হে জালেমরা! দুশমনের সামনে অস্ত্র সমর্পণকারীরা। তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কীভাবে মুখ দেখাবে?'

সালিম উল্লাহ ফিরে যাবার জন্য ঘুরলে আমি তাকে বারণ করতে গিয়ে আস্তে করে বললাম, 'এখন সেখানে ফৌজ অস্ত্র সমর্পণ করছে। এ সময় আল বদর সেখানে লড়াই করতে যাওয়াটা বিজ্ঞদায়ক হবে না। কাজেই এখন উচিত হবে যে, আপনি...'

আমি এটুকুই বলেছি, তিনি আমাকে জোরে বলছেন যে, 'বাঘের এক দিনে জীবন গণ্ডারের একশ বছরের বেঁচে থাকার চাইতে উত্তম।' তারপর সে সবেগে বাইরে চলে গেল। আজ আমার জানা নেই যে, সে এখন কোন অবস্থায় আছে।"

আসামের জঙ্গল হতে গেরিলা যুদ্ধের প্রোগ্রাম

আহমদুর রহমান (খুলনা) তার এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জানান যে, ১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় ফৌজ যশোহরকে পদানত করে খুলনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। যশোহর থেকে পাক আর্মির একটি বড় অংশ খুলনা এসে গিয়েছিল। কিন্তু খুলনা থেকে সমুদ্র পথ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা ছিল না।

'যশোহর থেকে আসা আল বদর সাথীরা বললেন যে, ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছিল। আমরা সবাই আগের নিয়মে সম্মুখ বাংকারে ছিলাম। তখন পেছন থেকে কোনো ফৌজি অর্ডার আসার কারণে অথবা কোনো কৌশলগত কারণে আমাদের না জানিয়েই পাকিস্তানী বাহিনী আস্তে আস্তে যশোহর ছেড়ে দেয়। আমাদের অধিকাংশ সাথী বাংকারের মধ্যেই নির্যাতনের শিকার হয়েই পিষ্ট হয়েছেন। তাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়, যারা চুপে চুপে খুলনা চলে এসেছে।

এ অবস্থা জানতে পেরে আমরা ভীষণ কষ্ট পেলাম। কিন্তু যুদ্ধ তো হয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্যই। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের কাছে অস্ত্র সমর্পণের সিগন্যাল আসে। কিন্তু আমাদের কমান্ডার বি. মুহাম্মদ হায়াত খান এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এতদসত্বেও তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, পরিস্থিতি ঘোলাটে। 'আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যেতে পারেন। অন্যথায় নিজেদের ঠিকানা ঠিক করার দায়িত্ব আপনাদের উপর।'

একটু পরেই বৈঠক হল। যেখানে ১১ জন রোকন উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খুলনার। আর দুই জন যশোহরের। প্রথম প্রস্তাব ছিল লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যাব। দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, নিজেদের শক্তি ধরে রাখা হোক। যাতে ইসলামী আন্দোলনের কাজ অব্যাহত রাখা যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী পাশ হয়ে যায়। একবার আমরা সাথীদেরকে প্রয়োজন অনুসারে টাকা পয়সা সরবরাহ করলাম। আর তাদের বললাম যে, 'আপনারা যেখানে ইচ্ছা আত্মগোপন করুন।' এরপর আমরা বাধ্য করে আমাদের কর্মীদের খুলনা ছাড়া করি। কিন্তু একই সাথে এই স্কিম নিয়েও চিন্তা ভাবনা অব্যাহত রাখলাম যে, আসামের জঙ্গলে আত্মগোপন করে দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতীয় বাহিনীর নাকে দম দেয়া যাবে।

এ কথাটির উপর আলোচনা চলছিল। এ সময় পাকিস্তান আর্মির দুজন মেজর তৎক্ষণাৎ আগে বেড়ে বললেন : 'আমরাও আপনাদের সাথে যাব।' এরপর সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে খোরাকী ঔষধপত্র, হালকা অস্ত্র ও হাতবোমার একটি তালিকা তৈরি করা হল। তারপর ১শ প্রাণ উৎসর্গ সাথীদেরকেও বাছাই করা হল। যারা স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে মজবুত ছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে সেই পরিকল্পনা রহিত করা হয়।

৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ভারতীয় বাহিনী খুলনায় প্রবেশ করে। কিন্তু তখনও পাকিস্তানী অফিসাররা অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। কিন্তু তা কতক্ষণ পর্যন্ত?'

আপনারা যুদ্ধ করতে না চাইলে বাংকার আমাদের কাছে দিয়ে দেন

আব্দুস সালাম (রাজশাহী) বলেন যে, রাজশাহীতে ৯ ডিসেম্বর আর্মি সারেন্ডার করে। '১৮ ডিসেম্বর আমরা রাজশাহী থেকে তিন মাইল দূরে নাটোর বি. হেড কোয়ার্টার চলে গিয়েছিলাম। প্রায় ৮ জন কর্মী আমার সঙ্গে ছিল। এরা সবাই নর্থ বেঙ্গলের বিভিন্ন এলাকা হতে এসেছিল। তাদের মধ্যে রাজশাহীরও ৩ জন সাথী ছিল।

পাবনা বগুড়া জেলা ৮ ডিসেম্বরের আগেই আর্মি ছেড়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেও আমাদের বাছাই করা কর্মী ও আল বদরের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত

মুজাহিদরা নাটোর পৌঁছে। এটি ছিল নর্থ বেঙ্গলের ব্রি. হেড কোয়ার্টার। নাটোর আমরা ৮ জন আল বদর ছিলাম। আব্দুল কাইয়ুম, ফারুকুর রহমান, গোলাম আলী মিয়া, আবুল হাশেম, আজীজুদ্দীন, আবদুল জব্বার, কুরবান, আসগর ও আমি।

যশোর ৬ ডিসেম্বর আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার পতন পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী ও ইন্ডিয়ান আর্মি রাজশাহী শহরের উপর কোনো হামলা করেনি ঢাকার পতনের পর আমরা আর্মির কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, 'আপনারা তো অস্ত্র সমর্পণ করবেন না।' তখন তারা বলতেন যে, 'প্রশ্নই ওঠে না।' যেহেতু আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল যে, রাজশাহী সংরক্ষিত থাকবে। সেখানকার রেডিও স্টেশনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমরা ফৌজকে বলে রেখেছিলাম যে, 'যদি আপনারা লড়াই করতে না চান তাহলে বাংকার আমাদের কাছে ছেড়ে দিবেন।'

১৮ ডিসেম্বর কমান্ডার বললেন যে, আমরা আর্মিকে নাটোর শিফট করছি। তারা ঐ সময়ও আমাদের কথায় বলেননি যে, তারা সারেন্ডার করতে যাচ্ছেন। আমরা এটাকে সাময়িক কৌশল মনে করে তাদের সঙ্গে নাটোর যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল বেলা আমরা দেখলাম যে, ছাউনির চারদিকে ভারতীয় ফৌজ ও মুক্তি বাহিনী পজিশন নিয়ে রেখেছে। এ সময় [ভারতীয়] কর্ণেল সাহেব বললেন যে, 'আমরা যে পাঁচজন লোক আছি আমরা কোথায় যাব?' এটাই উচিত যে, একটি সামরিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আমাদেরকেও সেনাবাহিনীর সাথে রাখুন।' কিন্তু ভারতীয় সেনারা বললেন যে, আমরা কোনো বাঙালি রাজাকারকে এরেস্ট করব না, তাদের সাথে মুক্তি বাহিনীই ফয়সালা করবে। মোট কথা সকাল সাড়ে আটটার সময় যথারীতি অস্ত্র সমর্পণ করা হয়। আর আমরা তা দেখতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল যে, সমগ্র দুনিয়ার শয়তান যেন আমাদের দেখে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল।

আপনারা চাইলে আমাকে মেরে ফেলুন

আবু নসর ফারুকী (ঢাকা) এর বর্ণনা মোতাবেক ধানমণ্ডি ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন শাহেদ ভাই। '১৫ ডিসেম্বর রাতে খাজা খায়রুদ্দীন সাহেবের ফোন এল যে, 'পাক ফৌজ সারেন্ডার করছে আপনার চিন্তা কী?'

শাহেদ ভাই জবাব দিলেন, 'ফৌজ সারেন্ডার করতে পারে কিন্তু শাহেদ অস্ত্র সমর্পণ করবে না।'

ফোনের মাধ্যমে এটিই ছিল আমাদের সর্বশেষ যোগাযোগ। এরপর ভারতের গেরিলা ব্রিগেড ফোনের সকল তার কেটে দেয়। আমরা তৎক্ষণাৎ দুটি গাড়ি প্রস্তুত করি। এগুলোর উপর লাউড স্পিকার বসিয়ে লোকদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য শহরে টহল শুরু করে দিলাম। আমরা তকবির ধ্বনি দিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে ছোট ছোট বক্তব্য দিয়ে লোকজনকে নিশ্চয়তা দিচ্ছিলাম যে, আমরা দুশমনকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব।

বিভিন্ন স্থানে লোকেরা আমাদের শ্লোগানের জবাব এ ধরনের আবেগ ও জোশ নিয়ে প্রদান করে। আমরা রাত আড়াইটা পর্যন্ত শহরের প্রায় বড় বড় সড়ক প্রদক্ষিণ করি। অবশেষে মুহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে পৌছলাম। যেখানে আল বদরের সাথীরা একত্রিত হয়েছিল। এখানে আমরা একটি গ্রুপ গঠন করলাম। যেই গ্রুপকে জমিয়তের (সংঘ) দপ্তর ১৫ পুরানা পল্টন খুররম মাহমুদের বাড়ি ও আল বদর এডুকেশন সেন্টারে নিয়ে পরিস্থিতি মূল্যায়নের করার দায়িত্ব দিলাম।

ঐ লোকেরা চলে গেল। অন্যান্য সাথীদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলাম। এ কাজ থেকে অবসর হয়ে আমি পুনরায় মুহাম্মদপুরে পৌছলাম। সেখানে অবস্থা বলার মত ছিল না। রাত বিনিদ্রায় কাটল। ফৌজ না ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করল। আর না বুঝা গেল যে, লোকজন কি চিন্তা করছে। দ্বিতীয় দিন আমরা যৎকিঞ্চিত নাশতা বিতরণ করেছিলাম। এ সময় রোকন ভাই এফ. এম. কামাল এলেন। আর বললেন, মুস্তাফা শওকত ইমরান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়েছেন। তার কাছ থেকে এটাও জানা গেল যে, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ছিল আমাদের জন্য ১৬ ডিসেম্বরের অলক্ষুণে সংবাদ।

কিছুক্ষণ পর সাদা পোষাকে আবৃত পাক বাহিনীর একজন মেজর এলেন। তিনি বললেন যে, 'সারেন্ডার হয়ে গেছে আপনারা যেখানে ভাল মনে করেন সেখানে চলে যান।' আমাদের সাথীদের এই দুর্ঘটনা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কয়েকজন জোশওয়ালা সঙ্গী ক্ষেপে উঠলেন। তখন ফৌজি অফিসার বললেন যে, 'আপনারা চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু আমি তো হুকুম তামিল করতে গিয়ে আপনাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ ও জান বাঁচানোর পরামর্শ দিতে এসেছি।'

ঐ সময়ে আমাদের মধ্যে যেসব আবেগ তরঙ্গায়িত ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দুশমন তার লোক লস্কর নিয়ে ঢাকার উপকণ্ঠে এসে পৌছলেন তখনও পর্যন্ত ঢাকায় প্রবেশ করেনি। এরকম, অনেক বর্ণনা আছে। আমি আর বিস্তৃত করব না, শুধু সবশেষে চিফ জল্লাদ আশরাফুজ্জামানের বিবরণটি উদ্ধৃত করছি–

আত্মসমর্পণের অপমান আমাদের সহ্য হয় না

আশরাফুজ্জামান (ঢাকা) ১৬ ডিসেম্বর অস্ত্র সমর্পণের আগ মুহূর্তে স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : ঢাকার পতনের কিছুদিন আগে আল বদরের মুজাহিদরা ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে সন্মুখ রণাঙ্গনে সরাসরি যুদ্ধরত ছিল। এমতাবস্থায় পাক বাহিনী তাদের না জানিয়ে এলাকা ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে আসে। এ অবস্থা জানতে পারার পর আমাদের কিছু মুজাহিদ তো রসদ না থাকা সত্ত্বেও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছিল। তবে অনেকেই ঢাকা ফিরে এসেছিল।

পাক বাহিনী ঢাকার আশে পাশে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা আনুমানিক ৮/৯ শত আল বদর মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের ক্যাম্প আর্মি হেড কোয়ার্টারের কাছে স্থানান্তর করা

হয়েছিল। ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের রাত দিন এমন ব্যস্ততার মধ্যে কাটছিল যে, খবর শোনার ফুসরত পর্যন্ত ছিল না। ১৬ ডিসেম্বরের সকাল বেলার ঘটনা। ৯ টার দিকে হবে। আমি নিয়মমাফিক দুই তিন জায়গা অপারেশনের প্রোগ্রাম বানিয়েছি। আর্মি ক্যাম্প থেকে রওনা হব। এমন সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সংঘের সভাপতি ও ঢাকা শাখার সভাপতি আর শওকত ইমরান (ইনচার্জ, তথ্য বিভাগ) এবং আর দু একজন সাথী গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন। তারা বলতে লাগলেন যে, রাতে আমরা ভয়েস অব আমেরিকা ও বি বি সি থেকে শুনেছি যে, পাকিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেছে। আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে প্রকৃত অবস্থাটা জানি।

আমি বললাম যে, 'আমার হাতে সময় নাই। কারণ দুএকটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করতেই হবে। আমার তো মনে হচ্ছে যে, পাকি বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করার খবরটি নিছক প্রগাগান্ডা।'

আমার অনুমান সেটাই ছিল। কিন্তু তারা জোরপূর্বক আমাকে আর্মি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। ওখানে প্রথমে কর্ণেল হেজাজীর সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, 'ভাল হয় আপনার ব্রিগেডিয়ার রশীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।'

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি মুক্তিবাহিনী ও আমাদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাত ৮টা নাগাদ আসল অবস্থা জানা যাবে।'

তখন মুস্তফা শওকত ইমরান জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আপনারা নিজেরা সারেন্ডার করছেন তবে আমাদের ব্যাপারে কী চিন্তা করছেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আপনারা সিভিল ড্রেস পরে সাধারণ লোকদের সাথে এলাকায় মিশে যান। অথবা উর্দিসহ আমাদের সঙ্গে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তখন আমাদের সঙ্গে যা কিছু করা হবে আপনাদের সঙ্গেও তাই করা হবে। তবে আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হল আপনারা আমাদের সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে যাবেন না।'

আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে, পাকিস্তানী ফৌজ কীভাবে হিন্দুস্তানী কাফেরদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করছিল। কামরান বললেন, 'আল বদরের একটি প্রাণীও এই অপমান সহ্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। আপনারা কমসে কম আজকে আমাদেরকে সেসব হাতিয়ার দিয়ে দেন, যেগুলো এখন দুশমনের কাছে সমর্পণ করবেন। আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা লড়াই করব।' ব্রিগেডিয়ার সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আমাদের ক্ষমতাই কতটুকু আছে। আমরা না অর্ডার দিতে পারি আর না অস্ত্র। যা উপর থেকে হুকুম আসে যে কোনো অবস্থায় তাই আমাদের তামিল করতে হয়।'

একথা শুনে আমরা ওখান থেকে চলে এলাম। ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কথাবার্তায় আমাদের বোঝা হয়ে গেল যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিশ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছে। মিলিটারি হেড কোয়ার্টার থেকে আমরা নিজস্ব ক্যাম্পে পৌছলাম এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সঙ্গীদেরকে অবহিত করলাম। যতদূর সম্ভব ছিল টেলিফোনের মাধ্যমে

আমাদের ফাঁড়িগুলোতে খবর দিলাম। তাদের নির্দেশনা দিলাম যে, শীঘ্রই সিভিল ড্রেস পরে আত্মগোপন কর। এই নির্দেশনা দিয়েই আমি (সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি) খুররম শাহ মুরাদের সাথে কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখান থেকে বের হলাম। এসব সাথীর মধ্যে আসাদুজ্জামান শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। আসাদুজ্জামান ছিল প্লাটুন কমান্ডার। আর ছাত্র সংঘের রোকন প্রার্থী। আমরা ধানমণ্ডিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে পৌছলাম। আমাদের কাছে তখন দুটি স্যুটকেস ছিল। এ দুটি অফিসের একজন চাপরাশের কাছে দিলাম। আর পুরো শহরের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে লাগলাম।

ঐ রাতে ৯ টার সময় টেলিফোনে সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত টেলিফোনের তারগুলো পাকবাহিনী কিংবা মুক্তিবাহিনী বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।'

আলবদরদের শেষ মুনাজাত বা আলবদর মুজাহিদের শেষ ভাষণ

ঢাকার পতনের পর 'বীর' আলবদররা পালাতে থাকে। মনসুর লিখছেন, পতন যখন আসন্ন তখন আলবদররা দিশেহারা অবস্থায় নির্দেশনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রভুরাও পালাতে ব্যস্ত। কে কাকে নির্দেশনা দেবে। বিকেলে যখন রেসকোর্সে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলছে তখন ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে বা সদর দফতরে ঢাকার আলবদররা মিলিত হলো, তাদের প্রভুদের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে তারা 'পেরেশান' এবং তাদের কী হবে এ ভেবে ছিল উদ্বিগ্ন ও 'ক্রন্দনরত'। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান [illegible] আলী আহসান মুজাহিদ আলবদরদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। খালেদ লিখেছেন, ঐখানে যেসব আলবদর উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে শুনে তিনি এই বক্তৃতাটি সংকলন করেছেন এবং পরে মুজাহিদ তা সংশোধন করে সত্যায়িত করেছেন। ভাষণটি উদ্ধৃত হলো–

"বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইন্না সালাতী"

নিশ্চয়ই আমার নামাজ আমার কুরবানী আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

মুজাহিদ সাথীরা,

আমাদের দেহ ও প্রাণ শুধু এবং শুধুই ইসলামের জন্য আমরা ইসলামের জন্যই এসব কাজ করছি। মাঝে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী সঠিক বলে জানতাম। আমরা পাকিস্তানকে উপাস্য মনে করে নয়, মসজিদ মনে করে আমাদের ঝুঁকি ও আমাদের ভবিষ্যতকে এর উপর ন্যস্ত করেছিলাম। আমাদের এই কাজ কেউ গ্রহণ করল কি করল না এর পরওয়া করি না। যার কবুল করা উচিত তিনি তো জানেন যে, আমাদের সামনে তার সন্তুষ্টিই ছিল মুখ্য।

এটা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল যে, আমরা জীবন বাজি রেখে বেরিয়ে পড়ব। পরীক্ষায় সেই মুহূর্তে আমরা তার কাছ থেকেই সাহায্য চেয়েছি এবং তার ওপর ভরসা করেই ঐ নাজুক পরিস্থিতিতে মিশে না যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

ওহে মজলুম পাকিস্তানের অসহায় সন্তানরা

আমাদের সঙ্গে আজকে যা কিছু হবার গতকাল সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলাম। আর আজকে আমরা সে বিষয়ে ওয়াকেবহাল যা আসন্ন আগামীকাল আমাদের জন্য নিয়ে আসবে। আমরা চলে যাওয়া গতকালের জন্য না লজ্জিত আর না আসন্ন আগামী দিনের জন্য নিরাশ। পরীক্ষা আল্লাহর শাশ্বত বিধান। আর আমাদেরকে শিখানো হয়েছে যে, পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা যদি এসেই পড়ে তাহলে ধৈর্য্যের জন্য দোয়া ও কামিয়াবীর আশা নিয়ে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে।

আজকের সূর্যটি একটি কঠিন পরীক্ষা সামনে নিয়ে উদিত হয়েছে। আর আগামীকালটি উদিত হবে ধিকি ধিকি আগুনের কয়লা বৃষ্টি নিয়ে।

আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর এসব পরীক্ষাকে একজন ঈমানদারের প্রত্যয় ও ধৈর্য নিয়ে এগুতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই প্রাণ দিয়ে দেয়া এমন বিরাট সৌভাগ্য যার চিন্তাও করা যায় না। আপন খোদার সাথে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বেহেশত ক্রয় করার আগে কি আমরা ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করিনি?

পরীক্ষার এ মুহূর্তগুলো এ জগতে সাফল্যের সুসংবাদও বটে। কাজেই এসব কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হোন ঈমান প্রত্যয় ও স্বাধীন চেতনার দোয়া নিয়ে। কেননা প্রত্যয় ও ঈমানের কখনও বিনাশ নাই।

ওহে দুনিয়া ভরা সকল সাফল্যের চেয়ে প্রিয় বন্ধুরা,

আপনারা আজকেও এক সময়ের অতি মূল্যবান সম্পদ দ্বীনকে কায়েম করা, সত্যের সাক্ষ্য দেয়া, ও ইসলামী বিপ্লবের জন্য আপনাদের জীবনকে হেফাযত করা আপনাদের উপর ফরজ। যদি আপনাদের ঘরের দহলিজগুলো আপনাদের জন্য বন্ধ এবং আরাম আলয়গুলির প্রশস্ততা আপনাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয় তাহলে হিজরত করে চলে যাবেন। কেননা হিজরত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন পথের অনিবার্য সফর। হিজরত আল্লাহর সর্বশেষ নবীর সুন্নত।

হিজরতের কষ্ট ও দুঃখসমূহের বেলায় কুরআন, নামাজ, রাসূলে খোদার সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাত জীবনী থেকে আলো গ্রহণ করবেন। কেননা জীবনের অন্ধকার পরিমণ্ডল এগুলোর দ্বারাই আলোকিত হতে পারে।

আর ভুলবেন না। আপনারাই আলোর আমানতদার। আর আলো হচ্ছে কোরআন, সীরাত ও কর্ম। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন সেখানেই এই আলো জ্বালাবেন।

ওহে আমার ভাইয়েরা,

কার জানা আছে যে, আগামীকাল আমাদের মধ্যে জীবিত থাকবে এবং কার সাথে কার দেখা হবে। আর ওখানে তো অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। তবে এই জগতে ছড়িয়ে যাওয়ার আগে সেই চেহারাগুলো প্রাণভরে দেখে নিন এই রক্তগুলোর সাথে শেষ বারের মত আলিঙ্গনবদ্ধ হোন। কারণ হয়ত আরও একবার এখানে এভাবে একত্রিত হতে পারবে না।

তবে আমাদের প্রতিপালক যদি চান আর যদি তিনি চান তাহলে আমরা আবারও এখানে মিলিত হতে পারি।

সাথীরা, বন্ধুরা ভাইয়েরা,

এখন আমাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। আপনাদের অনুভূতিগুলো একত্রিত করে নিন। আল্লাহ আমাদের সহায় ও সাহায্যকারী। আসুন আমরা একে অপরকে দোয়ার সাথে বিদায় দেই। ফি আমানিল্লাহ।'

বক্তৃতা শেষ। আলবদরের ডেপুটি চিফ মুজাহিদকে সবাই 'অশ্রুসিক্ত নয়নে' ও 'কম্পিত ঠোঁটে' অনুরোধ জানালো পালাতে। কিন্তু মুজাহিদ বলেন, 'না, আপনাদের যাওয়ার পর আমি যাব। আমিই হবো ক্যাম্পের শেষ ব্যক্তি।'

আলবদররা তখনও ক্যাম্প ছেড়ে নড়ছে না। গলাগলি করে হিক্কা তুলে কাঁদছে। তখন মুজাহিদ বললেন–'আমি বাধ্য হয়ে আদেশ দিচ্ছি আপনারা হিজরতে বের হয়ে যান।' অর্থাৎ পালান।

তখন আলবদররা তাদের সদর দপ্তর ছেড়ে, তাদের ভাষায়, 'হিজরতে' গেল। আমাদের ভাষায় পালালো। নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যাকারী পাকিস্তানী সিপাহীদের ভৃত্য আলী আহসান মুজাহিদও বীরবিক্রমে ঢাকা ছেড়ে কাঠমুণ্ডুর পথে দৌড়াতে লাগলেন।

আলবদরদের পলায়ন

নিরস্ত্রদের ওপর যত বীরত্বই দেখাক না কেন, ১৬ ডিসেম্বর আলবদররা পালাতে লাগলো মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সীমান্ত অতিক্রম। আলবদরদের কিছু টেকনাফ হয়ে বার্মায়, কিছু পশ্চিমবঙ্গ, আর কিছু নেপাল পালালো। সেখান থেকে পাকিস্তান। যারা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি তারা নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে গেল, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের ভিড়ে ঢুকে গেল। আলবদরদের আত্মীয়স্বজনরাও তাদের সাহায্য করেছে, সমব্যথীরাও। আমার লেখা '*রাজাকারের মনে*' আলবদর খালেক মজুমদার ও শান্তি কমিটির আয়েনউদ্দিন কীভাবে কোথায় পালিয়ে ছিল তার বর্ণনা আছে। কিছু আলবদরকে হত্যা করা হয় কিন্তু সে সংখ্যা অনেক কম।

মনসুর লিখেছেন, অনেক আলবদরের ওপর অত্যাচার হয়েছে কিন্তু তারা তা সহ্য করেছে।

আলবদররা কীভাবে পালিয়েছিল মনসুর তার বর্ণনা করেছেন তাদের সাক্ষাৎকার থেকে। এখানে তিনজন কুখ্যাত আলবদরের পলায়নের কাহিনী উদ্ধৃত করছি মনসুরের ভাষ্য থেকে–

প্রথম কাহিনীটি হলো শেরপুরের বিখ্যাত আলবদর কামরানের। কামরান তখনও জানতেন না যে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। তবে, হঠাৎ গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার ধারণা হচ্ছিল কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে এবং তাদের ধারণা হলো, 'ভারতীয় সৈন্যরা এক এক করে দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীদের খতম করছে।' তারপর কামরানের ভাষায়–

'আমরা সারাদিন লুকিয়ে রইলাম। সন্ধ্যায় এ ধারণায় বাইরে বের হলাম যে, পরিস্থিতির হয়ত হাবভাব বুঝতে পারব। কিন্তু ঘর থেকে বের হতেই হিন্দুস্তানী সৈন্যরা আমাদের চারজনকে গ্রেফতার করে ফেলল। আমরা বললাম যে, আমরা গ্রাম থেকে এসেছি। এমনিতে এদিকে বের হয়েছি। প্রথমে তো আমাদের কথার উপর কেউ কর্ণপাত করল না। কিন্তু ৫/৬ ঘণ্টা পরে ছেড়ে দিল। এটা আমাদের জন্য

সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, ওখানে মুক্তিবাহিনীর কোনো লোক উপস্থিত ছিল না। শহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরে আমাদের এক সম্মানিত শিক্ষকের বাড়ি ছিল। হিন্দুস্তানী সৈন্যদের পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে সেখানে চলে গেলাম। উস্তাদ মহোদয় আনন্দের সঙ্গে আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। যখন কিছুটা স্বস্তি এল, সঙ্গীদের খোঁজার জন্য বের হলাম। জানা গেল যে, মকবুল আহমদ, ফরিদ উদ্দিন ও আরো ৫৮ জন আল বদরকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এটাও জানতে পারলাম যে, তাদেরকে খুব হিংস্র অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে।

শিক্ষক মহোদয়ের ঘরে আমরা তিনদিন থাকলাম। ভবিষ্যত প্রোগ্রামের ব্যাপারে যখন চিন্তা করা হল, তিন সাথীই বলল যে, আমরা এখান থেকে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাব। কথা মতো তারা চলে গেল আর আমি ঢাকায় চলে গেলাম। ওখানে আমাকে অনেক লোক জানত। তাই আশংকা ছিল কেউ যেন চিনে না ফেলে। আল্লাহর রহমত সাথী ছিল। আমি সেখানে ২০ দিন একটি ঘরে লুকিয়ে রইলাম। এরপর ১১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রওনা হলাম। এই বিবরণ সামনে বাড়ানোর আগে মনে হয় আমার পরিবার সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। আমরা দুই ভাই ছিলাম। বড় ভাই চাকরী করতেন। একটা ছোট বোন ছিল, আব্বাজান ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর রোকন। পতনের পর তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ সময়ে মা বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় শুধু ছোট বোনটাই তার কাছে ছিল। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু আমি এতখানি দূরে ছিলাম যে, অসুস্থতার সময় তার চোখে শীতলতা দিতে পারিনি। তার স্বামী ও জীবনসঙ্গী জেলের মধ্যে ছিলেন। বড় ছেলে একেবারে অর্থনৈতিক অবস্থায় পর্যুদস্ত। বুঝতে পারলাম যে, ধড়ফড় করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। ইন্তেকালের আগে মা গোপন সূত্রে খবর পাঠান যে, বাছাধন! মুক্তিবাহিনীর রক্ত পিপাসু হিংস্র জানোয়ারগুলো তোমার খোঁজে ঘরের চারপাশে জাল পেতে বসে আছে। তুমি এখানে এসো না। চট্টগ্রামে আত্মগোপন অবস্থায় আট মাস কেটে যায়। সেই নেহায়েত পেরেশানীর অবস্থায় ও জমিয়তের বিক্ষিপ্ত সাথীদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকি।

ইচ্ছা ছিল এই দেশ থেকে অবস্থা অনুকূল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকব। কিন্তু যখন এদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলাম, তখন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে গেলাম। সেখানে ১ মাস অতিবাহিত করার পর কয়েকজন সঙ্গীসহ নেপালের বর্ডার অতিক্রম করলাম। ৬ মাস কাঠমুণ্ডুতে থাকলাম। ওখান থেকে পুনরায় ভারতের পথে পাকিস্তানে প্রবেশ করলাম।

যখন খরপারকার এলাকা দিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলাম, তখন এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও মনে হল নিজের ধাত্রীর কোলে এসে গেছি।'

মুহাম্মদ মনসুর ছিলেন চট্টগ্রামের [মহেশখালির] কুখ্যাত আলবদর। পাকিস্তানীরা যখন অস্ত্র সমর্পণ করছে তখন তাদের কাছে তিনি এর ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন কিন্তু তারা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। তখন মনসুর তার সাথীদের [ঈদগাহ ইউনিট] একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন তারা কী করতে চান। তারা বললেন, সেখানে থাকবেন। মনসুর বললেন, 'তা হলেতো শহীদ হয়ে যাবেন।' তারা জানালেন, 'শহীদ হওয়া উত্তম'।

মনসুর তো শহীদ হতে চান না। তার আরো কিছু সাথী নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে এলেন। সাথীদের পরিচিত একটি মেসে রেখে তিনি একা পালানোর মতলব করলেন। পতেঙ্গায় এসে তার পরিচিত মহেশখালির এক সাম্পানওয়ালা পেলেন। তাকে অনুরোধ করলেন মহেশখালি পৌঁছে দিতে। সাম্পানওয়ালা বললেন, 'দাড়ি কেটে ফেলেন। দাড়িঅলা নিয়ে আমি যেতে পারব না।' একথা শুনে মনসুরের খুব খারাপ লাগল। অন্য সময় হলে হয়ত সাম্পানওয়ালাকে গুলি করে ফেলা যেত। চুপ করে মেসে চলে এলেন। তারপর তার ভাষায়–

'১৭ ডিসেম্বর সকালে এয়ারপোর্ট গেলাম। সেখানে কেউ ছিল না। পুরো চট্টগ্রাম ঘুরলাম। কিন্তু কোনো সিপাহী বা আলবদরের ক্যাডেটের সাক্ষাত মিলল না। শেষ পর্যন্ত একটি নারিকেলগাছের নিচে আমার অস্ত্র ফেলে দিলাম। তারপর বোর্ডিংয়ে এসে আমার বন্ধু কর্মীদের জানালাম। নামাজ পড়লাম, নাস্তা করলাম। এফতেখারের কাছ থেকে একটি লুঙ্গি ও কোর্তা নিলাম। উর্দি খুলে ফেলে দিলাম। আনিসুল ইসলাম বললেন : 'আপনাকে লোকেরা চিনে। কাজেই আপনি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যান।' তার সঙ্গে একমত হয়ে আমি চট্টগ্রাম থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সঙ্গীদের বললাম, 'আমি থাকলে তোমরাও বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। আমাকে তো এই লোকেরা হয়ত আজকেই শহীদ করে দিবে। তোমরা বেঁচে থাক যাতে আরো কিছুদিন আল্লাহর ইবাদত করতে পার।'

আমার কাছে ১২০ টাকা ছিল। তাদেরকে ৪০ টাকা করে দিলাম, চল্লিশ টাকা নিজে রাখলাম। আমরা অশ্রুসজল নয়নে ধরাধরি গলায় পরস্পর থেকে বিদায় নিলাম। আমার নিশ্চিত ধারনা ছিল যে, আজকেই আমি শহীদ হয়ে যাব।

সকাল ৯টার সময় আমি পুনরায় ঘাটে গেলাম। ঘটনাক্রমে ঐ নৌকাওয়ালাকেই পাওয়া গেল। আমি বললাম যে, 'দাড়ি তো কাটব না।'

সে বলল যে, 'যদি কেউ ধরে তাহলে আমি কিছু বলব না।' এ কথা বলে আমাকে নৌকায় বসার অনুমতি দিল। দিনের ১টার সময় নৌকা ঘাট থেকে আলাদা হয়ে গেল। একজন আওয়ামী লীগারও সাথে ছিল।

মহেশখালির দিকে আমাদের নৌকা হয়ত এক মাইল এগিয়েছে, এ সময় মুক্তিবাহিনী দুটি ফায়ার করল এবং আওয়াজ দিল যে, এদিকে এসো। মাঝি কোনো উচ্চবাচ্য না করে নৌকার দিক সেদিকে এগিয়ে দিল। আমরা তীরে গেলাম। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো আলবদর বা মুজাহিদ আছে?' নৌকাওয়ালা বর্ণনা করল 'না

কেউ নাই।' তারপর তারা জয় বাংলা শ্লোগান দিল, সবাই দিল, কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত বলতে হবে যে, তারা আমার দিকে লক্ষ করেনি। ওখান থেকে তিন মাইল এগিয়ে গেলে মাজেল ঘাট এর নিকটে আরেকটি গ্রুপ পাওয়া গেল। তারাও একই প্রশ্ন করল, 'কোনো আলবদর রাজাকার আছে?'

মাঝি তো চুপ রইলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগারটি বলল, 'এ হচ্ছে আল বদর।' এ কথা শুনতেই তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমার হাত ধরে নৌকা থেকে বাইরে টানতে লাগল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললাম, 'জবরদস্তি করার প্রয়োজন নাই, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি আছি।' তারা আমাকে নৌকা থেকে নামিয়ে ফেলল। দেখলাম যে, নদীর কূলে বহু মুজাহিদকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছে আর তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে। তারা আমাকেও ওদিকে নিয়ে গেল। আমি আমার শেষ পরিণতি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে আমাদের গ্রামের একজন মুক্তিবাহিনী ছিল। সে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এদিকে কোথায়?' আমি বললাম, 'আমি বাড়িতে যাচ্ছিলাম, এরা আমাকে আলবদর নাম দিয়ে নৌকা থেকে নামিয়ে এনেছে।' এ ঘটনার পর আমার এলাকার লোকটি অন্যদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। বলল, 'আমি এক বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। তোমরা যদি তাকে মারতে চাও তাহলে প্রথমে আমাকে মার।' বেশ ঝগড়া করে তিনি আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন। আর রাত ২টার দিকে আমি বাড়িতে পৌঁছলাম। আব্বা বললেন যে, 'মুক্তিবাহিনী তোমার খোঁজে কয়েক দফা এখানে চক্কর দিয়ে গেছে। তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। তুমি ডাক্তার নজরুলের কাছে চলে যাও।' এই ডাক্তার ছিলেন দ্বীপের আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। আব্বা তাকে আর্মি এ্যাকশনের সময় ১ সপ্তাহ আমাদের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আব্বার নির্দেশ মোতাবেক আমি তার বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। এটা ছিল ভোর ৪টার ঘটনা। তিনি হাতে পিস্তল নিয়ে বের হলেন। আমি নিজের পরিচয় দিলাম এবং আশ্রয় চাইলাম। সেই অকৃতজ্ঞ জবাব দিল যে, 'এক্ষুনি আমার সামনে থেকে চলে যাও। আরেকবার যদি দেখি, তবে মেরে ফেলব।' এটাই তো এহসানের বদলা। তারপর পাহাড়ি এলাকার দিকে চলে গেলাম। এক সপ্তাহ গাছের পাতা খেয়ে কাটিয়েছি। আল্লাহ জানেন এভাবে কতদিন গাছের পাতা খেয়ে কাটাতে হত। সৌভাগ্যবশত আমার এক বৌদ্ধ কর্মচারীর সাথে দেখা হল। সে কিছু খানা, কোর্তা ও সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে গেল। আমরা কিছু সাথী পাক আর্মির কাছ থেকে সিগারেট পানের অভ্যাস শিখেছিলাম। ২১ দিন পুনরায় পাতা পত্র খেয়ে কাটালাম। ২১ দিন পর সেই কর্মচারী ও আমার ছোট ভাই সঙ্গে খানা, কম্বল ও লুঙ্গি নিয়ে এল। কম্বলটা ছিল খুব সস্তা ধরনের। আমার মনে খটকা লাগল যে, নাজানি আমাদের বাড়িতে লুটপাট হয়েছে। তাই হয়ত এত সস্তা ধরনের মামুলি কম্বল পাঠানো হয়েছে। ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো জবাব দিল না। তার চুপ করে থাকা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আসল ঘটনা এড়াবার জন্য চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য যে, আমার আব্বা কক্সবাজার

ও মহেশখালির মধ্যে নৌকা চালানোর কাজ কারবার করতেন। তাতে ভালো আয় রোজগার হত। ভাই একশত টাকা দিল এবং বলল যে, 'আগামী রাতে একটি লঞ্চ [নৌকা] লামার বটতলী ঘাটে ভিড়বে। ওখানে আপনি উঠবেন।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' যদিও লঞ্চ কোথায় নিয়ে যাবে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু আব্বাজানের আদেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না। এই লঞ্চ ছিল অপছন্দীয় লোকদের। আব্বা এটি ভাড়ায় নিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ে সেটি এল। মহেশখালির দুজন 'দেশপ্রেমিক' আগের থেকে যাত্রী হয়েছিলেন। আমিও তাদের সঙ্গে বসে গেলাম এবং অজ্ঞাত স্থানের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

মাঝি নিজের মন যেভাবে চায় সেভাবে নৌকা বেয়ে নিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, শুকনো পাতার মতো পানির উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল। এভাবে ভাসতে ভাসতে আমরা জিঞ্জিরা [সেন্টমার্টিন] নামক দ্বীপে পৌঁছে গেলাম। সেখানকার নারিকেল খুব প্রসিদ্ধ। এই দ্বীপের বাসিন্দারা ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা বদলে গেছে বলে মনে হল। আমরা কিছুক্ষণ থেমে রওনা হয়ে গেলাম। এটি ছিল জানুয়ারির ৮ তারিখ। ঐ এলাকায় পরিস্থিতি কার্যত শান্ত ছিল। এ কারণে, আমরা ধারণা করেছিলাম যে, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু দ্বীপের তীরের কিছুদূর যেতে না যেতেই মুক্তিবাহিনীর একটি নৌকা আমাদেরকে ধাওয়া শুরু করল। সূর্য ডোবা পর্যন্ত বরাবর আমাদের পেছনে লেগে রইল। আমাদের মাঝি রাতের আধারের সুযোগ নিয়ে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে তো প্রাণ বাঁচাল কিন্তু ভুলে গভীর সমুদ্রের দিকে এসে গেল। কেউ দিক ঠিক করতে পারছিল না। অনুমানের উপর নৌকা উত্তরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ১০/১২ ঘণ্টা কোনো কিছু চিন্তা ছাড়াই সফর করতে থাকল। যখন সূর্যের আলো ভালো করে ছড়াল তখন বোঝা গেল যে বার্মার মাঝিদের এক পল্লীর কাছাকাছি চলে এসেছি। ওখান থেকে রওনা হয়ে রাতে একটি গ্রামে নামলাম। সেখানকার সকল বাসিন্দা ছিল মুসলমান। সৌভাগ্যজনকভাবে দু একটি পড়ালেখা জানা লোকও পাওয়া গেল।

তারা খোশ আমদেদ জানালেন। খানা খাওয়ালেন। থাকার জায়গা করে দিলেন। আমরা খুশি ছিলাম যে, আল্লাহতায়ালার গায়েবী সাহায্য করছেন। কিন্তু এই খুশি সাময়িক বলে মনে হল। সকাল বেলা বোঝা গেল যে, বার্মায় দুটি সমান্তরাল সরকার আছে। একটি বার্মার আরেকটি কম্যুনিস্টদের। এখন যেই আমাদের দেখবে সেই এরেস্ট করবে। যাই হোক দিনের বেলাটা সেখানেই কাটালাম। পাহাড়ের কাছে একটি মসজিদের ইমাম সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, 'আপনাদের দূতাবাসকে পত্র লিখুন।' কাজেই আমি আল বদর কমান্ডার হিসেবে পত্র লিখলাম। উত্তরে দূতাবাস জানাল যে, 'শিগগির অফিসে চলে আসেন। নতুবা এরেস্ট হয়ে যাবেন।' পরের দিন আমরা নৌকা থেকে আকিয়াব চলে গেলাম। দিনের বেলা ২টার সময় সেখানে পৌছলাম। কোনো মাধ্যমে আকিয়াব শহরের জামে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের আগমনের কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনিও তশরিফ আনলেন। তিনি আমাদেরকে পাকিস্তানী

অফিসে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ১০ মিনিট যেতে না যেতেই বার্মার ইমিগ্রেশন ঢুকে আমাদেরকে গ্রেফতার করল এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

দূতাবাস ক্যাম্প থেকে গ্রেফতার করাতে পাকিস্তানী কাউন্সিলের পক্ষ হতে এর প্রতিবাদ জানাল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মাধ্যমে মুক্ত হলাম। মুক্তির পর আমাদেরকে পাকিস্তানী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানে এ সময় ১০৪ জন সিপাহী অবস্থান করতেন। সবাই মনের অজান্তে গলায় জড়িয়ে ধরলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। তিনদিন পর ঢাকা থেকে একজন কর্ণেল পালিয়ে ওখানে পৌঁছলেন। তিনি আমাদের তিনজনকে ডেকে শান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন যদি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এক কোটি মুসলমানও এসে যায় আমারা তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

কর্ণেল সাহেবের এ কথা শুনে আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাথীদের এখানে আসতে পত্র লিখলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরই ফৌজিরা এই ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল এবং আমাদেরকে বার্মা গভর্ণমেন্টের হাতে তুলে দিল। সবাইকে তখন জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হল।

বার্মার অফিসাররা বললেন যে, 'তোমরা নিশ্চয়ই বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে এখানে এসেছ। কিন্তু আমরা কী করব! পাকিস্তানী দূতাবাস তোমাদেরকে গ্রহণ করছে না। এ কারণে দেশের আইন অনুযায়ী তোমাদেরকে গ্রেফতার করছি।' এটি ছিল ১৭ জানুয়ারির কথা। পরের দিন আমরা পানাহার বন্ধ করে দিলাম। আমরা বললাম যে, 'আমরা কী চোর যে, আমাদেরকে জেলে এভাবে রাখা হয়েছে?' এ পরিস্থিতিটা উদ্ভব হলে দুতিন জন বর্মী অফিসার আসলেন, তারা খানা খাওয়ানোর জন্য জোরাজুরি করলেন। ইমিগ্রেশন বিভাগের চীফ অফিসারও এলেন। তিনি বহু বোঝালেন। কিন্তু আমরা খানা খেতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত জেলার সবচে বড় অফিসার (আমাদের ডেপুটি কমিশনার এর মত) এলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারি ছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে মেট্রিক পাশ করেছিলেন। আমাদের অবস্থাদি শোনার পর বলতে লাগলেন, 'আমি রেঙ্গুনে পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলব। আপনারা খানা খেয়ে নেন।' তিনি ওয়াদা অনুযায়ী পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে বহু তর্ক বিতর্ক করলেন। ফলে দূতাবাস আমাদের দায়িত্ব নিয়ে নিল। ১৮ জানুয়ারি জেলে পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষ থেকে খাবার পাঠানো হলো। এরপর আমরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য দুতাবাসের কাছে লিখলাম। সে অনুযায়ী, আমরা সব পেয়ে গেলাম। কিন্তু বিভিন্ন নিয়ম পালন করতে গিয়ে আমরা পুরো এক সপ্তাহ জেলে কাটালাম। আমরা কয়েদী থাকা অবস্থায় এলাকার মুসলমানরা আমাদের মুক্তির জন্য একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করলেন। তারা বলতে লাগলেন যে, যদি এক লাখ টাকার জামানতও দিতে হয় আমরা দেব। এই সহানুভূতি সত্যিকার অর্থেই একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত ছিল।

মুক্তির পর দূতাবাস আমাদেরকে একটি হোটেলে রাখল। এই এক মাসে বর্মী মুসলমানরা আমাদের অনেক সেবাযত্ন করেছে। আমার জুতা ছিল না। এখানে আই

ডি কার্ড দিয়েই জুতা নিতে হয়। এক বর্মী ভাই তার কার্ড দিয়ে আমার জন্য জুতা খরিদ করেন। যতদিন ছিলাম, প্রতিদিন অসংখ্য লোক দেখা করতে আসত। এক মাস পর আমাদের পুনরায় ক্যাম্পে নিয়ে আসা হল, লোকেরা অন্তর খুলে আমাদের স্বাগত জানালেন। ক্যাম্পে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য কয়েকটি মুসলিম বালক আসত। দেখা সাক্ষাতের চেষ্টার পর একদিন মেট্রিকের ২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। যাদেরকে ২৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়েছিল। ১ এপ্রিল আমাদেরকে আকিয়াব থেকে রেঙ্গুনে পাঠানো হলো। আমাদের যাত্রার ব্যাপারটি যদিও গোপন ছিল তবুও বিদায়ী সালাম জানানোর জন্য হাজার হাজার আকিয়াবী মুসলমান এসে গেলেন। ক্লাশ নাইনের একজন ছাত্র যার নাম ছিল রশীদ, কেঁদে কেঁদে আমাদের অবস্থাটা করুণ করে তুলল। এসব ভালবাসা দেখে আমরা সকল দুঃখ ভুলে গেলাম। রেঙ্গুন পৌছলে মুসলমানরা আমাদেরকে সমগ্র শহর ঘুরে দেখালেন। আমরা সেখান থেকে ব্যাংকক এবং ব্যাংকক থেকে করাচী পৌছলাম।'

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আকিয়াব বা আরাকানের যে সব মুসলমানের কথা বলা হচ্ছে এরা রোহিঙ্গা। চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে মিল আছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির। এরা পাকিস্তানীদের ভক্ত যে কারণে তারা আলবদরদের সাদরে গ্রহণ করেছিল। এর এক দশক পর রোহিঙ্গাদের মধ্যে উগ্র জঙ্গীবাদ ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভব আলবদরদের গ্রুপগুলো তাদেরকে উগ্র মৌলবাদে ও জঙ্গীবাদে প্রভাবিত করেছিল। বিএনপি-জামায়াত আমলে তাদের প্রশ্রয়ে এই রোহিঙ্গা বা আরকানী মৌলবাদীরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি বানিয়ে উগ্র মৌলবাদী বা জামায়াতীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। শাহরিয়ার কবিরের বিভিন্ন লেখায় ও তাঁর নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। আরো লক্ষ্যণীয় যে, মনসুরের মতো আলবদরকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা।

ফিদাউল ইসলাম ছিলেন ঢাকার আলবদর। যেদিন আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তান বাহিনী সেদিন এক মেজর তাদের এই খবরটা দিলেন। এ খবর শুনে তো সবাই মহা উত্তেজিত। তারা শহীদ হবেন তবুও আত্মসমর্পণ করবেন না। মেজর তখন বললেন, তাদের ওপর হুকুম এসেছে সারেন্ডার করার। 'আমরা সারেন্ডার করব। তবে আপনাদের এ দেশে থেকেই কাজ করতে হবে। সুতরাং সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখবেন।'

এরপরতো কথা চলে না। বিখ্যাত আলবদর মোস্তফা শওকত ইমরানের সঙ্গে ফিদাউল পালালেন। তার ভাষায়–'এ কথা শোনার পর আমরা সবাই ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস ১৫ পুরানা পল্টন যাবার জন্য তৈরি হলাম। এরই মধ্যে একটি খোলা জিপ ড্রাইভ করে মোস্তাফা শওকত ইমরান এখানে এসে পৌছলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন যে, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে চলুন। আমি তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। তৎক্ষণাৎ জিপে উঠে গেলাম। ইমরান ভাই নিজেই জিপ ড্রাইভ করছিলেন। তার এক হাতে নিরাপত্তার জন্য গুলি ভর্তি রিভলবার আরেক হাতে

স্টিয়ারিং ছিল। আমরা সামান্য দূরে যেতেই জিপ দুর্ঘটনায় পতিত হল। তাতে মোস্তাফা শওকত ইমরান ভাইয়ের মাথায় চোট লেগে রক্ত পড়তে লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খুব সতর্কতার সাথে জিপ চালাতে লাগলেন। তার রক্তের ছিটা রাস্তার ওপর পড়ছিল। আর তিনি আমাদেরকে হেফাযতের সঙ্গে মোহাম্মদপুর আল বদর ক্যাম্পে পৌছে দিলেন। কিছুক্ষণ ক্যাম্পে অপেক্ষা করার পর আমি ধানমণ্ডিতে আমার ভাইয়ের বাসায় [আপন ভাই নয়] চলে এলাম। তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। আমার পকেটে কানাকড়িও ছিল না। এর কারণ হল, আল বদর বেতন দিত না। [এ বক্তব্য ঠিক নয়]

আমি আমার অবস্থা রহমান ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। অবস্থা অনুমান করে, তিনি সাথে যাবার জন্য বললেন। আর আমরা উভয়ে রওনা হয়ে গেলাম। রাস্তায় মুক্তিবাহিনীর একটি গাড়ি নজরে এল। আমি জড়তা কাটিয়ে হাতের ইশারায় গাড়িটা থামিয়ে দেখলাম এবং তাতে উঠে নারায়ণগঞ্জ পৌছলাম। অনুরূপভাবে মুক্তিবাহিনীর নৌকায় চড়ে চাঁদপুর গেলাম। আমাদের ধারণা ছিল, আমরা ওখানে নিরাপদে থাকব। কিন্তু কিছু পরেই ভারতীয় ফৌজ আমাদের গ্রেফতার করল। আমরা বললাম যে, আমরা ছাত্র। নিজেদের গ্রামে যাচ্ছি। কিছুদূর অতিক্রম করে আমি যখন বাজারে পৌছলাম, তখন সেখানে দেখলাম যে, একজন আল বদর মুজাহিদকে বাঁশের সাথে বেঁধে শহীদ করা হয়েছে। এই সাথীর শরীরে ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে লবণ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর তার ঝুলে পড়া মাথার কাছে মার্কার দিয়ে লেখা ছিল 'গাদ্দারের পরিণতি'। আফসোস যে গাদ্দাররা একজন দেশপ্রেমিক বীরকে শহীদ করার পর দেশপ্রেমিকের আসল রূপটি নিজেদের করে নিয়েছে।

আমি দুই দিনে পাঁচ মাইল পায়ে হাঁটার পর আমার দুধ ভাইয়ের গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। তিনি বললেন যে, 'আমাদের আত্মীয় এক ভাই মুক্তিবাহিনী। সে তোমাকে খোঁজ করছিল।' এদিকে আব্বাজানের বার্তা পৌছেছিল যে, 'তোমাকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেছে।' এ খবর শুনে, আমি দিনাজপুর গেলাম। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডু চলে গেলাম। এই সফর আমি একজন মজুর হিসেবে রাস্তায় পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে গৃহ নির্মাণে সিমেন্ট বহন করে করে সম্পন্ন করেছি। অথচ আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিলাম। ওখানে পৌছেও একই অবস্থা ছিল। নেপালে ৬ মাস থাকার পর ভারতের বর্ডার অতিক্রম করে লাহোরে চলে গেলাম। সৈয়দ আবুল আলা মওদুদীর সঙ্গে সাক্ষাত সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিল।'

এখানেও লক্ষ্যণীয় যে, মুক্তিবাহিনীর শৈথিল্যের কারণে, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে থেকেই ফেদাউল পালাতে পেরেছিলেন।

আবু নসর ফারুকিও ঢাকার প্রখ্যাত আলবদর। অস্ত্র সমর্পণের কথা শোনার পর ছাত্র সংঘের নেতারা আলবদরদের নির্দেশ দিলেন পালাতে। ফারুকি একথা শুনে দ্বিরুক্তি না করে শহরের ভেতরে চলে গেলেন। এক রাজাকার তাকে বাধা দিলে তিনি

বললেন, 'আপনারা কী করছেন। পাক বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেছে, পালান।' রাজাকার কয়জন বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকেতো মুক্তিবাহিনীর লোক মনে হচ্ছে। তুমি গুজব রটাচ্ছো। তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।' এ কথা বলে এক রাজাকার তার বুকে রাইফেলের নল ঠেকালো। এমন সময় সৈন্য নিয়ে এক পাকিস্তানী জিপ ঐ পথে যাচ্ছিল। তাদের দেখে সিপাহীদের একজন বলল, 'আমাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তোমরা পালাও।'

এ কথা শুনে রাজাকাররা ফারুকিকে ছেড়ে পালালো। ফারুকি বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। তিনি ঠিক করলেন কোতোয়ালি থানায় যাবেন। তার ভাষায়–'মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র পুলিশে ভর্তি হয়ে ডিউটিরত ছিল। ওখানে পৌছার পর বুঝতে পারলাম যে, তারা গাট্টি বোচকা বাঁধার অপেক্ষায় আছে। জিজ্ঞাসা করলে একজন বললেন, 'ভাইয়া আমরা ডিউটি পাল্টাচ্ছি। যদি পারেন কোনো অফিসারকে বলে আমাদের ট্রান্সফার ঠেকিয়ে দেন। আমরা ঢাকার বাইরে যেতে চাই না।' এ কথা শুনে আমার হাসি পেল। ভয়াবহ একটি বিপ্লবকে কিভাবে আলাভোলারা এখনো শুধু এই ট্রান্সফার বলে ভাবছে। সারেন্ডারের যিনি দায়িত্বশীল তিনি নিজের পুলিশ বাহিনীকেও সঠিক পরিস্থিতি অবগত করাতে পারেননি।

এখান থেকে নিরাশ হয়ে টিকাটুলি জামে মসজিদে পৌছে গেলাম। সে মসজিদের ইমাম সাহেব তো আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এটি তাবলীগ জামায়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সে সময় আমি ভেতরে প্রবেশ করছিলাম। তখন তাবলীগ জামাতের এক নেতা বলছিলেন, 'ভাইয়েরা, দোস্তরা জিহাদের সময় এসে গেছে। এখন জিহাদের জন্য আমাদের তৈয়ার হতে হবে। বহুত ফায়দা হবে।' অনুমান করা গেল, এই লোকেরাও এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর। মাগরিবের সময় হয়েছিল। নামাজ এ মসজিদেই পড়লাম এবং মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট মনের দুঃখ ব্যথা প্রকাশ করলাম। রাতটা তার কাছেই কাটালাম। ধারনা ছিল, নিশ্চিন্তে কয়েকটা দিন এখানেই থাকতে পারব। কিন্তু ফজরের নামাজ শেষ করেছি এমন সময় একটি ছেলে আমার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ করে বলল, 'ভাই আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। সকল সাথী বায়তুল [মোকাররম] মসজিদে আছে।' আমি ওদিকে রওনা হলাম।

এটা ছিল ১৭ ডিসেম্বরের ঘটনা। সমগ্র ঢাকা ফায়ারিং এর আওয়াজে কাঁপছিল। চারদিকে রক্তের বৃষ্টি আর গুলির আগুন ঝরছিল। মনে হচ্ছিল বারুদের গুদামে আগুন ধরেছে।

রাস্তায় উর্দুভাষী লোকদের লাশের পর লাশ দেখে কলিজাটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। হত্যা ও লুটপাটে হিন্দুরা এগিয়ে ছিল। [দেশ তখন প্রায় হিন্দুশূন্য]

ভারতীয় ফৌজের সারি সারি গাড়ি ঢাকা ছাউনির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। রক্তের বন্যায় ঢাকা এই দৃশ্য দেখতে দেখতে যখন বায়তুল মোকাররম পৌছলাম তখন সকল সাথী সেখান থেকে চলে গেছে। বাধ্য হয়ে ওখান থেকে আমার ভাইয়ের কাছে গেলাম। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপন করে রইলাম। ২৫ ডিসেম্বর

পত্রিকায় আমার নাম ছাপানো হয়েছে দেখলাম। *দৈনিক বাংলায়* বিজ্ঞপ্তি ছিল যে, এই নামের ছাত্রটিকে ধরিয়ে দিন। এই বিজ্ঞপ্তি দেখার পর আখাউড়া জংশনের দিকে চলে গেলাম। এখান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তারপর সিলেট শায়েস্তাগঞ্জ হয়ে মুকুন্দপুর পৌছলাম এবং সেখানে বাস করা শুরু করলাম।

আমার পরিকল্পনা ছিল কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশে থেকে যাব। এরই মধ্যে ঈদুল আযহা এসে গেল। বাড়িতে যাওয়ার জন্য মন তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু অবস্থার দাবি ছিল এই চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলি। আমি সেটাই করলাম। আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে গেলাম। ১৯৭২ এর এপ্রিলে যখন চট্টগ্রাম আখাউড়া রেল লাইন পুণস্থাপিত হল তখন চট্টগ্রাম চলে এলাম। এসময় কর্ণফুলি পেপার মিলে স্থানীয় অস্থানীয় প্রশ্নে বাংলাদেশ বড় ধরনের ঝগড়া হল। শ্রমিকরা নিষ্ঠুরভাবে একে অপরের কল্লা কাটল, এটি ছিল বাস্তুবাদী শ্রেণী বৈষম্যের স্বাভাবিক পরিণতি। ঐ মাসে আমি ওখানেই থাকলাম।

আমি ঠিক করলাম যে, হিন্দুস্তান যাবার পরিবর্তে বার্মায় যাওয়া উচিত। কিন্তু ভাষা না জানা একটি বড় বাধা ছিল। এছাড়া এখানে কারো সাথে পরিচয়ও ছিল না। তা সত্ত্বেও আমি সফরের প্রস্তুতি শুরু করলাম। গায়েব থেকে সামান্য আশার আলোও দেখা দিল। আমার এক বন্ধুর মা ছিলেন বার্মিজ। তিনি আমার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে খুব দরদের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। একজন স্মাগিলারের মাধ্যমে বার্মায় পাঠানোর কথা বললেন। তিনি আমাকে বার্মায় পৌছিয়ে দিলেন। এই সফরের ঘটনাবলীও ভীষণ হৃদয় বিদারক। বরং বার্মায় পৌছার পরও পেরেশানী শেষ হয়নি। কারেন্সী বদলানোতে বড় ধরনের সমস্যা ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতে থাকলাম, কেউ সাহায্য করেনি। পাকিস্তান ও বার্মার চৌকি টেকনাফে পৌছলাম। তো সেখানে তখনো পাকিস্তানের চাঁদ তারা পতাকা উড়ছিল। এটি দেখে মনে হয়েছিল সমগ্র জগৎ যেন কাপড়ের সেই টুকরার মধ্যে গুটিয়ে এসেছে। এখানে আসরের নামাজ পড়ার জন্য পানি মুখে নেয়ার সাথে সাথে ঠোঁট ফেটে গেল। মাগরিবের পর এক জেলের সঙ্গে দেখা হল। যিনি বাংলা ভাষা জানতেন। তিনি রাতে খাবারের দাওয়াত দিলেন। রাতে তার ঘরেই আরাম করলাম।

বার্মায় তখনকার দিনে তিনটা গ্রুপ তৎপর ছিল। একটি স্বাধীনতার জন্য মুসলিম আন্দোলন, দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার জন্য গণআন্দোলন আর তৃতীয়টি ছিল ঐ এলাকায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েক করার দাবিদাররা। আমার মংডুজেলায় পৌছার কথা ছিল। গাইডের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল যে, সেখানেই পৌছিয়ে দেবেন। কিন্তু সে আর সামনে যেতে অস্বীকার করল। রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে সে কেটে পড়ল।

রাস্তায় প্রচণ্ড পিপাসা লাগলে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পানি চাইলাম। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন পার্টির?' আমি চিন্তা করলাম কী বলে হয়ত নতুন কোন বিপদে ফেঁসে যেতে পারি। বললাম, 'এখন তো সবাই আওয়ামী লীগ।' তখন তিনি পানি দিতে অস্বীকার করেন। সামনে গিয়ে আরো কিছু লোক পাওয়া গেল। তারাও পানি দেয়ার

বেলায় প্রথমে পার্টির নাম জিজ্ঞাসা করল। আমি জবাব দিলাম মুসলিম পার্টির। এটা শুনে তারা খুব আদর যত্ন করল। পরে জানা গেল যে, ঐ এলাকার লোকরো বহুদিন ধরে কায়েদে আজম ও মুসলিম লীগের পূজারি।

আমি মাগরিব পর্যন্ত মংডু যাবার জন্য জাহাজের অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তা আসেনি। বসতি অনেক দূরে ছিল। ঘুটঘুট অন্ধকার আর পানির রহস্যজনক চমকানো মনে হচ্ছিল। চারদিকে আলিফ লায়লা পাহাড়গুলো দেখতে আজব ধরনের আকার আকৃতির। একবার বাঘের গর্জনের আওয়াজ কানে এল। বড় বড় পাখি আজব ধরনের আওয়াজ করতে করতে আমার মাথার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করছিল। সাপের নড়াচড়া পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। তখন একটি লঞ্চ এল। আমি আওয়াজ দিলাম। লঞ্চ ওয়ালারা জিজ্ঞাসা করল : 'কোথায় যাবে?' উর্দুতে জবাব দিলাম মংডু যাব। তখন আমার কাপড় চোপড় খুব ফকির মার্কা ছিল। লুঙ্গি আর গেঞ্জি ছিল পরা। ভয় ছিল যদি নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। কিন্তু তারা লঞ্চে ওঠালেন।

এখনো পর্যন্ত ভয়ভীতি রহস্যঘেরা। তিতিক্ষার ভয়ঙ্কর পরিবেশ। চমকানো পানি, ভয়ানক সব আওয়াজ। রাত প্রায় ২টার দিকে চোখে তন্দ্রার মত আসতেই কে একজন টোকা দিয়ে জাগিয়ে দিল। উর্দু ও বর্মী ভাষায় কিছু একটা বলল। আমি বুঝতে পারলাম না। অবশ্য তার ইশারা ইঙ্গিতে এটুকু বুঝলাম যে, সে পয়সা চাচ্ছে। আমি বললাম কিছুই নেই। সে আমার ব্যাগ তল্লাশী করল। তাতে কিছুই পাওয়া গেল না। আমি আমার টাকা কড়ি আমার জাইঙ্গার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সে নিরাশ হয়ে আমাকে লঞ্চের কিনারায় নিয়ে গেল। তাদের কথাবার্তায় আমার আন্দাজ হল যে, তারা বলাবলি করছে যে, কি একটা মুছিবত তুলে বসিয়েছে। অপরজন বলল, একে এখানে নামিয়ে দিচ্ছি। প্রথমজন বলল, মরে যাবে। আরেকজন বলল, অন্তত আমাদের প্রাণটা তো এই মুছিবত থেকে রেহাই পাবে। এ কথা বলে সে ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, আমাকে সাগরে ফেলে দিবে। কিন্তু যেই না সে একটু আগে বাড়ল, অপরজন বলল, খামখা একটা প্রাণ নষ্ট করছ।

একথা শুনে সে থেমে গেল। একটু পরেই সেহরী (শেষরাত) হয়ে গেল। এখান থেকে শহরটা জোনাকির মত দেখা যাচ্ছিল। আমি খুশি হলাম যে, শহরে পৌঁছে গেছি। কিন্তু লঞ্চ যেই না তীরের দিকে এগিয়ে গেল কেউ টর্চের আলো তাক করল এবং তা সোজা আমার মুখের উপর পড়ল। মাল্লারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাহাজের নিচের অংশে ঢুকিয়ে দিল। বিপদ কেটে গেল। পরে জানা গেল যে, তারা ছিল ইমিগ্রেশনের লোক।

ফজরের আজানের পরই আমি শহরে পা রাখলাম। নদীর তীরে ছিল কাদা আর কাদা। কাপড় টুটাফাটা হয়ে গিয়েছিল। মসজিদের দিকে চললাম। এ দুই জনের মধ্যে একজনও আমার সঙ্গে ছিলেন। মসজিদে যাওয়ার পর আমি লোকটিকে ২০টি বার্মিজ টাকা দিলাম। সে তখন চলে গেল। এখন নিশ্চিন্তে কাপড়ের কাদা ছাড়িয়ে ফজরের নামাজ পড়লাম। তারপর মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। তার

নাম ছিল মাওলানা মর্তুজা আহমদ। তিনি কিছু উর্দু বুঝতেন। তিনি আমার করুণ কাহিনী শোনার পর ব্যথিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে তার বাড়িতে লুকিয়ে ফেললেন। আমা কাছ থেকে টাকা নিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। মংডুর ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান ছিলেন মুসলমান। আমরা উপযুক্ত সময়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে খানা খাওয়ালেন। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কাহিনী শুনলেন। তিনি বললেন, খুব শীঘ্র যেন ইমিগ্রেশনওয়ালাদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করি। আর যেন বলি যে আমি এখন টুটাফাটা অবস্থায় দেশ ত্যাগ করে এখানে পৌঁছেছি। তার পরামর্শ মোতাবেক ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছলাম। রিপোর্ট লেখালাম। অফিসার নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে পুনরায় আসার জন্য বললেন।

তিন টাকা সাথে ছিল। ঐ টাকা নিয়ে করাচীর জমিয়ত দপ্তরে মরহুম তাসনীম আলম ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করলাম। লোকেরা বললেন যে, এরা তোমাকে গ্রেফতার করবে। পরশুদিন ঐ দপ্তরে যাবে না। আমরা স্থানীয় মুসলমানরা তোমার জামিনের ব্যবস্থা করছি। এ সবই গায়েবী সাহায্য ছিল যে, ইমিগ্রেশন অফিসার আমার জামানতের ব্যবস্থা করে দিলেন। আর জামানতনামায় বর্মী ভাষায় কিছু একটা লিখলেন। আমার দ্বারাও দস্তখত করালেন। তারপর বললেন, 'বেটা! তোমার জামিনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।' প্রতিদিন এখানে এসে এই অফিসে হাজিরা দিবে। আমি একমাত্র ব্যক্তি যাকে গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যথায় ওদিক আগত সব লোককে বন্দি করে জেলে পোরা হয়। যেভাবে বলা হলো এখানে যে তিনটি শ্রেণী স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তন্মধ্যে সবচে সক্রিয় হচ্ছে মুসলমানরা। তারা মুসলিম মুক্তি ফৌজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে রাতে কমান্ডার বললেন যে, 'তুমি আমাদের মুক্তি ফৌজের সঙ্গে শামিল হয়ে যাও। আমরা ভরণ পোষণের জন্য আমরা আমাদের পক্ষ হতে তোমাকে জমি দেব।'

এখানকার মুসলমানরা জুডো কারাতে খেলায় বেশ অভিজ্ঞ। মেয়েদেরকেও সেই ট্রেনিং দেয়া হয়। একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এখানে ছেলে কম এবং মেয়ে বেশি জন্মায়।

জুলাইয়ের শেষে আমি আকিয়াব চলে গেলাম। পৌঁছেই পাকিস্তানের কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করলাম। তারা সহযোগিতা করলেন। তার কিছুদিন পর আমি পাকিস্তান পৌঁছে গেলাম।

এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, মসজিদের ইমাম বাঙালিদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ফারুকির মতো আলবদরকে সাহায্য করেন। তবলিগকে আমরা জামায়াত বিরোধী মনে করলেও দেখা যায়, অন্তিমে যখন যে কোনো এক পক্ষ সমর্থনের কথা বলা হয় তখন তারা আলবদরদেরই সমর্থন করে। আলবদররা পালাবার সময় মসজিদে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে।

আরাকানের রোহিঙ্গারা অধিকাংশ দেখা যাচ্ছে, শুরু থেকেই আলবদরদের সমর্থক। বার্মা হয়ে যেসব আলবদর পাকিস্তান গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে সমর্থন

করেছে রোহিঙ্গারা। সেই ধারা এখনও অব্যাহত। এ কারণে দেখা যায়, এখন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমর্থন দিচ্ছে বিএনপি। কারণ, কালক্রমে তারা ভোটার হলে বিএনপির ভোটার হবে।

ময়মনসিংহের পরিচিত আলবদর ছিলেন নাজমুস সাকিব। ময়মনসিংহের আলবদররা পাকিস্তান বাহিনী ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কমান্ডার কর্নেল মুহাম্মদ খান তাদের ক্যাম্পে এসে বললেন পিছু হটতে হবে। তারপর বললেন, তোমরা এখন ইচ্ছে হলে যেখানে খুশি যেতে পারো অথবা 'আমার সঙ্গে ঢাকায় যেতে পারো।'

সাকিব ও তার কিছু সঙ্গী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঢাকার দিকে মার্চ শুরু করলো। তারা এতই ক্ষুব্ধ ছিল যে রাতের খাবারও কেউ খায়নি। কেউ কারো সঙ্গে কথাও বলছিল না, এরপর সাকিবের ভাষায়–'পরের দিনও আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম। রাতের বেলা টাংগাইল পৌঁছলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম যে, অপরদিক থেকেও পাক আর্মির ইউনিট সমূহ ঢাকা যাচ্ছে। এখানে এটাও জানা গেল যে, ভারতীয় বাহিনী কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়া ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঐ সময় আমাদের থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল ব্যবধানে ছিল। এতদসত্ত্বেও সারারাত পায়ে হেঁটে সফর চলল। পরের দিন আমরা ঢাকা পার্শ্ববর্তী শহর মির্জাপুর পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে যানবাহন পাওয়া গেল এবং আমরা ঢাকা ছাউনির আল বদর ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। ১৬ ডিসেম্বর জানা গেল যে, অস্ত্র সমর্পণ করা হচ্ছে। আমাদের সকল সাথী দুঃখ দুশ্চিন্তায় ডুকরে কাঁদতে লাগল। এই ফাঁকে আর্মি অফিসাররা বললেন যে, 'আপনারাও আমাদের সঙ্গে অস্ত্র সমর্পণ করুন।' কিন্তু আমরা অস্বীকার করলাম। ইসলামী জমিয়তে তালাবার পূর্ব পাকিস্তানের নাজেম [মুজাহিদ] ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বললেন, 'আমরা ইসলামী আদর্শের জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ণের জন্য অর্জিত পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম। এখন আমাদের ক্ষমতাসীনদের গাদ্দারির কারণে এ ভূখণ্ড দুশমনের হাতে চলে যাচ্ছে। আমরা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করব। যাতে এই ট্রাজেডি দেখতে না হয়। আপনারা গেরিলা যুদ্ধের জন্য আত্মগোপন করুন।' আর্মির পক্ষ হতে জবাব এল, 'আমরা ডিসিপ্লিনের অনুগত।' এরপর আমাদের ক্যাম্প থেকে সকল আল বদর একে অপরের সঙ্গে গলাগলি করে অজানা পথে রওনা হয়ে গেল।

আমি ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় ছিলাম। তারপর মোটর লঞ্চ যোগে ফরিদপুর এসে গেলাম। ওখান থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে দিনাজপুর চলে গেলাম। আবার ১০ ফেব্রুয়ারি পায়ে হেঁটে ভারত সীমান্ত পার হলাম। চার মাস ভারতে কাটালাম। সেখান থেকে নেপাল চলে গেলাম। কাঠমুণ্ডুতে আমাদের আরো সাথী হিজরত করে চলে এসেছিল।

আমি নয় মাস পর্যন্ত টুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিনিময় নিতাম। আমরা আমাদের বেতনগুলো যৌথভাবে ব্যয় করতাম। এরপর ভারত হয়ে রাজস্থান বর্ডার দিয়ে পাকিস্তান প্রবেশ করলাম।[১]

সবশেষে চিফ জল্লাদ আশরাফুজ্জামানের বক্তব্য শোনা যাক। তার বর্ণনায় নিজের ওপর তিনি দৈব ছায়ার বর্ণনা করেছেন। খুনীদের ওপরও দৈব ছায়া বিস্তার করে এ ঘটনা খুব বিরল।

আশরাফ ছিলেন ঢাকার সালাউদ্দিন কোম্পানির কমান্ডার। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে গ্রেফতার করেছিল। দুর্ভাগ্য, তাদের শৈথিল্যের কারণে আশরাফুজ্জামান পালিয়ে যান। তার ভাষায়, গায়েবি নির্দেশ পেয়ে, যা একটা ভাঁওতাবাজি।

আশরাফ খালেদকে জানিয়েছেন তার ৫০/৬০ জন আত্মীয় স্বজন ছিলেন কিন্তু কারো সঙ্গে জানা শোনা ছিল না। হয়ত এ কারণে যে, সবাই তাকে আলবদরের প্রধান জল্লাদ হিসাবে জানতো। তার ভাষায়–বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কারণে প্রায় সবাই জানত যে, আশরাফুজ্জামান হচ্ছে আল বদরের লোক। ঢাকার পতনের পর তার সাথীরা পালাচ্ছিল এবং এমনভাবে দেখা সাক্ষাৎ করছিল যে, জীবনে তাদের সাথে আর দেখা হবে না। চোখে অশ্রু বন্যা নিয়ে গলায় গলায় জড়িয়ে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। 'ঐ অবস্থায় আনোয়ারুল হক, আব্দুল্লাহ ও আব্দুস সামাদ জানালো তাদের মা বাবা ইন্তেকাল করেছিলেন। আত্মীয়রা বিরোধী মতাদর্শের কারণে রক্তের পিপাসু ছিল। তারা বলতে লাগল, 'আশরাফ! আমি কোথায় যাব? কোনো ঠিকানা তো দেখছি না।'

আমি জবাব দিলাম, 'ভাই যদি কেউ উপযুক্ত হত তাহলে অবশ্যই তোমাদের আশ্রয় দিত। কিন্তু আমি তো তোমাদের সাথী। এমন জাহাজের আরোহী যার মাল্লাদের কাছে পাল নাই।' এই জবাব শুনে আমার দুঃসাহসী ও প্রাণোৎসর্গী সঙ্গী এ কথা বলে চলে গেল, 'আমরা অস্ত্র সমর্পণ করব না। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করব। অথবা শহীদ হয়ে যাব। খোদা হাফেজ।' ঐ তিন সাথী চলে গেল। এরপর তারা কোথায় সেটা আর জানা যায়নি।

ঐ রাতে আমরা ইংলিশ রোডে আন্দোলনের সাথীর বাড়িতে ছিলাম। পরের দিন সকালে নাস্তা সারার পর আমাদের সাথী আসাদের সঙ্গে অন্য কোনো ঠিকানা তালাশের জন্য বের হলাম। ছয় সাত মাইল দূরে অপর এক বন্ধুর ওখানে থাকার ব্যবস্থা হল।

আমরা আমাদের মালপত্র ফেরত নেয়ার জন্য অফিসে গেলাম। কিন্তু যে লোকের কাছে স্যুটকেস রেখে এসেছিলাম সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করল। শুধু তাই নয় সে মুক্তি বাহিনীর লোকদের ডেকে নিয়ে এল। আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। আমরা বললাম যে, 'আমরা ছাত্র।' তারা প্রশ্ন করল, 'আল বদর?'

আমরা হ্যাঁ না জবাব দেয়ার পরিবর্তে বললাম 'মুসাফির'। তারা আসাদকে দু একটি থাপ্পড় মারল। আর তার কাছ থেকে দুইশ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষান্ত হল।

তারপর মুক্তি বাহিনীর আরেক গ্রুপ এল। তাদের মধ্যে একজন বলল যে, 'আমি এই দুইজনকে আল বদরের ক্যাম্পের কাছে দেখেছিলাম।'

জেনারেল ফরমান আলীর দেয়া আমার পরিচয়পত্র তাদের তল্লাশীতে পাওয়া গেল। তাতে সন্দেহ আরো বেশি হল। তারা আমাদেরকে আল বদরের একটি ক্যাম্পে নিয়ে গেল। কিন্তু ওখানে আমাদের বন্ধুরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু তারা আমাদের ছাড়ল না। আমাদেরকে গাড়িতে বসিয়ে শহরে চক্কর লাগানো হল। রাস্তায় রাস্তায় তারা লোকদেরকে গর্বের সাথে বলতে লাগল যে, 'এরা হচ্ছে আল বদর কমান্ডার। আমরা তাকে পাকড়াও করেছি।' আসরের সময় আমাকে ফকিরাপুলে নিয়ে গেল। সেখানে আসাদকে মারধর করে অন্যত্র নিয়ে গেল। আমি একা রয়ে গেলাম। তারপর আমাকে টর্চার করা হলো, মারপিট করা হল।

এর আগে আমাকে কোনো টর্চার করা হয়নি। টর্চারের পর রেলওয়ে লাইনের নিকটে একটি ঘিঞ্জি এলাকায় যেখানে তাদের আড্ডা ছিল, সেখানে আমাকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে গেল। ওখানে আমাকে একজন জল্লাদের সামনে দাঁড় করানো হল। আর তথ্য উদ্ধারের জন্য প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা শুরু করল।

আমি গোপন কোনো তথ্য প্রকাশ করিনি। জল্লাদ রাশিয়ান রাইফেল দিয়ে আমাকে টার্গেট করার জন্য মোশন নিতে থাকে। দৃশ্যত মৃত্যু আর আমার মাঝখানে কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধান ছিল। কিন্তু আল্লাহর দয়া বিস্ময়করভাবে আমার দিকে হাত বাড়াল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, যাকে তারা হক সাহেব বলে ডাকত আমার কাঁধ ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী বিয়ে হয়েছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' জিজ্ঞাসা করল, 'বাচ্চা কয়টা?' আমি জবাব দিলাম, 'একটি মেয়ে।' একথা বলতেই তিনি জল্লাদকে বললেন, 'ওকে মেরো না।'

তাদের এক সঙ্গী টাকার একা মালিক হতে চেয়েছিল। তার সঙ্গীরা টাকার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি তখন বললাম যে, ঐ ব্যক্তি টাকা নিয়েছিল এবং অমুক জায়গায় ইটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। একথার উপর তাদের মধ্যে বেশ ঝগড়া হল। তারা আমাকে গালি দিতে থাকে যে, সে নিজে মরবে, আমাদেরকেও মারবে। অস্বীকারকারী ব্যক্তিতে তারা খুব পেটাল। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করল যে, টাকা সেই নিয়েছিল। এই ফাঁকে আমার ডাইরি থেকে বাংলা ও ইংরেজি লেখা পড়ে নেয়া হয়। যার মধ্যে পাকিস্তানপন্থী ও গাদ্দার খ্যাত লোকদের তালিকা ছিল। স্যুটকেসে স্টেনগানের গুলি ও হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আলোচনাও ছিল।

এসব কথা তাদের জন্য ভূমিকম্পের চাইতেও কম ছিল না। তারা শ্লোগান বানাল যে, আমাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। আবার শেষ রাতে ঐ স্থানই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যে হক সাহেব আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি নিজেই এখন বলেছিলেন যে, 'একে মেরে ফেলা উচিত।' এই কথাগুলো পাশের কামরায় হচ্ছিল। আর আমি চিন্তা করছিলাম যে মরতে তো হবেই। দু চারজনকে খতম করে মরাই উত্তম হবে। আমি কারো কাছ থেকে স্টেনগান ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা মনে মনে তৈরি করলাম, ভয়ভীতি আসলেই ছিল না। তারপর আর একটি কথা মনে এল যে, ঢাকায় আল

বদরের তিনজন কোম্পানী কমান্ডারের মধ্যে দুইজন শহীদ হয়ে গেছেন। হয়ত [আমি] তৃতীয় জনের কপালেও শাহাদৎ লেখা হয়ে গেছে। এই চিন্তায় মন একেবারে চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর জমিয়তের আরেকজন সাথীকে উপর্যুপরি কিল, ঘুষি ও গালিগালাজের তুফানের মধ্যে আমার কামরায় নিয়ে আসা হল। এটি ১৮ ডিসেম্বরের কথা। ঐ সময় না আমার চোখ বন্ধ রাখা হয়েছিল, না আমার হাত। এ কারণে আমি কারো কাছ থেকে স্টেনগান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উঠলাম। তখন পাহারাদার বলল, 'পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছ!' সাথে সাথে অন্যদের ডেকে আমার ও আমার সাথীর হাত ও চোখ বেঁধে দেয়া হয়। আমি ঐ অবস্থাতেই এশার নামাজ পড়লাম। আমার হাত পেছন দিকে ছিল এবং তারা আমাকে মেরে ফেলার জন্য উতলা হয়ে রয়েছিল। ঐ কথার উপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হক বলল, 'ওকে যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তবে এখন কিছু করে না। তার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করে নাও। তারপর তাকে শেষ করে দাও।' হক থাকত ফকিরাপুল। সে আমার চোখের উপর পর্যন্ত বাঁধল। গাড়িতে বসিয়ে বাড়ির চাকর বাকরের মাঝ দিয়ে আমাকে উপরের বাড়িতে নিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত তো মুক্তিবাহিনী তরুণদের পাল্লায় পড়েছিলাম। এখন হকের ঘরে বয়সের দিক দিয়ে পরিপক্ক লোকদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। যারা জালেম ছিল, অভিজ্ঞতা সম্পন্নও ছিল।

আমাকে শক্ত করে পিছমোড়া বাঁধা হয়েছিল। বলা হলো যে, 'প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক বলবে। নাহলে তুমি দেখবেই যে, পরে কি অবস্থা হয়ে যাবে।'

আমার কাছে অস্ত্র, টাকাকড়ি, অলংকার প্রভৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু আমি সঠিকভাবে তাদের কিছু বলিনি।

তারা বলতে লাগল, 'সঠিক বল। বাহু কেটে ফেলব। চোখ খুলে ফেলব।' কিন্তু যখন এই ধমকও কাজে এল না তখন তারা আমাকে চিত করে শুইয়ে দিল। পাঁচ ছয় জন লোক আমার হাত পা শক্ত করে ধরল আর এক ব্যক্তি চট করে আমার বুকের উপর বসে পড়ল। আর আমার এক চোখের উপরে সজোরে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিল। আমি যদি জোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা না দিতাম তাহলে সেই জালেম অবশ্যই আমার চোখ বের করে ফেলত। যখন সে আমার বাধার কারণে দূরে ছিটকে পড়ল তখন একথা বলে আমাকে ছেড়ে দিল যে, 'বখতের ভীষণ শক্তি, একে আজকে নয় কালকে মারব।'

পরের দিন অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর আমাকে নাস্তা দিল আর বলল যে, খেয়ে দেয়ে মর। এরপর আমাকে শহরে ঘুরাল। লোকদেরকে বলল যে, 'এ হচ্ছে আল বদরের কমান্ডার। আমরা একে গ্রেফতার করেছি।' চক্কর দেয়ার পর আমাকে পুনরায় ওখানে নিয়ে আসে। আমাকে বলতে লাগল যে, 'অস্ত্র ভাণ্ডার যদি দেখিয়ে দাও তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব।' আমার মালপত্র গাড়ি, চশমা এমনকি জুতা পর্যন্ত নিয়ে নিল। আমি টেট্রনের প্যান্ট পরেছিলাম। একজন ছুঁয়ে বলল যে, 'এর প্যান্ট কি করবে?'

আরেকজন জবাব দিল, 'কালকে মরবে তো, তারপর নিয়ে নিও।' আমি বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। এরপরও দরজায় দুই পাহারাদার আমাকে পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত ছিল শেষ রাত চার টায় আমাকে গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। রাতের প্রায় দুই আড়াইটার সময় একটা স্বপ্ন দেখলাম যে, একটি পরিষ্কার রাস্তা আমার সামনে। আর একটি গায়েবী আওয়াজ সে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হেফাযত করছিল। সামনে কোনো লোক ছিল না। শুধু আওয়াজটাই শোনা যাচ্ছিল। তিনবার এরূপ হওয়াতে আমার চোখ খুলে গেল। আমার একিন হয়ে গেল যে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে ইশারা। এখন আমি সজোরে আমার হাত মুক্ত করে ফেললাম। তারপর চোখের পট্টিও খুলে নিলাম। তারপর আমার সাথীকে মুক্ত করলাম।

পাহারাদার তখন ঘুমাচ্ছিল। এখনতো আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আইন একিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) হয়ে গেল। চুপে চুপে উঠলাম। খুব আস্তে দরজা খুললাম। আর বাইরে বেরিয়ে গেলাম। আমার পরে আমার সাথীও বেরিয়ে গেল। আমরা নিহত হওয়ার স্থান থেকে বের হয়ে উভয়ে পূর্ণশক্তিতে পালানো শুরু করলাম। প্রায় ১ মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তের এক সাবেক নাজিমের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ হবে।

চারটার সময় আমার মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এখন তাদের হাতের নাগালের বাইরে। আল্লাহ আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। মনে হলো রাস্তাটি স্বপ্নে দেখা রাস্তাটির মতোই পরিষ্কার। সাথী আলাদা রাস্তা ধরে চলে গেল।

২০ ডিসেম্বর আমি পোষাক বদল করে ঢাকার ফরিদাবাদে এক আত্মীয়ের কাছে চলে গেলাম। ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ওখানেই রইলাম। ঢাকায় খবর হয়ে গিয়েছিল যে, আশরাফ মারা গেছে। তার বড় ভাই আত্মগোপন করেছে। পত্রপত্রিকা আমার ছবি ছেপে দেয়, যা আসলে ছিল শওকত ইমরানের।

এখান থেকে গ্রামে একজন আত্মীয়ের কাছে চলে গেলাম। আর ৮ জানুয়ারি নিজের গ্রামে গেলাম। এক সপ্তাহ সেখানে থাকলাম। সেখানে কোনো বিপদাশংকা ছিল না। ১৫ জানুয়ারি জানা গেল যে, ১২ জানুয়ারি সংবাদপত্রে আমার ছবি এবং অনুসন্ধানে সহযোগিতার খবর ছাপানো হয়েছে। লেখা হয়েছিল যে, অনুসন্ধানকারীকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। ঐ দিনই আমি আমার আরেক প্রিয়জনের কাছে চলে গেলাম। এভাবে থেমে থেমে ১৯ মার্চ যশোর জেলার কালিগঞ্জে এক আত্মীয়ের কাছে চলে গেলাম। ২৬ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে রইলাম। খবর এল যে, আমাদের ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্তে হয়ে গেছে এবং বাড়ির লোকজনের ওপর নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। আমার ছোট ভাইকে প্রাণে মারার জন্য আটক করা হয়। কিন্তু সেও পালিয়ে যায়।

২৬ মার্চ এই ভূখণ্ডকে বিদায় জানালাম এবং কলকাতায় এক পরিচিত লোকের কাছে উঠলাম। সেখানে একজন বড় সহৃদয়বান মুসলমান আহমদের সাথে দেখা হল।

তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন করে আমাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। যখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বহু সাহায্য করলেন।

ওখান থেকে দিল্লী গেলাম। তারপর ওখান থেকে পাটনা একইভাবে বিহারের পথ ধরে ওরাটনগর ও নেপালের অন্যান্য বড় বড় শহরে পৌছলাম। ওখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনিও আমার মত বিদেশী ছিলেন। ১৯ এপ্রিল আমরা কাঠমুণ্ডু পৌছলাম। পাকিস্তান দূতাবাসকে অবহিত করলাম। তাসনীম আলম ম্যানেজারকেও (পাকিস্তান জমিয়তে তালাবার সভাপতি) চিঠি লিখলাম।

প্রথমে বাসস্থানের ব্যবস্থা দূতাবাসই করল। আমাকে মাসিক ৬০ টাকা করেও দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু জানি না কি কারণে খুব শিগগির এ ব্যবস্থাটি রহিত করা হয়। আমরা ১০/১২ জন লোক একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করতে লাগলাম। এখানে আমাদের সাবেক নাজেমে আলা [নিজামী] ও ৮/১০ জন সঙ্গী পরবর্তীতে এসে পৌছেন। আমরা শর্টহ্যান্ড টাইপ রাইটিং ও অন্যান্য পেশাগত বিদ্যা শেখা শুরু করে দিলাম। আমি যখন এলাম তখন আমাদের সাথী ছোটখাট ব্যবস্থা করার প্ল্যান শুরু করে দিলেন। আমরা এখানে সভা বৈঠকের ব্যবস্থাও চালু করে দিলাম। সামগ্রিকভাবে দূতাবাস আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। আমাদের ২/৩ জন সাথী ব্যক্তিগত খরচে পাকিস্তান যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। ৩১ অক্টোবর আমরা ৩ সাথী পাকিস্তান যাবার জন্য রেঙ্গুনে পৌছলাম। ঐ দিনই সেখান থেকে করাচী পৌছলাম। নেপাল পৌছার পর জানা গেল যে, আমার সে ডাইরি যা তাদের হস্তগত হয়েছিল বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার কয়েকটি পত্রিকা 'জল্লাদের ডাইরি' শিরোনামে কিস্তি আকারে প্রকাশ করছিল। সে ডাইরিতে অনুপ্রবেশকারী অনুচর ও ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের কিছু পরিকল্পনা ছিল এবং অভিযানের ফলাফল লেখা হতো। আলবদর ক্যাম্প থেকে চলে আসার সময় এক সাথীকে বলেছিলাম, স্যুটকেস থেকে ডাইরিটা বের করে যেন নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু, তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন।'

আশরাফুজ্জামানের বক্তব্য কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে, কিন্তু এখানেও লক্ষ্যণীয় যে, মুক্তিবাহিনী তাকে ধরার পরও হক নামে এক ব্যক্তি তাকে রক্ষা করে। পরে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এবং মুক্তিবাহিনীর শৈথিল্যের কারণেই আলবদরদের প্রধান জল্লাদ ছাড়া পেয়ে যায়। উল্লেখ্য, আশরাফুজ্জামানের সেই ডায়েরিটার কথাও সবাই ভুলে গেছেন। সেটি কোথায় সে খবরও কেউ রাখেনি। অধিকাংশ আলবদর এভাবে মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য স্বপক্ষের রাজনৈতিক কর্মির শৈথিল্যের কারণে পালাতে পেরেছে বা জনসমাগমে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পেরেছে। আশ্চর্য ১৯৭১ সালের পর এই নিয়ে তিনবার আওয়ামী লীগ ও জোট ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু আলবদরদের বিরুদ্ধে সংহত পরিকল্পনা নিয়ে খোঁজ খবরের চেষ্টা করেনি। এখন আলবদর বন্ধু মনসুর খালেদের বই প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানা গেছে।

আলবদর নেতারা আগে থেকেই তাদের পলায়নের পথ ছকে রেখেছিলেন। ধেড়ে আলবদর যেমন, নিজামী, মুজাহিদ, আশরাফুজ্জামান ও অন্যরা পালিয়েছিলেন কাঠমুণ্ডু। নেপাল বাংলাদেশের সমর্থক ছিল। তারপরও দেখি, কাঠমুণ্ডুর মতো জায়গায় যেখানে ভারতীয় গোয়েন্দাদেরও প্রভাব প্রবল, সেখানে আলবদররা সংঘবদ্ধ হয়ে অপারেট করছে। কাঠমণ্ডু হয়ত ভাবেনি আলবদররা সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। শত্রুর এই ধরনের মনোভাব জেনেই বড় আলবদররা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তানও রাষ্ট্রীয়ভাবে আলবদরদের সহায়তা করেছে।

মাঝারি ধরনের আলবদররা পালিয়েছিল বার্মায়। সেখানকার রোহিঙ্গারা তাদের সমর্থন করেছে। প্রত্যেক জায়গায়-ই পাকিস্তানী দূতাবাস তাদের সহায়তা করেছে। এবং প্রায় প্রত্যেকেই ভারত হয়ে পাকিস্তান গেছে। পাকিস্তানে গিয়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সাহায্যে দেশের আলবদরদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। এবং মেসিয়াহর জন্য অপেক্ষা করেছে।

আলবদরদের মেসিয়া বা ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হলেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত লে. জে. জিয়াউর রহমান। আগেই ইঙ্গিত করেছি তার উত্থানের পেছনে আলবদরদের সমর্থন ছিল, না হলে ক্ষমতায় এসেই আলবদরদের জন্য 'আলবদর পুনরুজ্জীবন' প্রকল্প গ্রহণ করতেন না। এর বিপরীতে জিয়া বন্ধুদের কোনো যুক্তি আছে কিনা জানি না।

আলবদররা কেন যুদ্ধাপরাধী

প্রত্যেক আলবদরই যুদ্ধাপরাধী। তারা ছিল পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী শক্তি তবে সরাসরি অধিনস্ত। তারা কখনও কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করলেও পাকিস্তানী সেনা কমান্ডের অনুমতি ছাড়া সাধারণত তারা কাজ করতে পারত না। তাদের প্রশিক্ষণ, বেতন, অস্ত্রশস্ত্র সব পাকিস্তানী বাহিনীই যোগাতো। সুতরাং, ১৯৭১ সালের খুন, ধর্ষণ, হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সবকিছুর দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরও বর্তায়। এ কারণে, নিজামী থেকে আশরাফুজ্জামান বা যে কোনো আলবদরেরই বিচার হওয়া উচিত।

পাকিস্তান বাহিনীর ওপর নির্ভরতা ও তাদের হয়ে কাজ করার প্রমাণও এখন পাওয়া যাচ্ছে। মনসুর খালেদের বইয়ের একটি অধ্যায় আছে 'আলবদরদের অবদান'। তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা থেকে আলবদর সম্পর্কে পাকিস্তানীদের বিবৃতি, বক্তৃতা সংকলন করেন।

এ সব পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততাই তুলে ধরে। এবং এগুলিও যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চ লাইটের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেসামরিক প্রশাসনের দেখা শোনাও তিনি করতেন। বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য তিনি দায়ী–একথা অনেকেই বলেছেন। আমি ও মহিউদ্দিন আহমদ যখন তার সাক্ষাৎকার নিই রাওয়ালপিণ্ডিতে, তখন তিনি ১৯৭১ সালের গণহত্যার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন [১৯৯৮] আমাকে যে, রাজাকার, আলবদর, আল শামস সব কিছু ছিল নিয়াজীর নিয়ন্ত্রণে। তিনি এর কিছুই জানেন না। ৯/১০ ডিসেম্বরের একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তার ভাষায়–

'শুনুন, জেনারেল শামসের ছিলেন পিলখানার দায়িত্বে। তিনি আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাধারণত আমাদের কোনো বৈঠক হয় না। জেনারেল শামসেরকে বললাম, ঠিক আছে যাব। পিলখানায় পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা

হয়ে এল। সেখানে দেখলাম কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে কেন? তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি, সে জন্যই গাড়িগুলো এখানে। তারপর বললেন, কয়েকজন লোককে গ্রেফতার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজ্ঞেস করো। এতে তোমার মত কি? আমি বললাম, স্যার, এখন কাউকে গ্রেফতারের সময় নয়, বরং এখন কতলোক আমাদের সঙ্গে আছে সেটিই দেখার বিষয়।'

এই যে গ্রেফতার ও গাড়িগুলির কথা বলা হচ্ছে, এখানেই ইঙ্গিত আছে আলবদরদের। আলবদররা তখন বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে মানুষ তুলে নিচ্ছে। এই গাড়িগুলো আলবদরদের দেয়া হতো মানুষজনকে তুলে নেয়ার জন্য।

আমাকে যখন জেনারেল ফরমান এ কথাগুলো বলেন, তখন বোধহয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ১৯৮৩ সালে *দৈনিক জং* ও *দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্তে* এক সাক্ষাৎকারে তিনি কী বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আলবদর ও আল শামসের কার্যকলাপের আমি প্রত্যক্ষ দর্শক। এই দুটি সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলায় তাদের জান কুরবান করেছিল।'

জেনারেল নিয়াজী কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকার করেননি। আমাকে তিনি বলেছিলেন [১৯৯৮] 'আলবদর আল শামস আমারই সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়াটি আমি শুরু করি মে মাস থেকে। ওরা সরাসরি আমার কমান্ডে ছিল।'

২১ মে ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর যাত্রা শুরু। যে মেজর রিয়াজ এদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি মনসুরকে জানিয়েছিলেন–'তারা বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও প্রতিরক্ষাকে ঈমানের অংশ ও দ্বীনের দাবি বলে মনে করতেন।'

বিগ্রেডিয়ার সিদ্দিক সালিকের নাম আমাদের পরিচিত। ঢাকায় ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন। বইও লিখেছেন। '*ম্যায়নে ঢাকা ডুবতে দেখা*' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, 'আলবদর, আলশামস ও রাজাকাররা পাকিস্তানের জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে কোনো আদেশ তারা সম্পূর্ণভাবে পালন করতো।'

ভালো বলেছেন আলবদরদের সুপার বস আবুল আলা মওদুদী। ১৯৭৩ সালে করাচির *দৈনিক জসরত* পত্রিকায় তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তখন আলবদররা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে কাজ করছিল। আর যখন পাকিস্তানী বাহিনী দুষ্কৃতিকারী ও ভারতীয় বাহিনীর গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় তখন এই তরুণরা পাক বাহিনীর পুরোপুরি সহযোগিতা করে। এমন কি সেনাবাহিনীর সাফল্য এই তরুণদের ওপর নির্ভর করেই অর্জিত হচ্ছিল। কেননা সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাস্তাঘাট ও ভাষা জানত না বা চিনত না। ঐ সময়ে এই তরুণরা ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে সামনে এগিয়ে যায় এবং তারা ভারতীয় বাহিনীর আগ্রাসী

হামলা প্রতিহত করার জন্য স্বদেশী বাহিনীকে পূর্ণরূপে সাহায্য করে। তারা প্রচুর কুরবানী স্বীকার করে। এরাই ছিল সেই নওজোয়ান যারা পাক বাহিনীর অগ্রপথিক ছিল। তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৫ হাজার ঐ সংকটময় পরিস্থিতিতে শহীদ হয়েছেন আর যারা জীবিত রয়ে গেছেন তারা আপন বাঙালি ভাইদের হাতে এখন শহীদ হচ্ছেন।'

৫০০০ আলবদর নিহত হলেতো আমরা বেঁচে যেতাম। নিহতের সংখ্যা অনেক কম। আর বাংলাদেশ হওয়ার পর তাদের কোথায় নিধন করা হয়েছে? হয়নি। তবে, ধরে নিতে হবে পাকিস্তানীরা বিশেষ করে পাকিস্তানের জেনারেল ও 'মৌলানা'রা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত।

নিয়াজীর কথাতো আগে খানিকটা উল্লেখ করেছি। ১৯৭৮ সালে 'টাইগার বোল তা হ্যায়' শিরোনামে তার একটি সাক্ষাৎকার বের হয় *কওমী ডাইজেস্টে*। সেখানে তিনি বলেন-'আল বদর আল শামস চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক প্রাণবন্ত ও উদ্বেলিত পাকিস্তানী ছিল। যারা মনে প্রাণে পাক বাহিনীকে সাহায্য যুগিয়েছে। তারা আমাদেরকে তখনো ধোকা দেয়নি। আমাদের সঙ্গ ছেড়ে তারা মুক্তি বাহিনীতে চলে যায়নি। আমাদের দুশমনদের সাথে কখনো আঁতাত করেনি। নিজস্ব কমান্ডোদের দুশমনদের এলাকায় পাঠানোর ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন দুশমনের ভূখণ্ডে অধিকাংশ ও বেশিরভাগ এ জাতীয় অভিযান আল বদরের রাজাকাররা পরিচালনা করত। তারা আগরতলায় (ভারতে) থিয়েটারে বোমা ফেলেছিল। এই ঘটনার দ্বারা ভারতীয় জন সাধারণের মনোবল বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এই জওয়ানরা কোলকাতায়ও ভালো রকমের অভিযান পরিচালনা করছিল। পূর্ব পাকিস্তানের এ সকল রাজাকার ও ইসলাম পছন্দ নেতৃবৃন্দের খেদমতে আমার কেবল এ টুকুই বলার আছে যে, যারা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে জান বাজি রেখেছে তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিন যারা যেখানেই থাকুন।'

টাইগার নিয়াজী ওরফে বিল্লি নিয়াজীর অতিরঞ্জনের অভ্যাস পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেল ও বেসামরিক কর্মকর্তারাই উল্লেখ করেছেন। আগরতলায় আলবদরদের বোমা ফেলা ও কলকাতায় বোমা ফেলার কথা বলা তার ঐ রকম কিছু অতিরঞ্জনের উদাহরণ।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নসরুল্লাহ খান বলেছেন, আলবদর আল শামসের কারণে পাকিস্তানী বাহিনী অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বড় রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত খান ১৯৭১ সালে ছিলেন যশোর খুলনার দায়িত্বে। ১৯৭৮ সালে *উর্দু ডাইজেস্টে* এক সাক্ষাৎকারে বলেন-'আমাকে সালাম করতে দিন আল বদর ও আল শামস এর ঐসব বীর সন্তানদের যারা পাকিস্তানীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই লড়াই করেছেন, যারা নিজেদের রক্ত লেখা দিয়ে অবিচলিত ও সাহসিকতার নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে ইসলামী ছাত্র সংঘের তরুণদের কথা উল্লেখ করব, যারা বীরত্বের বিরাট কৃতিত্ব গড়েছেন। কঠিন

পরিস্থিতিতে যারা প্রত্যয়ের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অনেক শহীদ হয়ে গেছেন, অনেকে বারবার আহত হয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট হয়েছে। প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের চোখের সামনে তাদের পিতামাতা ও ভাইদের সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে যা দেখে পাথরের বুকও ফেটে যেত। অথচ তাদের পা এটুকুও নড়েনি। এসব তরুণ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে যে কীর্তি গড়েছেন তা নিশ্চিতভাবেই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায়।'

শান্তিকমিটির প্রধান খাজা খায়েরুদ্দীন এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭৭ সালে বলেন–'যখন কারো খেয়াল ছিল না তখন মওদুদী একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের আদর্শবান কর্মচারী যোগাড় করা ও পাকিস্তানকে সঠিক পরিচালনার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার চেষ্টাসমূহের একটি ফল হচ্ছে ইসলামী জমিয়তে তালাবা (ইসলামী ছাত্র সংঘ) আমার সম্পর্ক এমন এক দলের (মুসলিম লীগের) সঙ্গে যেটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে পাকিস্তানের উত্তরাধিকারী বলেও দাবি করি। কিন্তু পাকিস্তানকে সঠিক অর্থে পাকিস্তান বানানোর জন্য যে কাজ করেছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, একথা স্বীকার করে নিতে আমাদের লজ্জা কেন হয়? এটা পরিষ্কার যে এ কাজটি মাওলানা মওদুদী করেছেন। এই বুড়ো লোকটি তরুণদের এমন টীম গঠন করেছেন যা ইসলামের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আমার চোখগুলো ১৯৭১ সাল পূর্ব পাকিস্তানে দেখেছে যে, কিভাবে আল্লাহর নামে জমিয়তের (সংঘের) তরুণরা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর উপায়গুলো তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক হয়ে যাওয়ার কারণে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী ছাত্র সংঘের তরুণরা এখনো পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ করেনি। আর এটা তাদেরই কৃতিত্ব যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাম থেকে সেক্যুলার শব্দটি অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে।'

তিনি তাদের সাথী জেনারেল জিয়াউর রহমানের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি সংবিধান সংশোধন করেছিলেন রাজাকার আলবদরদের বাংলাদেশের সমাজে রাষ্ট্রে পুর্নবাসন করার জন্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আলবদর বন্ধু বললে কি অতিরঞ্জন হবে?

আলবদররা কী করেছিল

আলবদদরা কী করেছিল? এ প্রশ্ন শুনে অনেকে বলতে পারেন সবাই যা জানে সে বিষয়ে প্রশ্নের তাৎপর্য কী? আলবদর পাকিস্তানীদের সাহায্য করেছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তির দমনে। এ কারণে, একদিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে, নিরীহ বাঙালিদের বাড়িঘর লুট করেছে, হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে। কিন্তু, আলবদর আরেকটি কাজ করেছে। তা হলো, সুনির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী/পেশাজীবীদের হত্যা করেছে। আলবদর বাহিনী গঠন হওয়ার পর থেকেই এ হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তবে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড তুঙ্গে ওঠে। সারা বাংলাদেশে এক যোগে, বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয় পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে। অপহরণের পর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালানো হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আলবদর হোক, রাজাকার হোক, মানুষ কি মানুষের ওপর এমন অত্যাচার করতে পারে? ১৯৭১-৭২ সালের দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলি দেখলে, আলবদরদের নিষ্ঠুরতার অনেক খবর জানা যাবে। রায়ের বাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমি যা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর, আলবদরদের নৃশংসতার প্রতীক। দুয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক–'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।...'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা...মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।...

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক-যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। হামিদা রহমান ডা. ফজলে রাব্বীর লাশ দেখে

লিখেছিলেন–'ডা. রাব্বীর লাশটা তখনও তাজা, জল্লাদ বাহিনী বুকের ভিতর থেকে কলিজাটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো যে, তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাই তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাৎ হয়ে দেহটা পড়ে আছে। পাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। রাব্বী সাহেবের পা দুখানা তখনও জ্বলজ্বল করে তাজা মানুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাক, মুখ কিছুই অক্ষত ছিল না। দস্যু হায়েনার নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত।... সামনে চেয়ে দেখি, নিচু জলাভূমির ভিতর এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয় একেবারে বারো তের জন সুস্থ সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে।'

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেছিলেন–'হানাদার পাক বাহিনীর সহযোগী আলবদররা পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে যায় তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এ দেশের মানুষের চোখ। আলবদরের খুনিরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।' [দৈনিক পূর্বদেশ, ১৯.১.১৯৭২] উল্লেখ্য, ডা. আলীম চৌধুরীর চোখ আলবদররা উৎপাটন করেছিল। মওলানা তর্কবাগীশ আরো বলেছিলেন–'খুনিদের নামে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হলো আলবদর বাহিনী। একি কোনো মনঃপূত নাম? যে বদর যুদ্ধ ছিল আদর্শের জন্য, ইসলামের প্রথম লড়াই, সেই যুদ্ধের সাথে কি কোনো সংযোগ এই নৃশংসতার মধ্যে ছিল? হানাদারদের সহযোগী এই বদর বাহিনী শুধু ইসলামের শত্রু নয়। এরা হলো জালেম।'

অধ্যাপক আনিসুর রহমান শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি দেখে এসে বলেছিলেন–

'ইতিহাসে পৈশাচিকভাবে হত্যার অনেক কাহিনী পড়েছি। কিন্তু শিয়ালবাড়িতে ঐ পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন বা দেখেছেন? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোস্তকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে মানুষের হাড়। একটা মানুষকে দুটুকরো করলেই যথেষ্ট পাশবিকতা হয়, কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন পাশবিকতার উল্লাস?

...সত্যি আমি যদি মানুষ না হতাম, আমার যদি চেতনা না থাকতো, এর চেয়ে যদি হতাম কোনো জড় পদার্থ তাহলে শিয়ালবাড়ির ঐ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী এই দ্বিপদ জন্তুদের সম্পর্কে এতটা নিচু ধারণা করতে পারতাম না। মানুষ যত নীচই হোক, তবুও ওদের সম্পর্কে যে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা একেবারেই উবে যেত না, আর মানুষ কেন কোনো প্রাণীই কি পারে এত নির্মম, এত বর্বর, এতটা বোধহীন হতে?...শেষ পর্যন্ত আর দেখতে চাই না বলে মাটি, ভুল বললাম মানুষের হাড়ের ওপর বসে পড়তে হয়েছে। সারা এলাকার মানুষের হাড় ছাড়া অবিমিশ্র মাটি কোথায়!'

আমরা শিয়ালবাড়ির যে বিস্তীর্ণ বন-বাদাড়পূর্ণ এলাকা ঘুরেছি তার সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকংকাল আর নরকংকাল। পা বাঁচিয়েও হাড়হীন মাটির ওপর পা ফেলতে পারিনি। দেখেছি কুয়ায় কুয়ায় মানুষের হাড়।' [দৈনিক পূর্বদেশ, ৮.১.১৯৭২]

আলী আকবর টাবী দৈনিক আজাদ উদ্ধৃত করে লিখেছেন, গ্রেফতারকৃত এক আলবদর স্বীকার করেছিল–'আর এক সপ্তাহ সময় পেলেই আলবদর বাহিনী সকল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলতো।' [আলী আকবর টাবী, '*মতিউর রহমান নিজামী, আলবদর থেকে মন্ত্রী*' ঢাকা, ২০০৭]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। বধ্যভূমি থেকে কেউ ফিরে আসে না, আসেনি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর ও আল শামস বাহিনী। এখনো চল্লিশ বছর পেরোয়নি ঐসব নৃশংস ঘটনার। কিন্তু, বাংলাদেশ যেন এসব মনে রাখেনি।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। আমার সামনে ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ কিছু সংখ্যা। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং একসময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়ত, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না-হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

১৪ ডিসেম্বর কেন আলাদাভাবে বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় তা নিয়েও যে গোড়া থেকেই প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। উঠেছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তারই একটি অংশ বুদ্ধিজীবী হত্যা। পার্থক্য শুধু একটি থাকতে পারে। তা হলো, সাধারণ মানুষদের যত্রতত্র বধ করা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের খবর নিয়ে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। দুটো প্রক্রিয়াই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তবে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আরো জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরিকল্পিত উপায়ে তাদের তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ে শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।'

পাকিস্তানীরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণীর প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলি সত্যি, যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানীরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, এক ধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হলো, যদি বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষগ্রন্থ'-এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত–'এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নির্বীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।'

'স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি. আই.এ চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদরবাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হলো : 'বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।' ['*একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়*' থেকে উদ্ধৃত] বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদরবাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদরবাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বাচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছেন তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছেন জামায়াতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, আবদুল কাদের মোল্লা, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ.শ.ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ছিল খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট

আলবদর ছিল। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয়নি। ১৪.৯.৭১ তারিখে জামায়াতের মুখপত্র সংগ্রামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল–'আল বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আলবদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আলবদর সাক্ষাৎ আজরাইল।'

সারাবছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও, পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আলবদররা মরণ-কামড় দেয়। এ সম্পর্কে সে-সময়কার *দৈনিক বাংলায়* ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন–'এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামায়াতে ইসলামীর আল-বদর। 'শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।'

গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমণ্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহুসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত একসপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয়নি।

'ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর সেই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একসপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।'

সমন্বয়ের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের হয়ত এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নাও মনে হতে পারে। কারণ তা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে একটি দৈনিকে। সে-জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)–

...বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা : যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়।

শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃত্যুদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।

... এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন; তাদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে : ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

'বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদের ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গির্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।'

আলবদরদের বিরুদ্ধে তদন্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার জার্মানিতে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করেছিলেন। আলবদররা অবিকলভাবে হিটলারের নীল নকশা অনুসরণ করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ আকারে গণহত্যা ও সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। এই প্রকল্পের পরিকল্পক পাকিস্তানী সামরিক জান্তা। আর ঐ প্রোগ্রাম কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল প্রধানত আলবদর ও আলশামসরা। সামরিক জান্তার পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন হত্যা পরিকল্পনার পরিকল্পক। আলবদররা ছিল সামরিক বাহিনীর অধীনে। সে জন্য তাত্ত্বিকভাবে তারা ছিল জেনারেল নিয়াজীর অধীনে। সে হিসেবে গণহত্যা তো বটেই বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্যও নিয়াজী দায়ী।

আলবদরদের হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুরতা জনমনে এমনই অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল যে, পাকিস্তানী, রাজাকার বা শান্তিকমিটির সদস্যদের বিচারের আগেই আলবদরদের বিচারের দাবি ওঠে।

২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) *দৈনিক বাংলা* লিখেছিল–'আল-বদরবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।'

অবশেষে, চলচ্চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক জহির রায়হানের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ভারতের সাপ্তাহিক *নিউ এজ* পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে জহির রায়হান জানান–

'আল-বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা এই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইয়ের দেহের অবশেষ ঢাকায় বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছে তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবে জন্য সুপরিচিত ছিলেন।'

আল-বদরবাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই একরকম ছিলেন। জহীর রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, আল-বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদেরকে আল-বদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়রিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হলো হেইট (Height) ও ডুসপিক (Dwespic)।

এদের নামে পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউ.এস.এ. (U.S.A.) ও ডি.জি.আই.এস. (D.G.I.S.) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে–রাজনৈতিক ৬০-৬২, ৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে–এ দু'জন আমেরিকান পি.আই.এ-র একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কোলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি.আই.এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গতবছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল-বদরবাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা-সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয়নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারী দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।'

এরপর তাঁর বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজে মিরপুরে গিয়ে তিনি নিজেই নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল। তারপরও জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া কেউ রুখতে পারেনি। মনে রাখা দরকার, মিরপুর তখন ছিল আলবদর কাদের মোল্লার দখলে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের কাজ জহির রায়হানের অর্ন্তধানের পর থেমে যায়। তিনি যে সব নথিপত্র যোগাড় করেছিলেন সেগুলোরও আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তবে, বুদ্ধিজীবী/গণহত্যার বিচারের দাবি থামানো যায়নি। ১৯৭২ সাল থেকেই এই দাবি তোলা হয়েছিল এবং তৎকালীন সরকারও এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবং আন্তর্জাতিকভাবেও দাবি উঠেছিল বিচারের। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ–

১. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক জুরি সম্মেলন রায় দিয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত (দৈ. ই. ৭.৯.১৯৭২)
২. মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছিলেন 'ইসলামের নামে গণহত্যা দেখিয়া যান' (দৈ. ই. ২৬.২.১৯৭২)
৩. সরকার গঠন করে গণহত্যা তদন্ত কমিশন, ৫.৪.১৯৭২
৪. ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, গণহত্যার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

বিজয়ের দু'দিন পর ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার দাবি করা হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন অপরাধীদের বিচারের।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি.

স্টোনহাউজ বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ-বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের অনেকের ধারণা ডিসেম্বরেই বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল। আসলে তা নয়। ২৫ মার্চ থেকেই তা শুরু হয়েছিল। এর প্রমাণ, ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করা। সারা বছর ধরেই এ অপহরণ ও হত্যা চলেছে। আল-বদর, আল শামস গঠিত হবার পর এ হত্যাকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে মাত্র। অনেকে ডিসেম্বরের আগেই অপহৃত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানী ও তাদের সহযোগী আল-বদর ও আল-শামসরা কতজন বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে? এর সঠিক হিসাব কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু কারা শহীদ হলেন, খুনি কারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এখনো সে চেষ্টা নেয়া হয়নি। এসব যখন মনে হয় তখন আমাদের পুরো শ্রেণীটির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে-কাজটি করা হয় তাহলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে *দৈনিক বাংলায়* আবেগময়ী এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল–'পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবে না।' কিন্তু ক্ষমা করা হয়েছে শুধু নয়, তাদেরকে এই দেশেরই প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, এমপি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা-জাদুঘর হয়নি কিন্তু সামরিক-জাদুঘর হয়েছে এবং বিএনপি সরকারের আমলে শহরের কেন্দ্রস্থলে তা স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদমিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান।

মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

পত্রিকায় সংবাদ থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, তারপর এ মামলার কী হলো তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আল-বদর আবদুল মান্নানকে ('মওলানা' ও 'ইনকিলাবের' পরলোকগত মালিক) ধরা হয়েছিল। তিনিও ছাড়া পেয়ে যান। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। সে রায়ও বাতিল হয়ে যায় হাইকোর্টে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাঁদের রায়ের উপসংহারে বলেন–'In the circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt...'

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট লক্ষ্য করুন– 'Circumstances showing that Abdul Khaleque was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind and Judgement of the prosecution witnesses because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the Liberation. Be that as it may. This impression was responsible for influencing the inductive reasonings of the witness.'

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলাম চোখের সামনে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো সেখানে কি ইমপ্রেসন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল? বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের কাছে দোয়া মাংতে গিয়েছিলেন। আরো লক্ষ্যণীয়, সবচেয়ে বড় আলবদর গোলাম আজমের নাগরিকত্ব মামলায় দু'জন বিচারক গোলাম আজমের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। খুব সম্ভব ১৯৭১ সাল তারা দেখেননি। বা দেখলেও এর মর্ম বোঝেননি। আইন মানুষ তৈরি করে এটা বোধহয় তাদের জানা ছিল না, সে জন্য একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আযমকে নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছে। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লংঘিত হয়েছে তা কারো মনে হয়নি। আমরা এগুলি মেনে নিয়েছি

কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করতে চাই–বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) ছিলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ, পৃথিবীতে সামরিক আইন জংলি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না-মেনে ইংরেজিতে রায় লিখেছেন। পরিবর্তীকালে, বিচারপতি খায়রুল হক একমাত্র এইসব যুক্তির বিপক্ষে ন্যাচারাল জাস্টিসের সূত্র ধরে রায় দিয়েছিলেন।

আলবদরদের বিচারের প্রচেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধের সময়, রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন যে শুধু পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তা নয়, তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সফল যুদ্ধ শেষে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধশেষে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ এনেছে; অনেকে শাস্তির ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এসব অভিঘাত সৃষ্টি করলো আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি। সরকার অবশ্য চেয়েছে পাকিস্তানী দালালদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি, সরকার ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২।' এ আইনে, শাস্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল, শুধু তাই নয়, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল এর যথাযথ প্রয়োগ। ২৮ মার্চ সারাদেশে দালাল বিচারের জন্য গঠন করা হলো ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু, এ আইনে একটি ফাঁক ছিল। ৭ম ধারায় বলা হয়েছিল 'থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা হবে না।'

১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই অধ্যাদেশ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৩৭,৪৭১ জনকে। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল ২,৮৪৮ জনের। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র ৭৫২ জন। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

এ সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে যা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে, তা যদি ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাঁদের চিন্তা করতে হতো। এখন বাঙালি জাতিকে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেখ মুজিব ও তাঁর সরকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

তিনি বা তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কি যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে তাও তাঁরা অনুধাবন করেননি। করলে তাঁদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার–'আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।' অন্যদিকে এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য, যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে, 'সেই সময় প্রায় চার লক্ষ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেক কান্নাকাটি করেছেন। এই রকম একটা অবস্থায় সেই সব বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clemenmcy (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল।... (মুক্তিযুদ্ধে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধ অপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।'

এ বিষয়গুলোই বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকা ওল্টালে প্রায় প্রতিদিন চোখে পড়বে দালাল আলবদরদের গ্রেফতারের এবং তাদের বিচারের খবর। দেখা যাবে বিচারে অনেককে কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছে।

সরকারিভাবে ২৫.১২.১৯৭১ সালে জানানো হয়, [প্রতিবেদন অনুযায়ী] ২৫ মার্চের পর নির্দোষ মানুষের উপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দায়ীদের বিচার করা হবে। ১৯৭২ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ৪১ হাজার দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ১৬ হাজারের বিরুদ্ধে, মুক্তি পেয়েছে ৫০০০ জন এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে। এখানে মনে রাখা দরকার সে বিপর্যস্ত সময়ে, যেখানে ছিল বিচারক ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার অভাব, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা ও ১৬ হাজারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা সামান্য বিষয় নয়।

অপরাধীদের যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়, সে জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সে সময়ের নামকরা তরুণ ও প্রবীণ আইনজীবীদের বিচারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন না বর্তমান সরকার পারেনি। চিফ প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছিলেন সবিতারঞ্জন পাল [এস আর পাল নামে খ্যাত] ও সিরাজুল হক। তাদের সহায়তা করার জন্য ছিলেন আমিনুল হক, মাহমুদুল ইসলাম, ইসমাইল উদ্দিন সরকার ও আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। এঁরা পরবর্তীকালে অ্যার্টনি জেনারেল ও বিচারক হয়েছিলেন। পুলিশের ডিআইজি নুরুল ইসলাম ছিলেন চিফ ইনভেস্টিগেটর।

বর্তমান যুদ্ধাপরাধ বিচারের আদি কাঠামো এটিকেই বলা যেতে পারে। একদিকে যখন আলবদর ও রাজাকারদের বিচার চলছে তখন অনেকে এই বিচার বন্ধ করার দাবি তোলেন বিশেষ করে বামপন্থি রাজনীতিবিদরা যা এখন অনেকেই মনে করতে চান না। মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'দালাল আইন বাতিল না করিলে আন্দোলন করিব।' [*দৈ. বাংলা,* ৫.১২.১৯৭২] অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ জানান 'দালাল আইনের' 'অপ্রয়োগ' বন্ধ করতে হবে। [*ঐ.* ২.১.১৯৭৩] অলি আহমদ 'দালাল আইনে অভিযুক্তদের ক্ষমা করার জন্য আহ্বান জানান।' [৫.২.১৯৭৩]। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যারা আটক আছেন তাদের ফেরৎ আনার জন্য তাদের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যরা ধর্না দিতে থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে দ্বিতীয়বার ১৯৭৩ সালের ১৬ মে দালাল আইন সংশোধন করা হয়। যারা বলেন, বঙ্গবন্ধু আলবদর ও খুনীদের ক্ষমা করেছেন তারা যে কত বড় নির্জলা মিথ্যা বলেন তার প্রমাণ দ্বিতীয় সংশোধনী। ১৯৭৩ সালের ১৬ মে বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ-এর ৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'অত্র আদেশে বর্ণিত অনুকম্পা ব্যক্তিদের প্রতি এবং অপরাধসমূহের প্রতি প্রযোজ্য হবে না, যা এই অনুচ্ছেদের ৯টি দফায় উল্লেখ করা হয়। সেগুলোর কয়েকটি–

"ঙ. আলবদর বা আল শামস সংগঠনের সদস্য হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজা প্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বলিয়া কথিত।

চ. রাজাকার কমান্ডার হইয়া দখলদার বাহিনীর সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা কথিত।

জ. দখলি আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কর্মকর্তা হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

ঝ. মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও সংগঠন দমন যা পার্থিব সুবিধা আদায়ের মানসে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজা প্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।'

এ ছাড়াও বলা হয়েছিল, 'অবশ্য মুক্তির শর্ত হইতেছে যে, তাহারা উপরোক্ত আদেশের বাহিরে বিচারযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অন্য কোনো অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।'

[দেখুন, বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : কুযুক্তি বনাম সুযুক্তি, *৭৩ এর আইনের সহজ পাঠ* এবং '৭১ এর গণহত্যা', *মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার : দেশে বিদেশে প্রশ্ন* : নির্মূল কমিটি, ২০১০]

মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ও ভবিষ্যতে তাদের উত্থান রোধে বঙ্গবন্ধু সরকার যে সব আইন করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্তসার দেয়া যেতে পারে–

১. ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল আইন জারি করা হয় যা পরিচিত P.O. No. VIII of 1972.

২. ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি স্ব স্ব জেলা কোর্টে অধ্যাপক গোলাম আযম গংদের হাজির হওয়ার নির্দেশ।

৩. ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন জারী বা পরিচিত P.O. No. 149 of 1972.

৪. ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোলাম আযম গংদের নাগরিকত্ব বাতিল।

৫. ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা রহিত।

৬. ৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার বাতিল।

[*জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনার ভাষণ*, ১৬.৪ ১৯৯২]

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ বা অলি আহাদ মুক্তিযুদ্ধ দেখেছিলেন, আলবদর ও অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধীদের নৃশংসতা দেখেছেন বা তার কথা শুনেছেন। প্রথমোক্ত দু'জন মুজিব নগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যও ছিলেন। অথচ তাঁরা আলবদর আলশামস রাজাকারদের বিচারের বিরোধিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সাল দেখেননি। মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এর বীভৎসতা নির্দয়তা সম্পর্কে সম্যক অবহিতও ছিলেন না। কিন্তু, অপরাধীদের বিচারে সর্বতোভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। দালাল আইন শুধু নয় তিনি আরেকটি আইনও করেছিলেন।

ওয়ালিউর রহমান লিখেছেন, '১৯৭২ সালের ৩ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরকার প্রধান পর্যায়ে সিমলা চুক্তি হওয়ার পরই বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন যে, যুদ্ধাপরাধীরা হয়ত আইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া দালাল আইনে ৭১ এর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ বিচারের কতগুলো বাস্তব সমস্যা ছিল।' এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও আইনমন্ত্রী কামাল হোসেনকে নির্দেশ দেন যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য সময়োপযোগী একটি আইনের খসড়া করতে। তাঁদের তিনি বলেছিলেন–'পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের সহায়ক শক্তি যারা পাকিস্তানী আর্মিকে সহযোগিতা করেছিল, তাদের প্রত্যেককেই বিচারের আওতায় আনতে হবে।'

এ জন্য একটি কমিটি করা হয় যার প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন, বিচারপতি এফ কে এম এ মুনএম এ [পরবর্তীকালে প্রধান বিচারপতি], ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ [অ্যার্টনি জেনারেল], ব্যারিস্টার সৈয়দ

ইশতিয়াক আহমেদ, আইনমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নাসিমউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার হারুনুর রশীদ, অ্যাডভোকেট মাহমুদুল ইসলাম [পরবর্তীকালে অ্যাটর্নি জেনারেল] ও জেনেভা মিশন প্রধান ওয়ালিউর রহমান [পরবর্তীকালে সরকারের সচিব]। কলকাতা থেকে দু'জন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারও এসেছিলেন সহায়তার জন্য। তাঁরা হলেন সুব্রত রায় চৌধুরী ও দীপংকর ঘোষ। নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন দু'জন প্রখ্যাত আইনজ্ঞের সাহায্যও কমিটি নিয়েছিল। তাঁরা হলেন অধ্যাপক জেসচেক ও অধ্যাপক অটো ভন ট্রিফটারার। [দেখুন, ওয়ালিউর রহমান, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', *পূর্বোক্ত*]

এভাবে ১৯৭৩ সালের ১৯নং আইনটি প্রণীত হয়। 'উক্ত আইনটি 'গণহত্যা জনিত অপরাধ', 'মানবতা বিরোধী অপরাধ' বা 'যুদ্ধাপরাধ' এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষাবাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধাপরাধীকে আটক, ফৌজদারী আইনে সোপর্দ, কিংবা দণ্ডদান করার অভিপ্রায় আইন সভা কর্তৃক প্রণীত হয়, যা স্থানীয়ভাবে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন' ১৯৭৩ [International Crimes (Tribunals) Act, 1973] নামে অভিহিত। এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অর্থাৎ মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না। [দেখুন, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, '৭৩-এর আইন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার; *পূর্বোক্ত*]

১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই এই আইনটি পাশ হয় এবং সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত হয়। এ কারণে, পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়া আইনটি বাতিল করতে পারেননি। বা হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ এর আগে বন্দুকের সাহায্যে তিনি সব তছনছ করে দিয়েছিলেন। এই আইন ১৯৭১ সালের অপরাধীদের আরো ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট ভাবে বিচার করতে পারেননি। কিন্তু ঐ আইনটি অগোচরে সুরক্ষিত হয়।

আলবদররা ফিরে এল
শহীদ পরিবার-রা বিচার পেলেন না

অনেকদিন আগে একটি মন্তব্য করেছিলাম, এ অধ্যায়ের শুরুতে পুনর্বার সেই মন্তব্যটি করছি–মুক্তিযুদ্ধ করাটা হয়ত সহজ ছিল, অন্তিমে মুক্তিযোদ্ধা থাকাটা সহজ ছিল না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ একসময় বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ও ক্ষমতা দখলকারি প্রেসিডেন্ট লে. জে. জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ও তার অনুসারী সামরিক কর্মকর্তাদের পরবর্তীকালে আচরণ দেখে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, তাদের অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বা মেজর খালেদ মোশাররফরা আগে থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাতেও সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে বাধা পেয়ে বলেছিলেন 'আই রিভোল্ট।'

জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের সঙ্গে আলবদরদের একটি সম্পর্ক আছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর, আমরা দেখেছি আলবদররা পালাচ্ছে। আলবদরদের বৃহৎ অংশ মিশে গেল সাধারণ মানুষের ভিড়ে। যারা পরিচিত তারা চলে গেলেন পাকিস্তানে। আলবদররা ছিল সংঘবদ্ধ, শত্রুদের শায়েস্তা করার বিষয়ে তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোভাব ছিল সংঘবদ্ধ, তাদের ওপর কমান্ড থাকলেও তা ছিল শিথিল আর শত্রুদের নিয়ে কী করা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আলবদরদের আশ্রয় দিয়েছেন অনেকে, টাকার বিনিময়ে ছাড়াও পেয়েছে অনেকে। অনেককে গ্রেফতারে শৈথিল্য দেখান হয়েছে। দালাল আইনে কিছু আলবদর ধরা পড়লেও বৃহৎ সংখ্যক ধরা পড়েনি। এরা চুপচাপ বসে ছিল না। এরা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ ও সংহত করছিল। পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা আলবদর নেতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। জামায়াতের নেতা গোলাম আজম লন্ডন থেকে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান, সৌদী আরব ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী অনেক দেশ তাদের সহায়তা করছিল ফলে তারাও একটি শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

এই ধারণার কারণ, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জিয়াউর রহমান যে কাজগুলি করেছিলেন তা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদররাও একই কাজ করছিল। শুধু তাই নয়, যে সব হীন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে আলবদরদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল মৃত্যুদণ্ড। দন্ডতো নয়ই তাদের বরং করা হয় পুরস্কৃত।

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন প্রথম। বাংলাদেশে সংবিধানের ওপর প্রথম হামলাকারী তিনি, দ্বিতীয় লে. জে. এরশাদ। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করেছিলেন তারা। আলবদররা যেমন খুনের রাজনীতি করেছে এরাও তেমন খুনের রাজনীতি করেছেন।

জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে জামায়াত ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলেন, বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর প্রথম স্টেটসম্যান যিনি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরোধিতা করে ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজাকার বন্ধু জিয়া দালাল আইনেও যারা দণ্ড ভোগ করছিলেন তাদের সসম্মানে মুক্তি দিলেন। অনেক আলবদর ছাড়া পেল। নেতৃস্থানীয় আলবদররা পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা শুরু করল। গোলাম আজম ফিরে এল। আলবদররা জামায়াতে ইসলাম নাম ঠিক রেখে শুধু ছাত্র সংঘের নাম বদল করে ছাত্র শিবির করল। জিয়াউর রহমানের এইসব সংশোধনী আলবদর রাজাকারদের এত খুশি করেছিল যে, 'বামপন্থী' নেতা কাজী জাফর আহমেদ যিনি পরে জিয়ার দলে এবং আরো পরে এরশাদের দলে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সময় সিভিল সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'মওলানা সিদ্দিক [স্বাধীনতা বিরোধী} বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন তার সুযোগ সরকারই করে দিয়েছেন। সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিলের ফলেই এরা রাজনীতিতে আসতে পেরেছে।.... এরা জাতি ও গণস্বার্থ বিরোধী.... সংবিধানের ৩৮ ধারা বাতিল করে এ সকল জাতীয় দুশমনকে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের উচিত হয়নি।' [*দৈনিক সংবাদ*, ৪.১১.১৯৭৬]

আলবদররা ১৯৭১ সালে খুনের পর খুন করেছিল। জিয়াউর রহমান তাদের অপরাধ শুধু মাফ করা নয় তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিলেন। এতদিন যে সব আলবদর ঘাপটি মেরে বসেছিল তারা প্রকাশ্যে বেরিয়ে জামায়াতকে সংঘটিত করতে লাগল। ছাত্র শিবির বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে স্বাধীনতাপক্ষের ছাত্রদের রগ কাটতে লাগল। রাষ্ট্রে জামায়াতের রাজনীতি 'রগকাটা রাজনীতি' হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল। জিয়া রাজাকার আলবদরদের সচিব, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করলেন।

সামরিক শাসন জারি করে লে. জে. জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর করা যে সব আইন বাতিল করে আলবদরদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো হলো–

১. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর Ordinance No 63 of 1975-এর মাধ্যমে 'দালাল আইন' বাতিল করা।

২. ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর second proclamation order No. 3 of 1975 প্রথম তফসিল থেকে দালাল আইনের যে সুরক্ষা দেয়া হয়েছিল তা বাতিল।

৩. ১৯৭৬ সালে second proclamation order No 3 of 1976-এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি পুনঃ প্রবর্তনের জন্য ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি রহিত করণ।

৪. ১৯৭৭ সালে Proclamation order No 1 of 1977 জারি করে সংসদে আলবদরদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ রহিত করণ।

৫. ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের আবেদনের অনুরোধ।

৬. ১৯৭৭ সালে Proclamation order No I of 1977 দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ রহিত করণ।

এক কথায় জেনারেল জিয়াই আলবদর রাজাকারদের শুধু ক্ষমা নয়, ঘরের ভিতর আশ্রয় দিয়েছিলেন।

একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের খুনের 'দায়মুক্তি' দেয়া হলো এবং তাদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকুরি দেয়া হলো। সুতরাং, বলা যেতে পারে, জিয়ার নীতিতে ধারাবাহিকতা আছে। বঙ্গবন্ধু খুনীদের শাস্তি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। আলবদর বন্ধু জিয়া খুনীদের দণ্ড মওকুফ করে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। এভাবে আলবদরদের রাজাকারদের ক্ষমা করে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশকে বিভক্ত করেছেন জিয়াউর রহমান। আলবদরদের মতো তিনিও বাংলাদেশকে পাকিস্তান করতে চেয়েছিলেন। আলবদররা তার ক্ষমতার উৎস ছিল। আলবদররা তাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল দেখে তিনি আলবদরদের এভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন।

একইভাবে অপারেশন সার্চলাইটে অংশগ্রহণকারী লে. জে. হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষেত্রে জিয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া আলবদর রাজাকারদের ক্ষমতায় এনেছেন এবং ১৯৭১ সালের আলবদর প্রধান ও উপপ্রধানকে মন্ত্রী করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এভাবে নতুন শতকের শুরুতে দেখি, আলবদররা আবার ক্ষমতায়।

প্রচলিত আইনে, খুনীকে হেফাজত করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জিয়াউর রহমান, হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া খুনীদের হেফাজত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। শহীদদের পরিবারদের ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন এই তিনজন ও তাদের সমর্থকরা। মুক্তিযুদ্ধের, শহীদদের, বাংলাদেশের কেউ যদি অবমাননা করে থাকেন তাহলে তারা হলেন জিয়া, এরশাদ ও খালেদা। তাদের বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। অস্ত্রবাজ এই তিনজন একটি

জাতির, এবং সে জাতির গৌরবময় ইতিহাসের যে অবমাননা করেছেন তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

অনেক আগে লিখেছিলাম, একবার যে রাজাকার সে সব সময় রাজাকার। তেমনিভাবে বলা যায় একবার যে আলবদর সে সব সময় আলবদর। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আলবদরদের বিরুদ্ধে গণ আদালত করার কারণে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া দেশদ্রোহের মামলা। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার জন্য আক্রমণ, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য বারবার চেষ্টা এবং সবশেষে গুলিস্তানে গ্রেনেড হামলা, দশট্রাক অস্ত্র পাচার ইত্যাদি হলো আলবদর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বেগম জিয়া এভাবে ১৯৭১ সালের মতো অস্ত্রধারী একটি মিলিশিয়া বাহিনী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা ১৯৭১ সালের মতো সেনাবাহিনী ও পুলিশের কমান্ডে থাকবে কিন্তু জামায়াত ও বিএনপির কমান্ডে কাজ করবে।

১৯৭১ সালে যে আলবদরদের প্রতিরোধ করা হয়েছিল ও তাদের রাজনীতির মৃত্যু ঘটান হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সাহায্যে জেনারেল জিয়া ও এরশাদ, সেনাবাহিনীর পরোক্ষ সাহায্যে বেগম খালেদা জিয়া একইভাবে সেই আলবদর রাজনীতি ও আলবদরদের ফিরিয়ে আনলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের চালিকা শক্তি ছিল জনবিরোধী সেনাবাহিনী। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকাও ছিল এক। কিন্তু, পাকিস্তান ফেরত আসবে? আলবদরদের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেই কি তা করা যাবে? এ শতকের মূল প্রশ্ন এগুলোই।

অবশেষে আবারও বিচার

জেনারেল জিয়া-এরশাদ খালেদার আলবদর রাজাকার পুনর্বাসন ও বাংলাদেশের পাকিস্তানীকরণের প্রকল্প যে বাংলাদেশের জনগণ মেনে নিয়েছিল তা নয়। জেনারেলদের পক্ষে ছিলেন আলবদর-রাজাকার-স্বাধীনতাবিরোধী-পাকিস্তানীমনা আওয়ামী লীগ বিরোধী কক্ষে পাওয়া নতুন রাজনীতিবিদ, পচে যাওয়া বাম ধারার লোকজন। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ, মৃদু বাম ও বাম ধারার মানুষজন। পাকিস্তান আমলে, ১৯৪৮ থেকে পাকিস্তানীরা পাকিস্তানে এক নম্বর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল আওয়ামী লীগকে। বাংলাদেশেও এক নম্বর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নেতারা ভুলে গেছেন যে সেনাপ্রতিনিধি, আপারেশর সার্চলাইটে অংশগ্রহণকারী আলবদর ও পাকিস্তানের মনোভঙ্গির প্রতিনিধি, ধর্ম ব্যবসায়ী, নারী অবমাননাকারী স্বৈরাচারী লে. জে. এরশাদ বন্দুকের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে বলেছিলেন–'We will stay in power for about two years and then hand over power to a political party but obviously not to Awami League and Awami League will destroy the Armed Forces.'

লে. জে. জিয়ার আলবদর নীতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু সামরিক বাহিনীর সাহায্যে যেহেতু তিনি শাসন করছিলেন সেহেতু কেউ কিছু বলার সাহস করছিলেন না। কিন্তু ক্ষোভ বাড়ছিল। তবে, আলবদরদের বিচারের দাবি কেউ করতে পারছিলেন না কারণ আলবদররা তখন ক্ষমতায়। এতে অনেকে ছিলেন ভীত, কারণ ১৯৭১ সালের স্মৃতি তখনও অমলিন।

এরশাদ আমলের শেষের দিকে ১৯৮৬ সালে কর্ণেল নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক আহমদ শরীফ ও আরো অনেকের উদ্যোগে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র। এই কেন্দ্র প্রথম যে উদ্যোগটি নেয়, তা হলো একাত্তরের ঘাতক

বিশেষ করে আলবদর [দেখুন পরিশিষ্ট] ও দালালদের পরিচয় তুলে ধরা এবং ১৯৭১ সালে তারা কী করেছিল তা বাংলার মানুষকে মনে করিয়ে দেয়া। ঘাতকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেল, সুপরিকল্পিতভাবে তারা যেসব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলেছে। তাদের কুকীর্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ *দৈনিক সংগ্রাম*। কিন্তু দেখা গেল বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত তারও পাতা কর্তন করা হয়েছে। তবুও বেশ কিছু তরুণের সাহায্যে প্রণীত হলো '*একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়*' এই বই সংকলনে শাহরিয়ার কবিরের ভূমিকা ছিল মুখ্য। আমার মনে আছে শাহরিয়ার, আমি, প্রয়াত শিল্পী কাজী হাসান হাবিব ও কাজী মুকুল একটি প্রকাশনা করেছিলাম, নাম-ডানা প্রকাশনী। এর পক্ষ থেকে ২১ বই মেলায় বাংলা একাডেমীতে একটি স্টল নিয়েছিলাম। ১৯৮৭ সালে বিকাল থেকে স্টলের সামনে ভিড়। কখন আসবে বই? সন্ধ্যার ঠিক আগে বই এল। নিমিষে শেষ। এই বইটি নতুনভাবে মানুষকে জাগিয়ে তুলল। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হলো 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'।

সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির ও জাহানারা ইমামের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। প্রথম সভায় আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। পরে সবার সম্মতি নিয়ে ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। নির্মূল কমিটির বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশের পরিচিত বিশিষ্টজনরা সবাই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন যেমন–সুফিয়া কামাল, কলিম শরাফী, শামসুর রাহমান, আহমদ শরীফ, শওকত ওসমান, নীলিমা ইব্রাহিম, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, কে নয়? অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি।

নির্মূল কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার। আমরা তখন থেকে অনুধাবন করেছিলাম বিচার হতে হলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন জরুরি। সে জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ৭২টি সংগঠন নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। জাহানারা ইমাম হন আহ্বায়ক। সংক্ষেপে এই কমিটি 'সমন্বয় কমিটি' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। নির্মূল কমিটি তখন আর আলাদাভাবে কাজ করেনি। সমন্বয় কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক, জাসদের প্রয়াত কাজী আরেফ আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির নূরুল ইসলাম নাহিদ, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চের' পক্ষে আহাদ চৌধুরী ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নির্মূল কমিটির পক্ষে সৈয়দ হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবির। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৭২ সালের দু'দশক পর ফের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনমত কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল।

নির্মূল সমন্বয় কমিটির বড় অবদান ঘাতকদের বিরুদ্ধে দুটি গণতদন্ত কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রকাশ এবং ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালতের বিচার। এ ধরনের উদ্যোগ এ দেশে প্রথম। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করেছিল। এই মামলা নিয়েই জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালে পরলোক গমন করেন। আর বিএনপি নিজেকে যুক্ত করেছিল পাকিস্তানমনা দল হিসেবে।

জাহানারা ইমামের আকস্মিক মৃত্যুর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে খানিকটা ভাটা পড়ে। সমন্বয় কমিটির কর্মোদ্যোগ শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। তখন নতুন করে এ পরিপ্রেক্ষিতে শাহরিয়ার কবির ও কাজী মুকুলের উদ্যোগে নির্মূল কমিটির কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। শামসুর রাহমান দীর্ঘদিন এর সভাপতি ছিলেন। আমরাও অনেকে কমিটিতে ছিলাম এবং আছি। তবে শাহরিয়ার ও মুকুল এখনও নির্মূল কমিটির প্রাণশক্তি। দু'জন দু'জনের পরিপূরকও। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর অবদানের কথাও মনে রাখার মতো।

আমাদের মনে আছে আমরা যখন আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তখন ছিল আলবদরদের যুগ। অনেকেই আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনেকে চাঁদা দিতে চায়নি, দেখা করতে চায়নি। এদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকরাও আছেন। ক্রমে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির দাবির সঙ্গে সাংস্কৃতিক জোট, মহিলা পরিষদ, উদীচী অনেকেই এগিয়ে আসে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আস্তে আস্তে জনমত গড়ে উঠতে থাকে ঘাতকদের বিচারের দাবিতে। তত্ত্বাবধায়ক সামরিক সরকারের সময় গঠিত হয় সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম। আলবদর রাজাকার বা অন্যকথায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বেগবান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম এতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে একটি অত্যাশ্চার্য ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ ও তার জোটভুক্ত দলসমূহ নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করে, ক্ষমতায় গেলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা অবশ্য সবসময়ই এই বিচারের কথা বলেছিলেন। তাই ১৯৯৬ সালে তিনি ক্ষমতায় আসার পর অনেকে মনে করেছিলেন, বিচার হবে। কিন্তু হয়নি। ২০০৭-০৮ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর এই ঘোষণা আলোড়িত করে নতুন প্রজন্মকে। এমনকী আলবদরদের এক সময়ের পৃষ্ঠপোষক লে. জেনারেল এরশাদও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেন। তাতে বোঝা যায় এ দাবি জনদাবি হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আলবদররাও তাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলি এককাট্টা হয়ে নির্বাচনে নামে এবং বিপুলভাবে পরাজিত হয়।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও কেউ কল্পনা করেনি, আসলে ঠিক ঠিকই যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে। আলবদররাও ভাবেনি কারণ তাদের আর্থিক সামাজিক শক্তি

অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু যাবতীয় জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেখ হাসিনা ২০১০ সালে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে যে আইন করে গিয়েছিলেন সেই আইন অনুযায়ীই বিচার শুরু হয়। গ্রেফতার হয় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ, বিএনপিতে যোগ দেয়া পূর্বতন আলবদরের নেতারা। আলবদরদের সুপ্রিমো গোলাম আজম, নাজিম এ আলা মতিউর রহমান নিজামী, নাজিম মুজাহিদ, কুখ্যাত আলবদর নেতা কামারুজ্জামান, মীর কাসেম আলী ও কাদের মোল্লা প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়েছে ও বিচার চলছে। আলবদরদের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করেছে এমন কয়েকজন যেমন সাকাচৌধুরী, আবদুল আলীম বা সাঈদীরও বিচার চলছে। দক্ষিণ এশিয়া এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। শেখ হাসিনা অন্তত এই একটি কারণে ইতিহাসে থাকবেন।

আগেই বলেছি, আলবদররা অত্যন্ত সুসংগঠিত। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বানচাল করার জন্য তারা তাদের অর্থ ভাণ্ডার নিয়ে নেমেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। মীর কাসিম আলী এ বিচার বানচালের জন্য ২৫ লাখ ডলার খরচ করেছেন [পরিশিষ্ট]। ১৯৭২ সালের মতোই সরকার এখন এক্ষেত্রে উদাসীন। তারা অপপ্রচার রোধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী প্রশ্নও তোলা হয়নি মীর কাসেমকে, ২৫ লাখ ডলার যে লবিস্টকে দিলেন তা তা কীভাবে দিলেন? বিচারিক অবকাঠামো দুর্বল। তাতেও তারা সহায়তা করতে নারাজ। ভাবটা এই, ট্রাইবুনাল চেয়েছিলেন দিয়েছি। জনগণ আর কী চায়? বাকি সব আল্লাহর ইচ্ছা।

১৯৭১ সালে আল্লাহকে বারবার ডেকেও আলবদরদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি। এটি ব্লাসফেমি নয়। আল্লাহ বলেছেন, নিজেকে নিজে সাহায্য না করলে কীভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে? যেমন, এবার এ সময়ে যদি বিচার না হয় বা বিচারে প্রসিকিউশনের দুর্বলতার জন্য যদি তারা মুক্তি পায়। তা'হলে ভোটযুদ্ধে আওয়ামী লীগের পরাজয় অনিবার্য। ১৯৭১ সালে থেকে তাদের হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে যুক্তি ছিল, তারা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে, এটাই তাদের রাজনীতি। আওয়ামী লীগ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। সেটি তাদের রাজনীতি। সুতরাং, রাজনৈতিক কারণে তাদের বিচার হতে পারে না। এখন পর্যন্ত এই থিসিসই বারবার তুলে ধরছে এবং ঘোষণা করছে, এটি যুদ্ধাপরাধের বিচার নয়। এটি রাজনৈতিক বিচার। নতুন প্রজন্মে যারা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা এই জিনিস বিশ্বাস করবে। তা'হলে ১৯৪৮ সাল থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে রাজনীতির বিকাশ হয়েছিল তার মৃত্যু ঘটবে।

এখানে দুঃখের কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ, আমাদের দুঃখ রাখার জায়গা নেই। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আমরা বাম ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছি এবং করছি। এবং এ পক্ষকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। তারা দু'বার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু এক্ষেত্রে সামগ্রিক কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।

আলবদরদের কথা ধরা যাক। ১৯৭১ সালে প্রতিপক্ষ ও প্রতিপক্ষের রাজনীতি বিনাশের জন্য তারা কার্যকর পরিকল্পনা নিয়েছে। পরাজয়ের পরও দমেনি। নতুন মিত্রের সন্ধান তারা পেয়েছে সেনাবাহিনীর ভেতর। এ মন্তব্যের কারণ, এই যে জিয়াউর রহমান যখন আলবদরদের পক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করেন তখন সেনা বাহিনীর কেউ-ই প্রতিবাদ করেননি। এমন কী খুনীদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াননি। এটি বাস্তব সত্য।

আলবদররা এই মিত্রের সাহায্যে বিকশিত হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে। সমাজ অর্থনীতিতে তারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা ইতিহাসকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছে হাতিয়ার হিসেবে। আমরা ভুলে যাই, মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম দু'ভাবে পরিচালিত হয়েছে। এক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরনো মিত্রদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছে। দুই, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য বিনষ্ট করেছে। যেমন, তারা জিয়াউর রহমান জাদুঘর করেছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর করেনি। বিএনপিকে তারা নতুন ফ্রন্ট হিসেবে তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে জাতীয় পার্টিকে, ধর্ম ব্যবসায়ী অন্যান্য দলকে মিত্র রূপে গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে জঙ্গি মৌলবাদের তারা বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় দিয়ে, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। একই সঙ্গে সেক্যুলার সমর্থককে শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে দমন করতে চেয়েছে। এই ধারার প্রতীক হিসেবে শেখ হাসিনাকে তারা বারবার হত্যা করতে চেয়েছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এর উদাহরণ।

জঙ্গি মৌলবাদ তাদের আরেকটি ফ্রন্ট যা আন্তর্জাতিক মিত্রদের দ্বারা নির্মিত। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষের প্রচারণা শক্তি অসম্ভব। তাদের কর্মিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিটেড এবং বিরোধী পক্ষকে তারা কোনো ছাড় দেয় না। একটি জেনারেশনের ভাবনার জগতে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং তা প্রসারের জন্য স্বাধীন আর্থিক ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক বঙ্গবন্ধু। তাই প্রথমে তারা তাঁকে হত্যা করেছে এবং সপরিবারে। আওয়ামী লীগের একাংশ, বাম ধারার একাংশকে তারা মিত্র হিসেবে পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে গেছে। এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ বিশেষ করে যারা শহরে ছিল তারা সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। এ সম্পদ রক্ষার কারণে, কমিটমেন্ট রক্ষা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ধারার মানুষজন সার্বিকভাবে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে না। খণ্ড খণ্ড এডহক কার্যক্রম গ্রহণ করে মাত্র। সরকার গঠন করলে এরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আমি দু'য়েকটি উদাহরণ দিই। ভাবনার জগতে আধিপত্য বিস্তারে এদের কোনো কার্যক্রম নেই। সর্বপর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য করার যে আবেদন আমরা করেছি ১৯৯৬ সালের ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল সমস্ত অনৈতিহাসিক স্থাপনা থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মুক্ত করতে। পূর্তমন্ত্রী সেক্ষেত্রে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেননি। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ এবং ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপনা শেষ করতে পারেনি। এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। জঙ্গি দমনে সরকার আন্তরিক কিন্তু তা বিকাশ করার জন্য যে ভাবনার জগতে আধিপত্য বিস্তার করা দরকার সে বিষয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।

আরেকটি উদাহরণ দিই। মাদ্রাসার দু'টি ডিগ্রিকে প্রচলিত স্কুল কলেজের ডিগ্রির সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে যদিও দু'টি আকাশ পাতাল তফাৎ। আমাদের ভর্তি ব্যবস্থায় ৬০% নম্বর রাখা হয়েছে ঐ দু'টি ডিগ্রির ফলের ওপর। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্রদের ৯০-৯৫ ভাগের কম নাম্বার দেয় না। এবং যেহেতু তারা মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী সেহেতু টিক চিহ্ন প্রশ্নে তারা নাম্বার বেশি পায়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি অনুষদে এখন মাদ্রাসার ছাত্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন প্রশাসনের ক্যাডারেও। এ ব্যবস্থা বদলাবার কোনো চিন্তাভাবনা এ সরকার করেনি। শুধু তাই নয় আলবদরদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মোদারেসীনের দাবি অনুযায়ী কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিকাংশ ছাত্র প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ধারণা হল এতে তাদের সমর্থন বাড়বে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আওয়ামী লীগকে ঘোষণা করতে হবে, পাকিস্তানের সঙ্গে তারা মিলে যাবে, তা'হলে হয়ত ভোট পেতেও পারে কিন্তু তাদের কখনও বিশ্বাস করা হবে না। ধর্মভীরুতাকে চুয়িংগামের মতো টেনে মৌলবাদ দৃঢ় করার ক্ষেত্রে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব।

হাইকোর্টের নির্দেশে জনাব শাহাবুদ্দিন সংখ্যালঘু অত্যাচারের যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, সরকার সে ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেয়া দূরে থাকুক, রিপোর্টটিও প্রকাশিত হয়নি। এমন কী ১/১১ তে যারা যুক্ত ছিল [বা এর বিরুদ্ধে নিশ্চুপ ছিল] তাদের প্রশাসনে রেখেছে, মন্ত্রীসভায়ও। এ নিয়ে আলোচনা তুললে আলোচনাকারীকে সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিরোধী বিএনপির পক্ষের লোক বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এভাবে, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য যারা ছিলেন শেখ হাসিনার সমর্থক। তারা সরে যাচ্ছেন। আলবদরদের মতো এ পক্ষের কমিটমেন্ট তেমন দৃঢ় নয়। সে কারণেই দেখা যায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের স্টাফের সংখ্যা কুড়ির বেশি। অথচ, মানবতা বিরোধী অপরাধে দু'টি ট্রাইবুনালে ১৩ জন স্টাফ নিয়োগ মন্ত্রীরা মনে

করছেন মাত্রাতিরিক্ত। এ নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছে তাদের বলা হচ্ছে, এ সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। এই ধারণাহীনরা ৪০ বছর এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আমি ফিরিস্তি আর বাড়াব না। আমি একটি বিষয় বুঝতে অক্ষম, ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতাবানদের চেহারাটা, এজেন্ডা বদলে যায় কেন?

সরকারকে সবশেষে আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলি মন্ত্রীদের অবিমিষ্যকারিতার জন্য যদি যথাসময়ে বিচার না হয় এবং এ কারণে যদি আওয়ামী লীগ পরাজয় বরণ করে তাহলে বুদ্ধিজীবীদের পেশাদারদের [যারা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশ্বাসী] নির্মূল করে দেবে। তাদের যুক্তি খুব পরিষ্কার। আগে খুন তারপর দেখা যাক কী হয়। ১৯৭১ সালে আলবদরদের হাতে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারাতো ফিরে আসেননি। আলবদররা শুধু বেঁচে রইল না ফিরেও এল। এখন মাত্র কয়েকজনের বিচার হচ্ছে। মাঝারি পর্যায়ের আলবদরদের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি। মাঠ পর্যায়ে যারা আছে তাদের কথা-বাদ-ই দিলাম। এইসব আলবদররা এখন অস্ত্র বানাচ্ছে। আমাদের যে কোনো একটি ভুলের জন্য অপেক্ষা করছে মাত্র।

লে. জে. জিয়াউর রহমান, লে. জে. হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া শহীদদের যে অবমাননা করেছিলেন এবং এখনও করছেন। শেখ হাসিনা শহীদদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আলবদররা এখন ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। আমরা যদি আবারও ভুল করি তা হলে ১৯৭১ সালে আলবদরদের হাতে শহীদ হওয়া মানুষজনের মতো অবস্থা হবে আমাদের।

আলবদরের মন

দু'টি কেস স্টাডি

আলবদর বন্ধু জিয়াউর রহমানের শাসনামলে রাজাকার-আলবদরদের মনে শান্তি ফিরে আসে। তারা সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। অনেকে নিজেদের রাজনীতির সমর্থনে বইও লিখে ফেলেন। এদের লেখা বই ভিত্তি করে দুখণ্ডে আমি একটি বই লিখেছিলাম–নাম–'রাজাকারের মন' [মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০]। সেই বইয়ে দুইজন আলবদরের বই সম্পর্কেও লিখেছিলাম। বর্তমান গ্রন্থ সংকলনের সময় মনে হলো এই দুইজনের আত্মজীবনী আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে [যা আগে লিখেছিলাম] এখানে সংযোজন করা উচিত। এতে শুধু বইটি সম্পূর্ণতাভাবে তা-ই নয়, আলবদরের মন কীভাবে কাজ করে তাও বোঝা যাবে।

যে দুজন আলবদরের কেসস্টাডি এখানে সংযোজন করছি তারা হলেন খালেক মজুমদার ও কে এস আমিনুল হক। তাদের বইয়ের বিবরণ–

১. এ. কে. এম. এ. খালেক মজুমদার, *শিকল পরা দিনগুলো*, ১ম ও ২য় খণ্ড [প্রকাশক : সাজ্জাদ খালেদ মুরাদ], ঢাকা, ১৯৮৫
২. কে. এস. আমিনুল হক, *আমি আলবদর বলছি* [প্রকাশক : লেখক নিজে], কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৮

১.

খালেক মজুমদার কে? মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে জামায়াতের ঢাকার দফতর সম্পাদক খালেক মজুমদারকে মুক্তিবাহিনী বন্দী করেছিল। নিম্ন আদালতে খালেক দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে উচ্চ আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেয়। আদালতের রায়ে মুক্তি পেলেও খালেক মজুমদার সমাজের রায়ে মুক্তি পাননি। এখনও শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যার প্রসঙ্গ এলে তার নাম চলে আসে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় রিপোর্ট'-এ তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কারাগার থেকে খালাস পাবার পর খালেক মজুমদার দুখণ্ডে প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনী 'শিকল পরা দিনগুলো'। এ আত্মকাহিনী অন্য রকম। এখানে শুধু বর্ণিত হয়েছে তার গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু। অর্থাৎ যে সময়টুকুতে তিনি ছিলেন বন্দী। তার বলার ধরণটাও আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো।

বইয়ের নাম শিকল পরা দিনগুলো। প্রথমেই তিনি পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চান যে, তাকে আটকে রাখা হয়েছিল এবং তা ছিল দুঃসহ। এই দুঃসহ সময়টুকুর কথাই তিনি বলতে চান এবং সেই সময়টুকু কখন? সেই সময়ের শুরু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। অর্থাৎ প্রাক ১৯৭১ ছিল না শিকল পরার দিন। এ দুঃসময়ের দিনে পরিবেশ কেমন ছিল? খালেকের ভাষায়, দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের তপ্ত পরিবেশ। জেলে তাকে কাজ দেয়া হয়েছিল রান্না ঘরে। তা রান্নাঘরে আগুন জ্বলবে না তো কি বরফে ঢাকা থাকবে? জেলার ছিলেন হিন্দু। তাই বার বার তার নাম উল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, জেলার হিন্দু দেখেই মুসলমান হিসেবে তাকে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের কাজ দিয়েছে। তা সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে কী কাজ দেয়া হবে? আর রান্নাঘরে বাকি যারা কাজ করত তাদের সবাইকেই কি একই কারণে (অর্থাৎ বিদ্বেষবশত) রান্নাঘরে কাজ করতে দিয়েছিল? খালেক মজুমদার লিখেছেন, আল্লাহ পাক সেখানে তাকে একটা স্থান বানিয়ে দিলেন। কৌশলে মজুমদার আল্লাহকেও নিয়ে এলেন এখানে। বইয়ের দুটো কথার খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে পাঠক বুঝতে পারেন আমি কী বলতে চাচ্ছি–"শিকল পরা দিনগুলো আমার কারার দুস্থ জীবনের ছোট একটা কাহিনী। লিখতেও হয়েছে বইটি সশ্রম কারাদণ্ডের দণ্ড ভোগের ফাঁকে ফাঁকে জেনারেল কিচেনের (জেলখানার ভাষায় চৌকা) দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের তপ্ত পরিবেশে। ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণার পরের দিন সকালে জেলার নির্মলেন্দু রায় সকল সুপারিশে আমার কাজ পার্স্য করলেন জেনারেল কিচেনে জেলের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের জায়গা ওটা। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক সেখানে একটা স্থান বানিয়ে দিলেন আমার জন্য। সকলেই যেন সুদৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। মর্যাদার চোখে দেখতে লাগলো জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে।..."

আসলে প্রথম থেকেই খালেক পাঠকের মনে নিজের প্রতি একটা সহানুভূতি সৃষ্টি করে নিতে চান। পাঠকের হয়ত খেয়াল থাকে না, এ প্রশ্ন করার যে, প্রাক ১৯৭১ কি শিকল পরা দিন ছিল না? প্রাক ১৯৭১ ছিল কি স্বাধীন মানুষের আনন্দঘন দিন? অসচেতন মনে যদি এ কথাগুলো গেঁথে যায় তা হলে পাঠক বইটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিচার করবেন।

২.

খালেক মজুমদারের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'গ্রেফতার', দ্বিতীয়টির 'গ্রেফতারের পটভূমি'। প্রথমে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টি আলোচনা করব। প্রথমটি নয়। মজুমদার লিখেছেন, " '৭৩ এর ৩০ ডিসেম্বরের 'অনুকম্পা' ঘোষণার পর এখানে থাকতে হবে

তা ভাবিনি। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে যখন অনুকম্পার পর কোন কোন ধারার স্থগিত আদেশ (stay order) এলো তখন আমাদের মতো কতিপয় হতভাগ্য মানুষের জিন্দান;খানা হতে আর মুক্ত হতে পারলো না।"

এখানে শব্দের ব্যবহারগুলো দেখুন 'ন্যায়নীতি' বিসর্জন', 'হতভাগ্য মানুষ', 'জিন্দানখানা' প্রভৃতি। এ ক'টি লাইন পড়লে অনেকের মনে হতে পারে প্রতিহিংসাবশত রাজাকারদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের অবতারণা করছি। এক, বলা হয়ে থাকে শেখ মুজিব সবাইকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। মজুমদারের মতো রাজাকারের ভাষ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ঐ প্রচারণা ঠিক নয়। ছোট রাজাকারদের ছাড়া হয়েছিল। বড় রাজাকারদের বা যারা গর্হিত কোন অপরাধ বা কোন খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের নয়। এদের মুক্তি দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। দুই, খালেকের উপস্থাপনা। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে আর তাদের আটকে রাখা হলো কই? হলো না বরং আদালতের রায়ে তিনি (বা তারা) খালস পেলেন। সেটাই কি হয়ে গেল ন্যায় নীতি বিসর্জন? আর হতভাগ্য তো খালেক মুজমদাররা নয়, এ দেশে হতভাগ্য হলেন শহীদুল্লাহ কায়সাররা।

ঢাকার পতন আসন্ন। এ কথা রাজাকাররা জানলেও বিশ্বাস করতে পারেনি। "কিন্তু হায়! সব ধারণার মূল ছিন্ন করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে যখন ১৬ ডিসেম্বর তাদের আত্মগ্লানির ঘোষণা শোনা গেল তখন সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়!" রাজাকারদের কাহিনীগুলো পড়ে মনে হচ্ছে শুধু আদর্শগত কারণেই যে তারা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ছিল, ধর্ষণ ও খুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা নয়, এরা স্বপ্নেও ভাবেনি, পাকিস্তানী বাহিনী ভারত বা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খাবে। নাজি জার্মানিতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। সে কারণে রাজাকাররা বা পাকিস্তানীরা এখনও ১৯৭১-এর পরাজয়ের কথা ভুলতে পারে না, যে কারণে আত্মগৌরব উদ্ধারের জন্য তারা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

পাকিস্তানের পতন যে আসন্ন এ খবর তাকে দেন তার এক শ্রদ্ধেয় নেতা। নেতা জামায়াতের ঢাকা অফিসে এলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খালেককে বলেন, "আপনি বাসায়ই থাকুন। আপনার তো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। মাঠে তো আপনার কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না।" এ লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ খালেক মজুমদার ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা ১৯৭১ বিষয়ে এ সূক্ষ্ম তফাতটি সবসময় করতে চেয়েছে এবং ব্যবহার করেছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। তারা যা বলতে চেয়েছে তা হলো যদি কোন হত্যা বা অত্যাচার হয়েই থাকে তা হলে তা করেছে তারা, যারা ছিল মাঠ পর্যায়ে। খালেক তো ছিলেন দফতর সম্পাদক। ফলে এর কোন দায়-দায়িত্ব তার নেই। যেমন নেই গোলাম আযম বা নিজামীর। নূরেমবার্গ বিচারের সময় এ ধরনের যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্তরা, যা গ্রাহ্য হয়নি। আরেকটি যুক্তি এ পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ার চেষ্টা করে তারা যে, ১৯৭১ সালে জামায়াত আদর্শের জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, খুন কি আদর্শের অন্তর্গত– সে উত্তর খালেক মজুমদার দেননি।

সেদিন খালেক মজুমদারের অফিস থেকে বেরুতে কষ্ট হচ্ছিল। অফিসে "নিখিল বিশ্বের মুসলিম জাতির পথ নির্দেশক" সব বই ছেড়ে যেতে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। কারণ, কি বুঝতে তাদের বিবেকহীন মানুষেরা। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সমর্থকরা বিবেকহীন। আর ভণ্ডামি দেখুন, পালাবার সময় তার পরিবার পরিজন বা অন্য কিছু নিয়ে সে চিন্তিত নয়। সে চিন্তিত মুসলিম মনীষীদের বই নিয়ে!

সেদিন মজুমদার বাসায় কাটালেন। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, "আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিদায় নিল সৌভাগ্যের শুকতারা।" সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্যটি সঠিক। তবে, সৌভাগ্যের শুকতারার জন্য তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র চার বছর পর জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, পরে সামরিক শাসক হিসেবে মজুমদারকে সৌভাগ্যের শুকতারা এনে দিয়েছিলেন। তবুও দেখা যাক, একজন রাজাকারের কেমন লেগেছিল সে সময় যার বর্ণনা আছে মজুমদারের বইয়ে। "আগামীকালই নাকি রেসকোর্সে স্বাক্ষরিত হবে জাতির ভাগ্যাকাশের নতুন সনদ। গুলি-গোলার শব্দ, তাও থেকে থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রাতের আঁধার বেড়ে যাবার সাথে সাথে কোলাহল বন্ধ হলেও ওই বিকট শব্দের কোন বিরাম নেই। কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ওই পাষাণ ও অসহ্য শব্দে। প্রতিটি শব্দই যেন বুকে এসে বিঁধছে।"

এশার নামাজের সময় তার মোনাজাতের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এর মধ্যে একটি লাইন গুরুত্বপূর্ণ। "খোদাদ্রোহীদের ওপর আমাদেরকে বিজয় বকশিশ কর।" অর্থাৎ বাঙালি বা মুক্তিযোদ্ধারা খোদাদ্রোহী। এই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গির এখনও পরিবর্তন হয়নি। মাইনোরিটি পাঞ্জাবীরাও মনে করত বাঙালিরা (জামায়াতসহ) হিন্দু।

শেষ রাতে আলবদর খালেক পালালেন বাসা থেকে। বাসা ছেড়ে যাবার সময় মায়া লাগছিল। স্ত্রী-সন্তানদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরের কাছে। এ কাজটি করতে কিন্তু কোন ভুল হয়নি। লিখেছেন, "আমার সংসার ও দাম্পত্য জীবনে ঐ সময়টাই ছিল সবচেয়ে বেশি সুখের। তখন কে জানতো হিংস্র দানবের নিষ্ঠুর থাবা ঝড়ের বেগে আসছে আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে। ভাসিয়ে দিতে আসছে উত্তাল তরঙ্গ সুখের গড়া আমার সোনার সংসার।" এখন কেউ এ ক'টি লাইন পড়লে মনে নিশ্চয় সহানুভূতি জাগবে। কিন্তু এ বাক্য ক'টি পড়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৭১ সালে কত কোটি মানুষের সুখের সংসার নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই রাজাকাররা। এখানেও শব্দের ব্যবহার দেখুন। হিংস্র দানবের নিষ্ঠুর থাবা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের।

রেসকোর্সে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন খালেক। সেখান থেকে চলে যান মালিবাগে তার এক আত্মীয়ের বাসায়। ঘটনাটি খালেক উল্লেখ করেছেন এখানে সাধারণভাবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কেন আমরা অন্তিমে পরাজিত হলাম রাজাকারদের হাতে তার কারণ এখানেই নিহিত।

মজুমদার যখন সেখানে, তখন আশ্রয়দাতার এক আত্মীয় এসে হাজির। "তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক একজন যুবক, তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলাম আমি। ভাগ্য ভাল ইতোমধ্যেই এসে পড়লেন তিনি। এখানে থাকা ঠিক হবে কিনা এখনই আঁচ করা যাবে। তখন একটি কামরায় কপাট বন্ধ অবস্থায় আছি। গৃহকর্ত্রী আত্মীয়ের চাপা স্বরের গুনগুন কথার শব্দ ভেসে আসল কানে। সন্তর্পণেই দরজার ফাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম তাদের কথা কাটাকাটির প্রতি। কিছুক্ষণ পর নমনীয়ভাবে প্রকাশ করল যুবতটি। সাথে সাথেই হাসি মুখে প্রবেশ করলো আমার রুমে। কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হলাম অনেকটা। খুঁজতে হবে না অন্য আশ্রয়। ধরতে হবে না ভিন্ন পথ।"

এরপরও আমরা দেখি– জেল, সিআইডি সবখানেই পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছে রাজাকাররা। বাঙালির সম্প্রদায়যুক্ততা এর কারণ এবং তা ক্ষতি করেছে মুক্তিযুদ্ধের, আদর্শ, বাঙালির। এ বিষয়টি আমরা তখন অনুধাবন করিনি। এখানে উল্লেখ্য, রাজাকাররা কিন্তু এ ধরনের কোন সমবেদনা দেখায়নি মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের প্রতি। এখানেই মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের মধ্যে পার্থক্য।

মালিবাগে এক সপ্তাহ ছিলেন মজুমদার। সকালে উঠে কাগজ পড়তেন। এ কাগজ পড়ে কি মনে হতো তার– "ভোরের বেলায় খবরের কাগজে নজর পড়লেই আঁতকে উঠলাম। কত নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তারা। এ সময় এ কাগজগুলো সরলপ্রাণ জনসাধারণের মন আমাদের উমেজকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে।

জীবনের বিনিময়ে বুকের তাজা রক্তের লোহিত প্রবাহ বইয়ে দিয়ে হলেও নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য, বিশ্ব উম্মতে মুসলিমার হেফাজতের জন্য, বিশাল সমুদ্রের ভয়াল তরঙ্গের মরণছোবল থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সাধ্য সাধনার মাধ্যমে যে সুপ্রতিষ্ঠিত বৃক্ষটিকে আমরা দৃঢ়মূলে দাঁড় করিয়েছিলাম, তা উপড়িয়ে ফেলার জন্য কাগজের পৃষ্ঠায় তাদের কি জঘন্য পাঁয়তারা! নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রই বুঝতে পারতো তাদের মনের হীন জিঘাংসার আসল রূপ। সাময়িকভাবে তাদের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তারা সফলতা লাভ করে থাকলেও দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারবে না এই অপচেষ্টার ফল। জনতার বিবেকের কঠোর আঘাতে মিথ্যার এ কারসাজি, কল্পনার এ রঙিন ফানুস ধ্বসে পড়বেই একদিন।

আমি পাঠকদের অনুরোধ করব আবারও সেই সময়কার পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রিত বিবরণসমূহ পড়ে দেখার জন্য। তা' হলেই বোঝা যাবে কীভাবে রাজাকাররা মিথ্যাচার করে। তবে মজুমদারের শেষ দুটি লাইন পড়ে তাকে দূরদর্শী মনে হতে পারে। আসলে অপচেষ্টা না। বাঙালি যদি সে বিবরণগুলো মনে রাখত এবং শহীদদের কথা স্মরণ করত, তাহলে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। নব প্রজন্মের একটা বড় অংশ এভাবে বিভ্রান্ত হতো না। সে কারণে বলি, ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর বিবরণ,

সংবাদপত্র, টিভিতে থাকুক। এতে অসহিষ্ণু হতে পারে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

২২ ডিসেম্বর খালেককে মালিবাগ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার মতে, ঐ দিন ছিল তার "ঐতিহাসিক নবজন্মের দিন"।

৩.

মুক্তিযোদ্ধারা তাকে গাড়িতে নিয়ে চললেন আর গাড়ি চলাকালীন খালেককে তারা নানা প্রশ্ন করছিলেন। তার ভাষায়, "উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম তাদের সব অবান্তর প্রশ্নের।" এখানে উল্লেখ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একজন তার হাতের ঘড়িটি খুলে নিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার মন্তব্য, "স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে গদগদ বন্ধুদের এ হলো চরিত্রের পরিচয়।" একজন মুক্তিযোদ্ধা তার ঘড়ি নিয়েছিল কিনা তা জানা যাবে না। খালেকদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সমষ্টিগত পরিচয় যদি এ হয় তা' হলে তাদেরও সমষ্টিগত পরিচয় হবে খুনী, লুটেরা ও ধর্ষক। এখানে একটি লাইন আছে যা বিভিন্ন আলঙ্কারিক বিবরণের মাঝে ঢাকা পড়ে যেতে পারে কিন্তু আমার কাছে তা' গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তার কাছে একটি রিভলবার পাওয়া গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন– "রিভলভারটি আমার লাইসেন্স করা। কিনে এনেছিলাম পঞ্চাশটি বুলেটসহ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাস কয়েক আগে।" অর্থাৎ মাঠকর্মী ও দফতর কর্মীদের মধ্যে খালেক প্রথমেই যে পার্থক্যটা টানতে চেয়েছিলেন আসলে তা ছিল না। জামায়াতের কর্মীদের সামগ্রিকভাবেই অস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেনা কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। এখানে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীও তাদের তা' দিয়ে থাকতে পারে। নিরীহ রাজনৈতিক কর্মীর ৫০টি গুলিসহ রিভলবার থাকে না। থাকলেও এত গুলি থাকে না। গাড়িতে যেতে যেতে নিজের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি এভাবে– "এটি আমারই পাড়া– যেখানে বাস করেছি বেশ কয়েক বছর। অপরিচয় থেকে পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্বে উপনীত হয়েছিল যেখানে– এটি সে জায়গা। কত বড়জনের কাছে পেয়েছি স্নেহ ও ছোটদের কাছে পেয়েছি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। বিপদের দিনে আজ ওর নেই কোন মূল্য।" এটা স্বাভাবিক। খালেক যেটি উল্লেখ করেননি তা' হলো, তাকে ভয় পাওয়ার কারণ, মহল্লায় তার পরিচয় ছিল ঘাতক হিসেবে। এখানে শ্রদ্ধা বা স্নেহের কোন সম্পর্ক নেই। মহল্লার লোক তাঁকে সত্যিকার শ্রদ্ধা বা স্নেহ করলে মহল্লা ছেড়ে তাকে পালাতে হতো না।

খালেক মজুমদারকে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেফতার করেছিল শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী ও হত্যাকারী হিসেবে। তাই গাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা এই প্রশ্নই করেছিলেন। কিন্তু খালেকের ভাষ্য–"শহীদুল্লাহ কায়সারের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ছবিতে প্রথমবারের মতো জীবনে তাঁকে দেখলাম।"

একই পাড়ায় থেকে, তখনকার ছোট্ট ঢাকায়, জামায়াতের দফতর সম্পাদক, খালেক মজুমদার দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে দেখেননি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এ যুক্তি অনেকেই বিশ্বাস করেছেন এমনকি হাই কোর্টের দুজন বিচারপতিও। খালেক নিজে জানিয়েছেন, ১৩ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত তিনি পত্রিকা পড়েছেন। তখন কি পত্রিকায় শহীদুল্লাহ কায়সারের ছবি বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ ছাপা হয়নি?

খালেক মজুমদার সবসময় শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণের কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, তিনি তাঁকে চেনেন না। এর বিপরীতে গণআদালতের ভাষ্য ও শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী, পান্না কায়সারের ভাষ্য দেখা যাক।

গণআদালতের ভাষ্য অনুযায়ী "শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিচয় পেয়েই একজন 'মিল গিয়া' বলে উল্লাস ধ্বনি করে তাঁর চুলের মুঠি চেপে ধরে।... ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে শাহানা বেগম একজন আততায়ীর মুখোশ টান দিয়ে খুলে ফেলেন। উজ্জ্বল আলোতে সবাই তাঁকে চিনে ফেলেন। পরে আদালতে খালেক মজুমদারকে সনাক্তকরণের সময় তাঁরা পৃথকভাবে জানান, এই ব্যক্তিই ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা রাতে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করতে গিয়েছিলেন।"

"খালেক মজুমদার তখন একই এলাকার ৪নং আগামসী লেনে থাকতেন। কায়েতটুলী মসজিদের তৎকালীন ইমাম আশ্রাফ উল্লাহ যিনি বর্তমানে বনানী গোরস্থানে কাজ করেন তিনি জানান, ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর '৭১ সালে বিকালে খালেক মজুমদার তাঁর কাছে শহীদুল্লাহ কায়সার কখন বাসায় থাকেন ইত্যাদি জানতে চান। আশ্রাফ উল্লাহ উত্তরে জানি না বলেন। তখন তিনি নিজেও জানতেন না খালেক মজুমদার শহীদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য খুঁজছে। সে দিন সন্ধ্যা রাতে আশ্রাফ উল্লাহ মসজিদের দোতলায় জানালা দিয়ে দেখতে পান শহীদুল্লাহ কায়সার রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট আঁকড়ে ধরে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছেন, আর কয়েকজন লোক তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল।"

পান্না কায়সার লিখেছেন– "সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনার পর ঠিক হলো ১৩ ডিসেম্বর শহীদুল্লাহ বাসা ছেড়ে চলে যাবেন। চলেও গিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে এসেছিলেন ঘন্টাখানেক পর।" রাতে খাবারের পর পান্না যখন ঘরে এলেন তখন দেখলেন, "এক টুকরা কাগজে গভীর মনোযোগ সহকারে কী যেন লিখছে। 'কী লিখছ'– বলে আমি ওর পাশেই বসলাম।

'কাল ত আমি চলে যাব। আমি না থাকলে তুমি কী করবে তোমার জন্য লিখে রাখছিলাম।' শুনে আমার প্রচণ্ড রাগ হলো! কাগজটাতে কী লিখা ছিল দেখতে ইচ্ছা করল না। কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললাম।

শহীদুল্লাহ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার আরও রাগ হলো।

'তুমি কি সাত সমুদ্দুর যাচ্ছ! যাচ্ছ ত ঢাকা শহরেরই কোন একটা জায়গায়। ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

: ধর আমি চলে গেলে যদি ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়– সে জন্য কিছু জরুরি কথা লিখেছিলাম– দিলে তো ছিঁড়ে।

: মুখেই বল না।

: কারও উপর নির্ভর করে চলবে না, মনে বিশ্বাস রাখবে আমি তোমার সঙ্গেই আছি।"

শহীদুল্লাহ কি জানতেন তাঁকে চিরতরে চলে যেতে হবে। কারণ পরদিনই আলবদর আক্রমণ করল কায়েতটুলীর সেই লাল বাড়িটি। শহীদুল্লাহ ভেবেছিলেন, বিজয়ী মুক্তিসেনারা বোধহয় এসেছে। দরজা খুলে দেয়া হলো। ঘরে ঢুকল কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আল-বদরদের একটি দল। লিখেছেন পান্না কায়সার–

"ঘরে ঢুকেই ওরা একবার চারদিক তাকাল। তখনও ঘরে ছিল শহীদুল্লাহ ও চাচা-আব্বা। আমি শমীকে কোলে তুলে দুধের শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বেজন্মা রাজাকাররা শহীদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনার নাম কী? 'আমার নাম শহীদুল্লাহ কায়সার।' ওর গলা দিয়ে যেন তখন আগুন ঝরছিল। শহীদুল্লাহ ওর নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ওর হাতটা ধরে টান দিয়ে বলল– চলুন আমাদের সঙ্গে। শুনেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। দুধের শিশিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে– শমী পড়ে গেল কোল থেকে।

সেদিন থেকে শমীর দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাদা দুধ দেখলেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠত।...

আমার চিৎকার শুনে বারান্দার ওপাশের ঘর থেকে ননদ শাহানা দৌড়ে এসে বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ইতোমধ্যে ওকে ওরা টানতে টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমিও এক হাত ধরে ওকে টেনে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ঘাতকরা বেয়নেটের নল দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। বেবী এসেও সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।...বেবীকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। বেবী পড়ে গেল ঠিকই কিন্তু একহাত দিয়ে ওর বড়দাকে তখনও ধরে রেখেছে। ওরা টানতে টানতে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার সময় শহীদুল্লাহ আরও জোরে বোনের হাতটা ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না, হাতটা ছুটে গেল।"

এ বর্ণনা যখন পড়ি এবং তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি সে সব হত্যাকারীর দল পুনর্বাসিত, শুধু তাই নয়, তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায়ও বসানোর আয়োজন চলছে তখন এই অবাস্তব দেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য ধিক্কার জন্মে।

ফিরে আসি পুরনো বিবরণে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন খালেককে আল-বদর বলে সম্বোধন করছিলেন তখন খালেক তা' অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, তিনি জামায়াতের নিছক একজন দফতর সম্পাদক, আল-বদর নন। খালেক এভাবে নিজেদের সামগ্রিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অথচ ছাত্র সংঘ প্রধান নিজামী ছিলেন সারা পাকিস্তান আল-বদর বাহিনীর প্রধান। এরপর আছে মুজমদারকে 'টর্চার'-এর বিবরণ। কিন্তু সেটি উপস্থাপিত হয়েছে কীভাবে? মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার হলো তাঁর ভাষায় 'সর্দার'। মুক্তিযোদ্ধারা কেমন? 'হিংস্র চেহারার'। তাদের কাজকর্মের প্রকৃতি কেমন?

"অস্পষ্ট স্বরে কী বলে সরে গেল সর্দারটি। এবার বিকট আকৃতির জল্লাদ প্রকৃতির জুলফিধারী দুটি লোক এগিয়ে এলো আমার দিকে। তাদের লম্বা লম্বা গোঁফ, মাথায় বেণী বাঁধার মতো লম্বা চুল, রক্তজবার মতো চোখ দেখলেই মন ভয়ে আঁতকে ওঠে। পেশীবহুল হাত উঠিয়ে থাবা ধরা হিংস্র বাঘের মতো দু'হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিল তারা। হাওয়াই শার্টটা খুলে ফেলে দিল দূরে। ঝাপটা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল উত্তর ভাগে রাখা একটি টেবিলের উপর। পূর্বদিকে মাথা পশ্চিমদিকে পা।... এবার দু'ধারে দু'জন করে দাঁড়িয়ে গেল হাতে রড ও লাঠি নিয়ে।" এ বিবরণের সাথেও একটি লাইন দেখুন 'পূর্বদিকে মাথা পশ্চিম দিকে পা।' অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামী রীতিনীতিতে বিশ্বাসী নয়। খালেক মজুমদারের বিবরণ সত্যি বলে ধরে নিলাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এত টর্চার-এর পর মজুমদার দিব্যি বেঁচে ছিলেন। আর খালেকরা কী করেছিলেন তার একটি বিবরণ দিচ্ছি।– "আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দু'টো মস্ত মানুষ। নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।"...

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা।... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।"...

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এ বিবরণ লিখেছিলেন হামিদা রহমান। পাঠক, আপনি কি উপর্যুক্ত বিবরণ দেখে অনুধাবন করতে পারছেন রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পার্থক্য? বুঝতে কি পারছেন রাজাকারের মন কী রকম?

৪.

নির্যাতনের সময়, উল্লেখ করেছেন খালেক মজুমদার, নিজ মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলামী বীরদের স্মরণ করেছেন। আমি এখানে নির্যাতনের সময় খালেকের একটি মনোলগের উদ্ধৃতি দিচ্ছি– "হে খোদা! অপরাধ যদি করেই থাকি তোমার কাছেই করেছি– তুমি ক্ষমা করো। মৃত্যুই যদি দাও– এই-ই শ্রেষ্ঠ, মৃত্যু। মরদে মোমেন যাঞ্চা করে নেয় এ মৃত্যুকে। আর যদি বাঁচিয়ে রাখো তা তোমারই অপার রহমত। কোন অপরাধ নেই আমাদের। তোমার আদর্শের জন্যে কাজ করেছি– তোমার আদর্শকে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে যারা ব্রতী তাদের দলে নাম দিয়েছি– এই যদি হয় অপরাধ, তাহলে তুমিই উত্তরম ফয়সালাকারী, তুমিই আহকামুল হাকেমীন। রোজ হাশরে কুল মাখলুকাতের সামনে তোমার ফায়সালা তাদের শুনিয়ে দিও। এদের কাছে করুণা চাই না-করুণা চাই-চাই রহমত শুধু

তোমারই কাছে। জালেমের কাছে ভদ্রজানোচিত বা সদ্ব্যবহারের আশা করি না। তুমি আমাকে একজন মুমিনের মৃত্যু দান কর। মুসলমানদেরকে জালেমদের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। যেমনি বাঁচিয়ে রেখেছিলে মুসা ও বনি ইসরাইলসহ বহু মুসলিম জাতিকে।"

এবার দেখুন– 'আদর্শ' শব্দটি। 'আল্লার আদর্শ' কী? হত্যা, ধর্ষণ, লুট?

নাউজিবিল্লাহ। জামায়াতে কর্মী ছাড়া এমন উক্তি কে করবে? 'জালেমের কাছে ভদ্রজনোচিত' ব্যবহার আশা করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছে 'জালেম', তারা নাকি "লা ইলাহার চিৎকার ধ্বনি বন্ধ করার জন্য নেকড়া গুঁজে দেয় মুখে।" বিশ্বাসযোগ্য কি এই সব মন্তব্য?

এর পর খালেক মজুমদারকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। মজুমদার কারাবাসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার মুনাজাতের দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এগুলি ভাল করে পড়লে রাজাকারের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। হত্যাকারী, লুণ্ঠন বা ধর্ষণকারী ছাড়া তাদের ভাষায় সবাই খোদাদ্রোহী। তারা নিজেরা কিন্তু মানুষ। তারা 'শাহাদাত' বরণ করতে চায় যাতে পরে শরাবন তহুরা পান করতে পারে। তাদের পক্ষের বিধবা, সন্তানহারাদের বিরহ বেদনার যেন উপশম হয়। একটি দীর্ঘ মুনাজাতের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম উদাহরণ হিসেবে–

"হে রাহমানুর রাহিম। জানি তুমি মাজলুমের দোয়া কবুল কর। আমি কি আজ মাজলুম নই? যদি মাজলুমিয়াতের সীমায় পড়ে থাকি আমার দোয়া কবুল কর। দ্বীনের অগ্রসেনানী আমার শ্রদ্ধেয় প্রাণতুল্য নেতৃবৃন্দের তুমি হেফাজত কর। দ্বীনের বীরসেনানী তোমার পথের জাননেছার মুসলিম ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র-বিশ্ব মুসলিম গৌরব আমাদের গর্ব, সব কর্মী ভাইকে জালেমের অত্যাচারী হস্তের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে সরিয়ে রাখো। স্বার্থের পূজারী, বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় ভাবাবেগে ভাসমান ভগতে এদের ত্যাগের কোন নজির নেই। বেশভূষা, সুখসজ্জা, আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস, বস্তুতান্ত্রিক জগতের জীবনোন্নয়নের শিক্ষার মোহ, মাতাপিতা, ভাইবোন, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মায়া কাটিয়ে তোমার রাহে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তোমার দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এরা তো কুত্রাপিও ইতস্তত করেনি। সকলকে তোমার নেগাহবানীতে নিয়ে যাও।"

"হে রাব্বুল আলামীন! আর এদের যেসব উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় জীবন তোমার দ্বীনের জন্যে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছে এদেশের সবুজ মাঠ ঘাট, রাজপথ– যাদের পবিত্র শোণিতে লোহিত হয়েছে এদেশের খাল-বিল, নদীজল, যারা অকুণ্ঠচিত্তে এ জগতের মায়া বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছে শাহাদাতের কঠিন পথ, তাদের এ রক্তরঞ্জিত প্রচেষ্টা তুমি গ্রহণ করো। এদের আত্মত্যাগের মহিমা এ দুনিয়ায় বিরল। তোমার পথে শাহাদতের জন্যে এদের রক্ত করে উঠত টগ্‌বগ্– এদের শোণিতে বইত শাহাদতের প্রাণবন্যা। মনে উঠত আত্মত্যাগের ঢেউ। তাদের তোমার কাছে স্থান দাও, তোমার নৈকট্য লাভের জন্যই তো তারা হয়ে উঠেছিল দামাল মাতাল

পাগলপারা। শাহাদাতের জাম তারা প্রাণভরে পান করেছে– তুমি এখন তোমার কাছে তাদের বসিয়ে শরাবন তহুরা পান করাও। তোমার শত্রুদের সাথে, খোদাদ্রোহীদের সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তারা খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার অপরূপ বাগিচার নির্মল সরোবরে তাদের রক্তে রঞ্জিত দেহ গোসল দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও। সংখ্যা স্বল্পতার পরওয়া তো তারা করেনি।"

৫.

পুলিশের হেফাজতে জেরার বিবরণ আছে মজুমদারের বইতে। এর মূল প্রতিপাদ্য হলো, পুলিশের বিভিন্ন শাখায় তাকে বার বার নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, জেরা করা হয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কারণ সে তো নির্দোষ। ষড়যন্ত্র করে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। মজুমদারের ভাষায় "মিথ্যার ব্যাসাতি (বেসাতি) ছড়িয়ে আজকার সংবাদপত্র আমার কুখ্যাতি বুকে লয়ে দেশবাসীর কাছে, সারা দুনিয়ার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। আর তার খেসারত দেবার জন্যে আমি আজ রওয়ানা হয়েছি এক দুর্গম পথে।"

মজুমদার কখনও স্বীকার করেননি যে, আল-বদরদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তার ভাষায়– "আলবদরের কথাটাই আমি স্বাধীনতার নিকটবর্তী সময় থেকে তারপর শুনেছি। এদের সংগঠনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। পার্টির পলিসি মেকিংয়ে আমার কোন অংশ ছিল না।"

যেসব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, আলবদরের প্রধান শক্তি ছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংঘের। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন কী করছে তা জামায়াতের দফতর সম্পাদক জানে না এ তো তাজ্জব ব্যাপার! আল-বদর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, পূর্ব পাকিস্তান প্রধান ছিলেন আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ঢাকা মহানগরীর আমীর মোহম্মদ ইউনুস ছিলেন শুরার সদস্য। আল-বদরদের প্রধান সংগঠক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহর কমিটির দফতর সম্পাদক আল-বদরদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না এটা নির্জলা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু খালেকের উপায় নেই। তিনি কীভাবে লিখবেন যে, তিনি বদর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? তা'হলে তো তার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রধান যুক্তিই নস্যাত হয়ে যায়।

মজুমদার বার বার উল্লেখ করেছেন যে, শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও তিনি ভেঙে পড়েননি কারণ তিনি বা তারা তো আল্লাহর পথে ছিলেন। তার ভাষায়–

"কালকের অমানুষিক অত্যাচারের পর আজ আবার এ নতুন অত্যাচার কি করে সহ্য করলাম তা ভাবলে আজও চোখ বন্ধ হয়ে আসে। মেরেই ফেলবে– মরেই যাব কাজেই প্রশান্ত মনে শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করতে লাগলাম। তাঁর স্মরণেই এত উৎপীড়নেও নিস্তেজ নিরুৎসাহ ও দুর্বল হয়ে পড়িনি। সেসময়ই মনে জাগতো অন্যায় তো আমরা কিছুই করিনি। করিনি আমরা কোন অপরাধ। আল্লাহর পথে

ছিলাম–তাঁরই জন্যে কাজ করেছি। আমরা তো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি, অন্যায় করিনি বরং অন্যায় রুখেছি। অপকার করিনি বরং উপকার করেছি। মানুষকে দুর্বিষহ অবস্থা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। আর্মি তো আমরা ডেকে আনিনি–এনেছে তারা। আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারা আসেনি বরং এসেছে তাদের সাথে আলাপ করে। সামরিক বাহিনীকে তারাই এ দেশের সরলপ্রাণ নিরীহ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে। আমরাই বরং সামরিক বাহিনীর বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছি। এই যদি আমাদের অপরাধ হয় তাহলে এ নির্যাতনই আমাদের প্রাপ্য। নতুবা তাদের বিচার খোদার হাতে। জালেমের এ জুলুম অবনত মস্তকে সহ্য করেই যাব। মানুষের ভুল ভাঙ্গবার পরই আমরা এর ফল পাবো। সে ভুল ভাঙ্গতে হয়ত বেশিদিন লাগবে না।"

এই আল্লাহর পথটি কী? সামরিক বাহিনী ডেকে এনেছে মুক্তিযোদ্ধারা বা বাঙালিরা আর জামায়াত কর্মীরা মানুষকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে 'বন্দুকের নলকে উপেক্ষা' করে। এত বড় জ্বলজ্যান্ত মিথ্যার উত্তর কীভাবে দেব?

১৯৭১ সালে খালেকরা সেনাবাহিনীকে কিভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং কীভাবে হত্যার প্ররোচনার যুগিয়েছিলেন তারই কিছু উদাহরণ দেব। নতুন প্রজন্মের এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে জানা দরকার–

১. ৫ আগস্ট ১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান নিজামী চট্টগ্রামে এক সভায় বলেন–'নিজামী পাক সেনাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের সকল অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী হামলার মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাহস ও [illegible] জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন।" [সংগ্রাম]
২. ৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে জামায়াতের মুখপত্র সংগ্রাম-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ–
"রংপুরের দরাজগঞ্জে ভারতীয় চরদের [মুক্তিযোদ্ধা] সাথে একটি সংঘর্ষে রেজাকাররা ৩ জন ভারতীয় চরকে হত্যা করে ২টি রাইফেল এবং ৩টি শটগান উদ্ধার করে। দুষ্কৃতকারীরা [মুক্তিযোদ্ধা] স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।"
৩. নুরুল আমীনকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া–"তিনি জানান যে, প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছেন।" দৈঃ পাকিস্তান, ৭-১১-৭১।
৪. চট্টগ্রামের আল-বদর বাহিনী সন্ধ্যায় চাকতাই-এ এক অভিযান চালিয়ে ৪০জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে" [অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের]। সংগ্রাম, ১১.১১.৭১
৫. 'জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন যে, পাকিস্তানী এছলামী ছাত্রসংঘ পৃথিবীতে হিন্দুস্থানের কোনো মানচিত্র স্বীকার করে না। এছলামী

ছাত্র সংঘ ও আলবদর বাহিনীর কাফেলা দিল্লীতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রসংঘের একটি কর্মীও বিশ্রাম গ্রহণ করিব না। প্রসঙ্গক্রমে মোহাম্মদ মুজাহিদ ঘোষণা করেন যে, এখন হইতে দেশের কোন পাঠাগার, গ্রন্থাগার, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী কোনো পুস্তক রাখা চলিবে না। কোনো স্থান, গ্রন্থাগার ও দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী পুস্তক দেখা গেলে তাহা ভস্মীভূত করা হইবে।" দৈনিক আজাদ, ৮.১১.৭১

৬. ১৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকা জামায়াতের নবনির্বাচিত মজলিসে শুরার উদ্বোধন করা হয়। সেখানে ঢাকা জামায়াতের প্রধান গোলাম সরওয়ার বক্তৃতা করেন। 'মজলিসের গৃহীত প্রস্তাবে রেজাকারদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র এবং দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করে রেজাকারদের সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান হয়।"

এসব সংবাদ ছাপা হতো, জামায়াতের মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ। অথচ ঢাকা জামায়াতের দফতর সম্পাদক খালেক মজুমদার এগুলোর কিছুই জানেন না।

পুলিশ যখন তাকে জেরা করছে তখন একদিন আইজি এলেন দেখতে। আইজি নাকি মজুমদারকে দেখে বলেছিলেন "His appearance indicates on his simplicity and sincerity". জনাব আবদুল খালেক তখন আইজি। তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন কিনা জানার জন্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। তখন এর সদুত্তর দেয়া যাবে। কিন্তু খালেক সাহেবকে যতদূর জানি একজন আল-বদর সম্পর্কে এমন অর্বাচীন মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জেলের মধ্যে নাকি তিনি একদিন কোরান শরীফ চেয়েছিলেন, পাননি। তাকে জানানো হয়েছে জেলের হুকুম ছাড়া তা সম্ভব নয়। এবং মন্তব্য করেছেন–"ভাবলাম, হায়রে মুসলমানের দেশ! মুসলিম দেশের একজন নাগরিক কোরান শরীফ গড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এখনই পবিত্র কালাম পড়াতো দূরের কথা পড়ার হুকুম চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ভবিষ্যতে এ দেশের মুসলমানদের ভাগ্যে কি লিখা আছে?" উল্লেখ্য, খালেক কিন্তু সবসময় এই ইঙ্গিত করেছেন দেশটা খাঁটি মুসলমানের নয়। আল্লাহ্‌র বান্দা হচ্ছে একমাত্র জামায়াতীরা। এই বাক্যগুলো লেখা হয়েছে যাতে ধর্মমনস্ক কোনো ব্যক্তি পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আল-বদরদের সঙ্গে তার বা জামায়াতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার যুক্ততার কথা বার বার অস্বীকার করলেও একবার তিনি স্বীকার করেছেন নিজের অজান্তে। এক টিভি প্রতিনিধি তার সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। তাদের সাক্ষাতকারের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি–

"টিভি প্রতিনিধি : এই কিলিংগুলো আপনারা কেন করলেন? এরা কি এদেশের লোক ছিল না? এদেশের জন্য কি আপনাদের মায়া নাই?

আমি : আমরা কোনো লোক মারি নাই।

প্রতি : তবে কে মারলো?

আমি : তা জানি না?

প্রতি : এবি (আলবদর) কে আপনারা টাকা পয়সা দিতেন না?

আমি : আমি জানি না।

প্রতি : সারেন্ডারের আগেও তো আপনারা এবিকে টাকা পয়সা দিয়েছেন।

আমি : আমি বলতে পারি না।

প্রতি : আপনি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন।

আমি : ঠিক কথা নয়। নিয়ে থাকলে ছাত্র সংঘের ছেলেরা নিয়েছে।

১৬ তারিখে কেউ কেউ কিছু টাকা নিয়েছিল।

ভাউচার ছিল অফিসে তাই আমি একথা বলতে বাধ্য হয়েছি।" আগেই উল্লেখ করেছি আল-বদরদের অধিকাংশ ছিল ছাত্র সংঘের সদস্য।

৬.

"বিচার প্রহসন'–এর পর খালেকের ঢাকায় তার কয়েদী জীবন শুরু হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েদী জীবন ও তার বিচারের নথিপত্রসহ দীর্ঘ বিবরণ আছে। ১৭.৭.৭২ তারিখে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ এফ. রহমান তাঁর রায়ে বলেন–"এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কলাবোরেটর। আমরা আরও দেখতে পাই যে ১৩/৭/৭১ আর্মি ইস্যুকৃত তার একটি রিভলবার লাইসেন্স ছিল।...এসব প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পাক সেনার একজন কলাবোরেটর।

উপরের বর্ণিত ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রমাণাদির দ্বারা আমার এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এ অভিযুক্ত আবদুল খালেক ও অন্যান্য দুষ্কৃতকারীরা মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য অথবা মারার জন্য খুব বিপজ্জনক জায়গায় ডিসপোজ করেছে। এবং আমি মনে করি এ দুটো পয়েন্ট (১-২) সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।" বিচারক খালেক মজুমদারকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। মজুমদারের ভাই হাইকোর্টে আপীল করেন। খালেক কারাবাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, তাকে মওলানা বলা হতো। নামাজ-কালাম জেনে তারাই ফিরিয়ে এনেছিলেন। তার এসব বিবরণে আমি যাব না। শুধু কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করব। কলেরা হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। "তখন বাজারে চালের দাম আগুন। সারাদেশের মানুষ আটা নির্ভর। আমার ইতিহাস ও শাস্তির কথা শুনে মহিলা নার্সটি সিপাহীটির সামনে বলে উঠলেন, "আপনি এখনো শুয়ে আছেন কেন? জানালাতো একেবারে খোলাই আছে। লাফ দিয়ে পড়ে চলে যান। অনাহূত এত কষ্ট করবেন। মাসীমার বদৌলতে দেশ স্বাধীন করে আজ খেতে পাই না। দু'এক পোয়া চালের ব্যবস্থা হলে বাচ্চাদের ভাত পাকিয়ে খাইয়ে দেই। নিজেরা খাই রুটি। আর যে দিন চালের ব্যবস্থা হয় না সেদিন বাচ্চাদের করুণ অবস্থা দেখলে

বুক ফেটে কান্না আসে। আমি হেসে বললাম, এতে আমার কোনো মন্তব্য নেই।... তবে আমরা কোন আইন অমান্য করি না। এ মিয়াসাব (জেলে সিপাহীকে মিয়াসাব বলে) যদি আমাকে নিয়ে যাবার সময় কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় আর আমি বেঁচে যাই তাহলে আমি পালাবার সুযোগ না নিয়ে জেল গেটে ফিরে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে সিপাহীর দুর্ঘটনার খবর দেবো ও নিজে আমার নিবাসস্থল কারাগারে ঢুকবো। আমার কথা শুনে মনে হলো নার্সটি আশ্চর্য হয়েছে।" নার্স কেন আমরাই থ মেরে যাচ্ছি। ১৯৭৩ সালে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে কমবেশি সবাই ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু, জেল সিপাহীর সামনে কোন নার্স কোন রাজাকারকে একথা বলবে তা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। পুরো বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে এটি প্রমাণের জন্য যে, স্বাধীন হয়ে বাঙালি সুখী হয়নি। অতএব খালেক মজুমদাররাই ঠিক। এবং চারদিকে চলছে বিশৃঙ্খলা কিন্তু সে সময়ও মজুমদাররা আইনের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল।

'ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বভাবজাত' শিরোনামে মজুমদার লিখেছেন, কীভাবে জেলের সবাই ধার্মিক হয়ে উঠেছিল। দাউদ হায়দার ও এনামুল হককে যখন ধর্মের অবমাননা করার জন্য জেলে আনা হলো তখন সমস্ত কয়েদীর রোষের সম্মুখীন হলো তারা। এ বিবরণ দেয়া কালে তিনি বাংলাদেশকে মুসলমানদের দেশ হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। মন্তব্য করেছেন–"তাই বলেছিলাম বাংলাদেশের মাটি ধর্মের জন্য; অধর্মের জন্য নয়। ধর্মের বীজ বপন এ দেশে যত সহজ অন্য মতবাদের বীজ তত সহজ নয়। বুদ্ধিজীবীদের মাথা ওয়াশ হলে এ দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য, আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপাগল করে তোলা দুরূহ কিছু নয়।" তা হলে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধিজীবীরাই সবকিছুর প্রতিবন্ধক। এবং এ কারণেই মজুমদাররা বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে দেশ বুদ্ধিজীবীশূন্য করে দিতে চেয়েছে।

২৯ ফেব্রুয়ারির (১৯৭৩) একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন খালেক। 'হাইজ্যাকার' কিছু পালাতে চাইলে জেলে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ গুলি চালায়। খালেকের ভাষ্য অনুযায়ী নিহত হয় নয়জন। এর মধ্যে জামায়াতী ছিল বোধহয় কয়েকজন। তার ভাষায়, 'বর্বরোচিত এই নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে শহীদ হয়েছেন এ পাষাণ কারার নয়টি নির্দোষ প্রাণ। শাহাদাতের লাল রক্তে রঞ্জিত করেছে তারা কারার শুষ্ক পথ। বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারার অপরাধে নির্দোষ জীবন নিয়ে কারায় আসার পরও এ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে তাদের স্থান হলো না।" এবং এর জন্য দায়ী কে? "শহীদ আনিস কি তখন জানতো মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কুটিলমনা রায়ের রাইফেলের নলে তার যমদূত এসে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।"

এর পর সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তার দীর্ঘ বক্তব্য আছে। দীর্ঘ সত্ত্বেও আমি তা উদ্ধৃত করছি। এতে পরিস্ফুট হবে রাজাকারের মন–"সারা দেশে যখন আলবদর-রেজাকারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে বিষোদগার ছড়াচ্ছিল এদেশের সংবাদপত্রসহ সব প্রচার যন্ত্রগুলো, ঠাঁই নেবার জন্যে যখন জেল ছাড়া এদের নেই এক

বিন্দু জায়গা বাইরের জগতে–আর জেলের ভিতরেও যারা জীবন্মৃত, টু শব্দটিও যাদের ছিল না কোথাও তারা নাকি জেল ভেঙ্গে পালাচ্ছিল। প্রকৃত সত্যকে আমূল বিকৃত করে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার তাদের কি অশুভ ও পঙ্কিল পাঁয়তারা। এ বিবেকহীনদের কি একটি বারও বিবেকের কাছে জবাবের জন্যে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি–হবে না কোন দিন?

একাত্তরে ষোলই ডিসেম্বরের পর শেষ পরিণতি হিসেবে জেলেকেই যখন ভাগ্যবরণ করে নিতে হলো তখন আমরা সব নির্যাতনকেই মেনে নিয়েছি, মেনে নিয়েছি সব অত্যাচারকে অতি সহজভাবেই। জাতির প্রকৃত কল্যাণের জন্য, খাঁটি, মহৎ, সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশের মঙ্গল জানানোর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছি তার মূল্য তার পুরস্কার একমাত্র খোদার নিকট প্রাপ্য। কিন্তু দেশ ও জাতির এটাই যে প্রকৃত সেবা, স্বার্থ সংরক্ষণের খাঁটি ও একমাত্র পথ–এতে ছিল না আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ। আর সন্দেহ ছিল না বলেই সংখ্যাস্বল্পতার পরোয়া না করেও এক অসম্ভব রকম ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করেছি। আর এ কারণেই এমন বিপর্যয়েও বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা অনুতাপ করিনি। আদর্শ ও ন্যায়ই ছিল আমাদের প্রবোধ। দেশ ও দেশবাসী একদিন মূল্যায়ন করবে এ সঠিক সত্যকে; তাই সব নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল আমাদের সান্ত্বনার একমাত্র খোরাক। প্রকৃত সত্যকে লুকিয়ে রেখে যে বক্তব্য দেশবাসীর কাছে তাদের স্বার্থেই রাখা দরকার ছিল তাতে তারা ভুল করেনি। তা যতই মিথ্যা, প্রবঞ্চনাময় ও স্বার্থেই হউক না কেন? পরিণতির প্রতি তাদের তাকানো প্রয়োজন ছিল না। এ ভাবেই তারা অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে বিভ্রান্ত করেছে সবাইকে। করেছে ভুল পথে পরিচালিত। জেলখানার ভেতরে সেদিনকার সংঘটিত ঘটনা সম্পূর্ণই বিকৃতরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া-সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধিদের মনোভাবের হীন পরিচায়ক।

ভুল ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জাতিকে অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত করে রাখার এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতির যদি ভুল সংশোধন নাও হয়, আমরা যদি চিরদিনই অবহেলিত হয়ে থাকি তবুও আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। সত্যকে আমরা সত্যই বলবো–আর মিথ্যাকে মিথ্যাই–তা যত অপ্রিয়ই হোক। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্যই ও পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না এক তিলও তা শত্রুরা যত শক্তিশালীই হউক। কারণ, আমাদের পথই সত্য ও সুন্দরের পথ। ঐ পথের পথিকরা দুঃখকষ্ট, বিপদআপদ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ত্যাগ তিতিক্ষা, অত্যাচার-অবিচার মাথা পেতে নেয় অতি সহজেই। একটি জাতিকে শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার এটিই হলো খাঁটি পথ–এ সত্য ও সুন্দর হলো আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস। এ পথকে ঢেকে রেখে রেখে আর কতদিন তারা একটি জাতিকে প্রবঞ্চিত করবে–দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে? আর কতদিন পঙ্কিলতার গভীর গহ্বরে ঢুকে থাকবে? এদের এ হীন কার্যক্রমের কোন হিসাব কি দিতে হবে না কোনদিন কারো কাছে?"

এই হচ্ছে রাজাকারের মন, রাজাকারের ধর্ম। তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। আর কেনই বা হবে? গত দু'দশক শাসকরাই তো তাদের সঙ্গে আঁতাত করতে এগিয়ে এসেছে। ১৯৭৬ সালে হাই কোর্টের রায়ে খালেক মজুমদার মুক্ত হয়ে যান। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাকে বেকসুর খালাস দেন। উল্লেখ্য, সন তখন ১৯৭৬। আরও উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী গিয়েছিলেন গোলাম আযমের কাছে দোয়া চাইতে।

খালেক মজুমদারের ভাষায়–"এ রায়ের দ্বারা আল্লাহ সত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলা হতে বেকসুর খালাস দেন।" মজুমদার এখন ধনী ব্যবসায়ী এবং যুক্ত জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে।

৭.

কেএম আমিনুল হকের *আমি আলবদর বলছি* নামক বইটি দেখে প্রথমে ব্যঙ্গাত্মক রচনা বলে মনে হয়েছিল। আমি এখনও জানি না, বইটি ঠিক ঠিকই কোন আলবদরের লেখা কিনা! তবে, বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার মনে হয়েছে ঘটনার বিবরণগুলো অতিরঞ্জিত এবং আলবদরীয় হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় মোটামুটি পরিচিত। অর্থাৎ সময়কাল, পাত্র-পাত্রী।

এই বইটির ধরণ আলাদা। এটির মূল উপজীব্য কারাগার কাহিনী। তবে পূর্বোক্ত বইগুলোর মতো এতে জটিলতা নেই। এখানে আমিনুল নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করেননি বরং সদম্ভে ঘোষণা করেছেন তিনি/তারা আল বদর। আলবদরীয় তত্ত্বেও তারা বিশ্বাসী। পাকিস্তানের পক্ষে তারা জোর লড়াই করেছিলেন। পূর্বোক্তরা শত পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন শুধু একটি কথা বলতেই যে, তারা নিরপরাধ; তাদের রাজাকার বলা হয়, কিন্তু তারা রাজাকার নন। আমিনুল কিন্তু প্রথমেই ঘোষণা করেছেন–"আমি আলবদর ছিলাম। একাত্তরের সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব। আমার বিবেকের সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম। কোন দল, কোন গোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে অথবা কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ কথা সত্য নয়। বন্দুকের নলের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি তাও নয়।"

আমিনুল জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তার বিবেকে একটা ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। প্রশ্নটা হলো–"যে হিন্দুস্থান তার নিজের দেশে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে মুসলমানদের নিধন করেছে, সেই ভারত কী স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের আট কোটি মুসলমানের জন্য দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল?"

রাজাকারদের কাছে জীবনে সমস্যা একটিই–"হিন্দুস্থান"। প্রথমেই হিন্দুস্থানকে দু'টি গালি তারপর অন্য কথা। যাক মেনে নিলাম, হিন্দুস্থানে ঐ সময় হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে [যা সত্য নয়], কিন্তু হিন্দুস্থান কি ১৯৬৯-৭১ সময়ে

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোন হস্তক্ষেপ করেছে? বা এমন কোন বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে যা প্রভাবান্বিত করেছে ঐ সময়কার গণআন্দোলন? রাজাকার ও হানাদারদের অত্যাচারের ফলে সবাই ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত কি তাদের আহ্বান জানিয়েছিল ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য? আশ্রয় পেয়ে তারপর বাংলাদেশের মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ করতে চেয়েছে। অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য চেয়েছে। ভারত দিয়েছে।

আমিনুল তারপর উল্লেখ করেছেন, 'মনে হলো এ দেশের ৮ কোটি মুসলমানকে [আট কোটি মুসলমান ছিল না সে সময়] দিল্লীর আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত করতে চায় আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সালে যদি দেশের ৯৯% লোক সমর্থন করে শেখ মুজিব ও তাঁর কর্মসূচীকে, তাহলে আওয়ামী লীগ কী করবে? আরও আছে। ৯৯% লোকই যদি পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে না চায় তাহলে নেতৃত্বের করার কী আছে? গণতন্ত্র মানলে এ কথা বলা যায় না। ফ্যাসীবাদী বিশ্বাসী হলে তা বলা যায়। আর আলবদর হতে হলে ফ্যাসিবাদে বিশ্বাস করতে হয় বা মনোভঙ্গি ঐ রকম হতে হয়।

মার্চ তো গেল, তারপর কী হলো? ১৬ ডিসেম্বর এল। "বিচ্ছিন্ন হলো দেশ। এক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির গণজোয়ারকে বালির বাঁধ দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। পারিনি। দেশের প্রত্যেকটি জনপদ, রাজপথ, গ্রাম আর গঞ্জে দেশপ্রেমিক মানুষগুলো লাঞ্ছিত রক্তাক্ত হলো। মীর মদনেরা নিক্ষিপ্ত হলো মীর জাফরের কারাগারে। আমিও কারা প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ হলাম। আমার ৪০ বছর কারাদণ্ড হলো। আমি দেখেছি বিচারক নিজেই ছিলেন আমার চেয়ে অসহায়।"

আমিনুল যেভাবেই লিখুন না কেন, এই বাক্যটির সঙ্গে আগে যাদের বইয়ের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে কোন অমিল নেই। রাজাকাররা দেশপ্রেমিক। ১৬ ডিসেম্বরের পর তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। বিচারকরা বাধ্য হয়ে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলি, রাজাকার-আল-বদরদের নির্মূল করা গেল কই? তার আগেই তো তাদের সেফ কাস্টডিতে নিয়ে গেল সেই হিন্দুস্থানী সৈন্যরা। তাদের জান বাঁচিয়ে দিল তাদের শত্রু হিন্দুস্থানী সৈন্যরা। জনপদ, রাজপথ রক্তাক্ত হলো কই? হলো না। কিন্তু রাজাকারদের মূল বিষয়ই হলো ঐ যে-সবকিছু রক্তাক্ত হয়ে গেল ১৬ ডিসেম্বরের পর। এর আগে, তেমন কিছুই হয়নি।

কারাগারে যাওয়ার ফলে আমিনুল বইটি লিখতে পেরেছেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কিশোরগঞ্জ থেকে ১৯৮৮ সালে। আগেই বলেছি, আমিনুলের কাহিনীতে তেমন কোনো জটিলতা নেই। গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। মুক্তিযোদ্ধারা 'অত্যাচার' করেছে তাদের মতো দেশপ্রেমিকদের ওপর, তারপর আছে কারাগারে অবস্থানের বর্ণনা। কিন্তু তার বিবরণে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো রাজাকারদের সমর্থনের ভিত্তি ও তাদের ঐক্য। অন্যদিকে তাদের বিরোধীদের সমর্থন ভিত্তির ফাটল ও অনৈক্য। আমিনুলের বর্ণনা একপেশে ও অতিরঞ্জিত ধরে নিলেও একথা প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য সব বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। অন্যদের মতোই যার উদাহরণ আমি উদ্ধৃত করব।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে আমিনুলের কাহিনী শুরু। এর আগে এ ভূখণ্ডে কী ঘটেছিল তার কোন বর্ণনা নেই। সেটি অবশ্য কোনো রাজাকারের বইতেই নেই।

১৭ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে আল-বদররা তার নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেন নেজামে ইসলাম পার্টির মওলানা আতাহার আলী, যিনি ছিলেন তার ভাষায়, "ঐ অঞ্চলের আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি আমাদের অনেকের আপোসহীন প্রেরণার উৎস।" অর্থাৎ রাজাকার। একজন রাজাকার আর যাই হোক আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারে না। রাজাকারিত্বে খানিক বিরতি দিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধেও যেতে পারে। গণতান্ত্রিক কোন দলেও হয়ত যোগ দিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরু? নৈব নৈব চঃ।

১৮ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতির "একটি খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ মাযহারুল হক এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর দান করি। আমাদের প্রতি ডাক্তার সাহেবের ছিল অন্তহীন সহানুভূতি।" শেষের বাক্যটি দেখুন। এ ধরনের বাক্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার বইতে। তিনি এ কথাই বলতে চান যে, আসলে তাদের আদর্শের প্রতি আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের একটি অংশের সমর্থন ছিল; কিন্তু ভয়ে তারা প্রকাশ্যে তাদেরকে সাহায্য করতে পারেনি।

আমিনুলের আত্মীয়স্বজন আত্মসমর্পণ না করে আমিনুলকে পালাতে বলেছিলেন। "জাতীয় বৃহৎ স্বার্থ ও ভবিষ্যত ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার" তারা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন। দুপুরে তাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর দেখা। "তারা সম্মানিত নেতা মওলানা আতাহার আলীর পায়ে ধরে সালাম করল। তাঁদের অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান।"

মুক্তিবাহিনীর কেউ সেই ডিসেম্বরে রাজাকার আতাহার আলীকে সালাম করেছিল কিনা জানি না, না করার সম্ভাবনাই বেশি। তবে, মতিউর রহমান করে থাকতে পারে কারণ পরবর্তীকালে পাকুন্দিয়ার ভণ্ডপীর হিসেবে সে পরিচিতি লাভ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজাকারের বীজ যার মধ্যে একবার রোপিত হয়, তার মনোজগতে তা ডালপালা মেলতেই থাকে। সে মুক্তিযুদ্ধ করলেও। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে তখন তার ধারাবাহিক সংগ্রাম বা চিন্তার ফসল নয় বরং ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

এ পর্যায়ে আমিনুল রাজাকারদের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের নিপীড়নের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা মিয়া ও বাদশাহ্ মিয়া নামে দুই রাজাকারের ওপর নাকি নিপীড়ন চালানো হয়। কীভাবে? তার ভাষায়, "উভয়েরই পুরুষাঙ্গ দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলিং ফ্যানের সাথে সংযোগ করে সেটা পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দেয়া হয়।" পাঠক! এবার কল্পনা করুন দৃশ্যটি। প্রথম পুরুষাঙ্গ কীভাবে ফ্যানের সঙ্গে বাঁধা সম্ভব? দুই. ধরে নিলাম বাঁধা হলো, কিন্তু শরীরের ভারে পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি থাকে না? এবং তার ওপর যদি ফ্যান ঘুরতে থাকে? ফ্যানটাসিরও একটা সীমা থাকা দরকার!

এর মধ্যে আমিনুল অর্থাৎ রাজাকাররা জানতে পারে যে, ন্যাপ নেতা আব্দুল বারী, “অষ্টগ্রামে জনসভা করে” জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে “উত্তেজিত” করছে। উত্তেজিত করার কী দরকার ছিল সেই ডিসেম্বরে? এই সময় আবার সেই ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আসেন দৃশ্যপটে। আমিনুলের ভাষায়–“ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আমার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সোচ্চার সে জামায়াত কি করে ইয়াহিয়ার নিপীড়নের সহযোগী হতে পারল! [লক্ষণীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন শব্দটি] তাঁর ঐ বক্তব্য থেকে আমার মনে হলো জামায়াতের অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর মতিউর রহমানের ধারণা স্বচ্ছ। অন্তত একটি ব্যক্তিকে আমি পেলাম। সীমাহীন রাজনৈতিক ধূম্রজালের মধ্যেও যার অন্তরে রয়েছে সচেতন বিবেকের ক্ষীণ স্পন্দন। আমি জানি, আজ নয় সময়ের আবর্তে একদিন বিবেকের এই ক্ষীণ স্পন্দনই বেগবান হয়ে উঠবে।” আমিনুলের বক্তব্য সত্য হলে এ বিষয়ে আমার পূর্বোক্ত মন্তব্য সঠিকই বলতে হবে।

আমিনুল যখন বন্দি তখন মুক্তিফৌজ তার থেকে ৫শ’ টাকা আর হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার মন্তব্য–“আন্দোলনের শুরু থেকে দিনে দিনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে যে লুট করার মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কোন জাদুর কাঠি নেই যা দিয়ে এ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অবাঙালিদের সম্পদ লুট করার মধ্য দিয়ে তারা গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মানুষের সম্পদ লুট করে। লুট করে অগণিত কুমারী মেয়ের ইজ্জত। পক্ষান্তরে আমরা বিশেষ করে আলবদরের কথা বলছি, সাধারণ কর্মীদের কড়া দৃষ্টির মধ্যে রাখতাম। কোন দুর্বলতা, কোন অভিযোগ কোন ভাবে এসে পড়লে তড়িঘড়ি এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো। এমনকি আমাদের চোখের সামনে কারও দ্বারা কোনো অঘটন ঘটলে তার প্রতিকার করেছি আমরা নিজেরাই।” বাস্তবে কিন্তু তার উল্টোটা ঘটেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যা ঘটেছে আমিনুল তাই উল্লেখ করেছেন তবে উল্টোভাবে। ঘটনাগুলো মুক্তিযোদ্ধারা ঘটায়নি, ঘটিয়েছে রাজাকাররা। অবাঙালি কিছু নিহত হয়েছে ঠিকই তবে, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে অবাঙালিরা বসবাস করত না। এ পর্যায়ে একটি সত্য ভাষণ আছে তা. বইতে– “আমার মনে হতো যেন আমরা ১৬ ডিসেম্বরে মরে গেছি। এখনকার নির্যাতনকে কবর আজাব বলে আমার মনে হতে লাগল। দলের পর দল এসে আমাদের উত্ত্যক্ত করতে লাগল।”

মাসখানেক তারা ছিলেন সেনাবাহিনীর হেফাজতে। এ সময় একদিন তাদের সরকারি স্কুল থেকে পিটিআইয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নেয়া হচ্ছিল। “মুক্তিফৌজদের ধারণা ছিল, রাস্তার দু’পাশে থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উক্তি দিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু সেটা হলো না। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম এর উল্টো। রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের চোখ দেখলাম অশ্রুসজল। কারও মুখে কোন কথা নেই। এমনকি শিশুরাও বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এরা ছিল আমারই প্রতিষ্ঠিত শিশু প্রতিষ্ঠান শাহীন ফৌজের

সদস্য।" আগেই উল্লেখ করেছি আমিনুল এ ধরনের উক্তি প্রায়ই করেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আর শাহীন ফৌজ জামায়াতের নিয়ন্ত্রিত শিশু সংগঠন। বা বলা যেতে পারে ভবিষ্যত রাজাকার তৈরির প্রকল্প। তাদের 'অশ্রুসজল' বা 'চুপ' থাকা স্বাভাবিক। অন্যদের পক্ষে নয়।

এ ধরনের উক্তি এর পরও আছে। আমিনুলকে জেরা করার জন্য ডেকে নেয় লে. কামাল। জেরার এক পর্যায়ে কামাল ইমপ্রেসড হয়ে তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয় বসার জন্য এবং তারপর বলে "ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি মালেককে জানতাম। [মালেক ছাত্র সংঘের কর্মী] খুব ভাল ছাত্র। তার মৃত্যুতে আমরাও আহত হই, যদিও আমি ছাত্র ইউনিয়নে ছিলাম। ৮ কোটি মানুষের গণস্রোত ও প্রচণ্ড গতির সামনে কি করে আপনারা শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই গতি পাল্টে দেয়ার জন্য ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হই। অথচ আপনারা লুট করেছিলেন এমনটি নয় [বাক্যটি লক্ষ্য করুন]। বৈষয়িক সুবিধাভোগীও আপনাদের বলা যাবে না। আপনারা আলবদরের যাঁরা রয়েছেন তাঁরা চিন্তা-চেতনা ও যোগ্যতার নিরিখে বিচার করলে পিছনের সারির নন, অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আপনারা আজ অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছেন!" এই লেঃ কামাল কে জানি না। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে একজন আল-বদরকে চেয়ারে বসিয়ে উপর্যুক্ত মন্তব্য করবে এটি কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমিনুল একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখ দিয়ে আল-বদরের প্রশংসা জানিয়েছেন। এ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে, তারা খুনী নন, বরং যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমিনুলকে এরপর নেয়া হয় কিশোরগঞ্জ জেলে। কারাগারের সামনে তাকে দেখতে মানুষের ভিড় জমে। এ ভিড়ের কারণ তার মতে, "পত্র-পত্রিকায় উদ্ভট প্রচারণা।" আসলে মানুষ তখনও আল-বদর দেখতে চেয়েছিল। কারণ, আল-বদর ও মানুষ ছিল আলাদা। আল-বদররা নিরীহ মানুষদের নিয়ে কসাইর ছুরি দিয়ে জবেহ করত। কুচি কুচি করে কাটত। ১৬ ডিসেম্বরের পর মিরপুরের শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে পুরনো বট ও কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে কুচি কুচি মানুষ কাটার আলামত ঢাকাবাসীরা দেখেছে।

কিশোরগঞ্জ জেলে বসে আমিনুল সময় পেলেন পুরনো দিনের কথা চিন্তা করার। মনে পড়ল তার সত্তরের নির্বাচনের কথা। কী হয়েছিল সত্তর সালে?

১. "সত্তরের নির্বাচন শেষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিকে উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ইসলামী সামজতন্ত্রের ইউটোপিয়া।"
২. সত্তরের নির্বাচনের সময় "আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা আমাদের সহকর্মী বহু পোলিং এজেন্টকে পোলিং বুথ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।"

৩. "তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ভাষণ দেয়ার সময় টাকা সংগ্রহের জন্য শত শত ড্রাম বসান হয়েছিল। এ থেকে কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল সেটা বলা হয়নি। তবে এর অছিলায় কোটি কোটি টাকার হিন্দুস্তানী মদদ জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য।"

৪. ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান ভাঙ্গার "মূল উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগ অথবা শেখ মুজিব কেউই নয়। এর নেপথ্যে যাদের কালো হাত সবচেয়ে সক্রিয় ছিল সেটা হলো কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো।"

৫. "জামায়াত যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবিতে গণআন্দোলন শুরু করার আয়োজন-উদ্যোগ নেয় তখনই ছাত্রদের মাধ্যমে ৬ দফা রাজনৈতিক ময়দানে আনাগোনা শুরু করে। পয়ষট্টির যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে মার খেয়ে হিন্দুস্তান পিছন দিক থেকে এ জাতিকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা নেয়। ৬ দফা আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটা আসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র‍্যাডের [র'য়ের] টেবিল থেকে।"

৬. ১৯৭১ সালের জানুয়ারির পর "অপরাধ করতে করতে আওয়ামী লীগের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে গেল। তখন হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো অবাঙালিদের ওপর। যখন জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার গর্জে উঠল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের লক্ষ্য করে, তখন সরকারের টনক নড়ল।"

৭. মার্চে আমিনুল এলেন ভৈরবে। শুনলেন আওয়ামী লীগ কর্মীরা অবাঙালিদের হত্যা করেছে। তাঁর মনে হলো, "হিন্দুস্তানের প্ররোচনায় এরা কি করে পারলো মুসলমানদের খুনে তাদের হাত রঙিন করতে। কি করে পারলো অবোধ শিশুদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলো আমার মনে।" তারপর আমিনুল কিশোরগঞ্জে এসে "সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম।"

এখন তার বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক। '৭০-এ মেরুকরণ হয়েছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। কিন্তু মাইনোরিটির আদর্শ কী ছিল ইসলামের সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়ায়? ঐ আমলের সব দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো থেকে খবরের কাগজের সংবাদগুলো দেখুন-এর কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আমরাও ভোট দিয়েছি। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা পোলিং বুথে গণ্ডগোল করেছে এ রকম ঘটনা সবখানেই ঘটেছে এটা সত্য নয়। এ ধরনের কথা বলেন পাকিস্তানী জেনারেল ও কিছু পাকি রাজনীতিবিদ। ৭ মার্চ জনসভায় আমি ছিলাম। 'শত শত ড্রাম' বসান হয়েছিল টাকা তোলার জন্য। এ রকম দৃশ্য তো চোখে পড়েনি। কল্পনার অবশ্য সীমা থাকতে নেই। কমিউনিস্ট পার্টি তো

পূর্ব পাকিস্তান মেনেই কাজ করেছিল যে কারণে '৪৭-এ পার্টি উপমহাদেশের মতো ভাগ হয়ে যায়। যদ্দুর মনে পড়ে কমিউনিস্টরা তো পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থনই করেছিল। সুতরাং তাদের কালো হাত পাকিস্তান ভাঙবে কেন? বরং জামায়াত নেতা মওদুদী পাকিস্তান চাননি। আর ছয় দফা এসেছিল গোয়েন্দা সংস্থার থেকে? ব্যাপারটা কি এতই সোজা? আর বিহারী হত্যা? হয়েছে তবে তা অনেক ক্ষেত্রে ছিল প্ররোচনা ও প্রতিশোধমূলক। ১৯৭১ সালের ২৩ থেকে ২৮ মার্চের ঘটনা। আমি তখন ছিলাম মিরপুরের পল্লবীতে। আমি তখন দেখেছি বিহারীদের তাণ্ডব। একটি ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। ২৪ অথবা ২৬ মার্চ বিকেলে দেখি দলে দলে বাঙালিরা পালাচ্ছে তুরাগ নদীর দিকে। এক বাচ্চা ছেলের সঙ্গে দেখা। সেও যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার বাবা-মার কথা। জানাল, বিহারীরা তাদের হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে আবিষ্কৃত মুসলিম বাজার বধ্যভূমি এর একটি উদাহরণ। ছেলেটি যেন ছিল তখন ঘোরের মধ্যে। এ হত্যাযজ্ঞের মধ্যে আমাদের আবার আশ্রয় দিয়েছিল এক বিহারী প্রতিবেশী। সুতরাং বিহারীদের টার্গেট করে সবখানে হত্যা করা হয়েছে ঠিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সব ঘটনার বিকৃতায়ন কেন করলেন আমিনুল? করলেন এ কারণে যে, রাজাকারের ধর্মই তাই।

৯

আমিনুল একটি বিষয়ে খুব সতর্ক। সেটি হচ্ছে সুযোগ পেলেই আল-বদরদের ভদ্র এবং নম্র হিসেবে তুলে ধরা। এবং এ মন্তব্যগুলো সবসময় করানো হয়েছে বিপক্ষীয়দের মুখ থেকে। কারণ আমিনুল জানতেন যে, তারা নিজেরা হিংস্রপশুর থেকে কম ছিলেন না। মানুষ দেখলেই বিশেষ করে সে যদি হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের তাহলে তার রক্ত পান করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর ওপর।

কিশোরগঞ্জ থেকে তাদের নেয়া হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলে। সকালে এসে তারা পৌঁছেছেন শহরে। "তখন ইতস্তত দোকানপাট খুলছে। কিন্তু সবারই চোখ আমাদের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। হয়ত ভাবছে, এমন প্রত্যুষে এরা কারা? আমার সাথীরা দেখতে শরীফ, সভ্য এবং নম্রতার প্রতীক। এদের ব্যাপারে পুলিশী তৎপরতা তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। তাদের বিস্ময়ে হতবাক হওয়া স্বাভাবিক। এই সাত সকালে পুলিশের বেষ্টনীতে যারা এসে থাকে তারা তো আমাদের মতো নয়। তেমন মস্তানী সুরত আমাদের কারও ছিল না।"

তার একবারও মনে হয়নি চোর-ডাকাতকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিলেও মানুষ থাকে। আল-বদর হলে তো দেখবেই। জেলে পিডিপির সহসভাপতি মুসলেহ উদ্দিনের সঙ্গে দেখা। "যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের মতো দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকেও আজকের এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে।" পাকিস্তানীদের পক্ষে থেকে হত্যা করা হচ্ছে দেশপ্রেম।

ইতোমধ্যে মামলা শুরু হয়েছে আমিনুলের। রায়ের দিন দেখলেন, "বিচারক তাঁর আসনে নির্বাক। ভীতি-বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।...রায়টা আমার বিপক্ষে দিতে সম্ভবত বিচারক বাধ্য হয়েছেন। তার কারণ ২০ বছর কারাদণ্ডের রায় শোনার পর যখন আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করি তখন তিনি অসহায়ের মতো সকরুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।... আমার উদ্দেশে তিনি বললেন, আপনি হাই কোর্ট করলে খালাস পাবেন।"

বিচারক আল-বদরদের মামলার রায় দিয়েছেন চাপে পড়ে এবং তারপর তাকে আদালতে;ই উপদেশ দিচ্ছেন হাই কোর্টে যেতে, এ রকম ঘটনা কখনও আমরা শুনিনি। আমিনুল বলছেন, "হিন্দুস্তানী কূটচক্রের আবেষ্টনীতে যে প্রশাসন বাঁধা সে প্রশাসন নিজেই তো অসহায়। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য ইসলামী চেতনার মানুষগুলোকে তারা বিপন্ন করবে এমন প্রত্যাশার বাইরে আমি কখনও কিছু ভাবিনি। আমার ফাঁসি হলেও অস্বাভাবিক মনে হতো না। ৪০ বছর কারাদণ্ড বলতে গেলে খোদার এটা এক মেহেরবাণী। ২শ' বছর আগে এমনি প্রহসন হয়েছিল মুর্শিদাবাদের আদালতে।"

আসল ঘটনা এই যে, আদালতসমূহ অনেক ক্ষেত্রে নমিত ব্যবহারই করেছে। ১৯৭১ সালের ঘটনার ঠিক পর পর পরিস্থিতির আলোকে যদি বিচার করা হতো এবং শাস্তি হতো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকারদের এখন আধিপত্য থাকত না।

১০

ময়মনসিংহ কারাগারে এনে রাখা হলো আমিনুলকে। ডিআইজি আব্দুল আওয়ালও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন খালাস পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে মামলা করতে। ডিআইজি এসেছিলেন ময়মনসিংহ কারাগার পরিদর্শনে।

ময়মনসিংহ থেকে তাকে আনা হয় ঢাকায়। ট্রেনের কামরায় তার সঙ্গে দেখা কিছু পুলিশ অফিসারের, যারা ছিল রাজাকার। তাদেরও ঢাকা নেয়া হচ্ছিল। এখানে তাদের আলাপচারিতার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে পুলিশের একটা অংশের সঙ্গে রাজাকারদের যোগাযোগ ছিল। আবার এ কথোপকথনের অবতারণা করে তিনি আলবদর বিরোধী পুলিশেদের দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন যে, আল-বদররা ক্রিমিনাল নয়। বর্ণনাটি আমি উদ্ধৃত করছি।

"ট্রেন এসে গেল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠলাম। দেখলাম সেখানে আরও কিছু পুলিশ অফিসার আগে থেকেই বসেছিলেন। তারা আমার পরিচিত। এক সময় খুব কাছাকাছি ছিলাম আমরা। যখন কিশোরগঞ্জের পুরো দায়িত্বটা ছিল আমার ওপর, তখন তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা আমাকে জানে। জানে আমার ভিতর-বাইর। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভিবাদন জানাল। খুনের আসামী আমি। আমার কোন এক সময়ে পুরনো সহযোগীদের কাছে

পেয়ে যেন ভাল লাগল। মনে পড়ল আমার সংগ্রামী দিনগুলোর বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। এরাও তো হিন্দুস্তান যেতে পারত। কিন্তু না, ভুল করেও ওদিকে পা বাড়ায়নি। জাতীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতির কথা ভেবেই সম্ভবত তারা এমনটি করেনি। উৎকোচ সংক্রান্ত পুলিশদের স্বাভাবিক অসংযতী আচরণের বহিঃপ্রকাশ যুদ্ধকালীন ৯ মাস তাদের মধ্যে দেখিনি। তাঁরা যা কিছু করেছেন নিহায়ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁরা আমার সাথী পুলিশদের বলে দিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়। বললেন, 'তোমরা যদি আমীন সাহেবকে সত্যি খুনের আসামী মনে করে থাক তাহলে ভুল করবে। উনি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক নিষ্ঠুর শিকার। আমরা তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত কাছে থেকে, আমরা তাঁকে জানি। তোমরা ছেড়ে দিলেও উনি পালাবেন না।' পুলিশরা জবাব দিল, "স্যার, মানুষ নিয়েই তো আমাদের কারবার, প্রকৃত ক্রিমিনাল চিনতে কি আমাদের ভুল হয় স্যার। উনাকে জিজ্ঞেস করুন, তার সাথে কোন বেয়াদবী করেছি কিনা?"

ঢাকায় পৌঁছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করলেন আমিনুল। পুলিশ তাকে সহায়তা করেছে। তারপর বেশ খানিকটা ঘোরাফেরার পর পুলিশ তাকে নিয়ে পৌছল কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে দেখা হলো তাদের পুরনো লিডার রাজাকার কামরুজ্জামানের সঙ্গে। সেখানে তার সঙ্গে জাসদ ও অন্যান্য দলের অনেক নেতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হলো। আমিনুলের ভাষায়, "আমি নিজেই তাদের সাথে পরিচয় করে নিলাম। ভিন্নমুখী স্রোত এক মোহনায় এসে আমরা একাকার।"

ঢাকা কারাগারে তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে অনেকের। তাঁদের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

১. সিরাজুল হোসেন খান: "আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা সখ্যতার পর্যায়ে ছিল। আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের সাথে তার মিল না থাকলেও আওয়ামী লীগ ও ভারত মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন আমাদেরই মতো একই অবস্থানে।" এ উক্তিতে বর্তমান রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের মেরুকরণের সূত্রটি পাওয়া যায়।

২. দেলওয়ার হোসেন সাঈদী : "পাকিস্তান আমলে আমরা তাকে কেউ জানতাম না। বাহাত্তরের জাহেলিয়াতের অন্ধ তমসায় গোটা দেশ ছেয়ে গেলে এক দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। বন্দুকের নলের মুখে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন।... কিন্তু যখন তন্দ্রার ঘোর থেকে গোটা জাতি জেগে উঠল তখন আর সেই নকীব সাঈদী ময়দানে নেই। কি এক অন্ধ মোহে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছেন। আয়েশী জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত প্রাপ্তির সহজ পথ সন্ধান করছেন।"

পাকিস্তানী আমলে সাঈদীকে না চেনার কারণ, তখন সাঈদী ছিলেন সামান্য ক্যানভাসার। '৭১ সালে আলবদর হয়ে হত্যা ও অন্যান্য কার্যে লিপ্ত থেকে জামায়াতের নজরে আসেন ও সম্পদশালী হন। সম্পদ যাতে হাতছাড়া না হয় সে জন্য জামায়াতেই থাকেন। ধর্মকে ব্যবসা ও নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তিনি এখন জাতীয় সংসদের সদস্য। বর্তমান প্রজন্ম যাতে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কিছু জানতে পারে সে জন্য জাতীয় গণতদন্ত কমিশনে তার সম্পর্কে যে রিপোর্ট আছে তা থেকে উদ্ধৃত করছি–

"১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জামায়াত নেতা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তার নিজ এলাকায় আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনী গঠন করেন এবং তাদেরকে সরাসরিভাবে সহযোগিতা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি সরাসরিভাবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, তবে তথাকথিত মওলানা হিসাবে তিনি তার স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা পরিচালনা করেছেন। তার এলাকায় হানাদারদের সহযোগী বাহিনী গঠন করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লুটতরাজ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি তৎপরতা পরিচালনা করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি তার এলাকায় অপর চারজন সহযোগী নিয়ে 'পাঁচ তহবিল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যাদের প্রধান কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী বাঙালি হিন্দুদের বাড়িঘর জোরপূর্বক দখল করা এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা। লুণ্ঠনকৃত এ সমস্ত সম্পদকে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী 'গনিমতের মাল' আখ্যায়িত করে নিজে ভোগ করতেন এবং পাড়েরহাট বন্দরে এসব বিক্রি করে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

পাড়েরহাট ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ইউনিয়ন কমান্ডের মিজান একাত্তরে সাঈদীর তৎপরতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন– "দেলোয়ার হোসেন সাঈদী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে পাড়েরহাট বন্দরের হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি লুট করেছেন ও নিজে মাথায় বহন করেছেন এবং মদন নামে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর বাজারের দোকানঘর ভেঙ্গে তার নিজ বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব বাজারের বিভিন্ন মনোহরী ও মুদি দোকান লুট করে লঞ্চঘাটে দোকান দিয়েছিলেন। দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর অপকর্ম ও দেশদ্রোহিতার কথা এলাকার হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম আজও ভুলতে পারেনি।" (মাসিক নিপুণ, আগস্ট ১৯৮৭)।

পিরোজপুরের এ্যাডভোকেট আবদুর রাজ্জাক খান গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন যে, সাঈদী যুদ্ধের সময় পাড়েরহাট বন্দরের বিপদ সাহার বাড়ি

জোরপূর্বক দখল করেন এবং তখন তিনি এ বাড়িতেই থাকতেন। তিনি সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন।

এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে পাক সেনাদের কাছে সরবরাহ করতেন সাঈদী। এ্যাডভোকেট রাজ্জাক আরও জানিয়েছেন– সাঈদী পিরোজপুরে পাকিস্তানী সেনাদের ভোগের জন্য বলপূর্বক মেয়েদের ধরে এনে তাদের ক্যাম্পে পাঠাতেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঈদী পাড়েরহাট বন্দরটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে জোরপূর্বক তরুণদের ধরে আনতেন এবং আলবদর বাহিনীতে ভর্তি হতে বাধ্য করতেন। কেউ এর বিরোধিতা অথবা আপত্তি করলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো।

গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা পিরোজপুরের অ্যাডভোকেট আলী হায়দার খানও সাঈদীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সাঈদীর সহযোগিতায় তাদের এলাকার হিমাংশু বাবুর ভাই ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে। পিরোজপুরের মেধাবী ছাত্র গণপতি হালদারকেও সাঈদী ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তৎকালীন মহকুমা এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত এসডিও আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান, স্কুল হেডমাস্টার আব্দুল গাফ্ফার মিয়া, সমাজসেবী শামসুল হক ফরাজী, অতুল কর্মশকার প্রমুখ সরকারী কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীদের সাঈদীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হত্যা করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য সরবরাহকারী ভগীরথীকে তার নির্দেশেই মোটর সাইকেলের পিছনে বেঁধে পাঁচ মাইল পথ টেনে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাপ্টেন আজিজের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের কারণে তিনি তাকে নারী 'সাপ্লাই' দিতেন বলে জানিয়েছেন আলী হায়দার খান।

পাড়েরহাট ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন খান জানিয়েছেন, সাঈদীর পরামর্শ, পরিকল্পনা এবং প্রণীত তালিকা অনুযায়ী এলাকার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের পাইকারি হারে নিধন করা হয়। পাড়েরহাটের আনোয়ার হোসেন, আবু মিয়া, নূরুল ইসলাম খান, বেণীমাধব সাহা, বিপদ সাহা, মদন সাহা প্রমুখের বসতবাড়ি, গদিঘর, সম্পত্তি এই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী লুট করে নেন বলে তিনি গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন।

ইন্দুরকানী থানার পাড়েরহাট বন্দরের আনোয়ার উদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঈদী এবং তার সহযোগীরা পিরোজপুরের

নিখিল পালের বাড়ি তুলে এনে পাড়েরহাট জামে মসজিদের গনিমতের মাল হিসাবে ব্যবহার করে। মদন বাবুর বাড়ি উঠিয়ে নিয়ে সাঈদী তার শ্বশুরবাড়িতে স্থাপন করেন।

বেণীমাধব সাহা জানান যে, সাঈদী এবং তার সহযোগীরা তদানীন্তন ইপিআর সুবেদার আবদুল আজিজ, পাড়েরহাট বন্দরের কৃষ্ণকান্ত সাহা, বাণীকান্ত সিকদার, তরণীকান্ত সিকদার এবং আরও অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছেন। হরি সাধু এবং বিপদ সাহার মেয়ের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন। বিখ্যাত তালুকদার বাড়ি লুটতরাজ করেছেন। ঐ বাড়ি থেকে ২০/২৫ মহিলাকে ধরে এনে পাক সেনাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদের পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও দেলোয়ার হোসেন সাঈদী জড়িত ছিলেন বলে শহীদের কন্যা সুফিয়া হায়দার এবং জামাতা আলী হায়দার খান অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানান যে, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সহযোগিতায় ফয়জুর রহমান আহমেদকে পাকিস্তানী সৈন্যরা হত্যা করে এবং হত্যার পরদিন সাঈদীর বাহিনী পিরোজপুরে ফয়জুর রহমান আহমেদের বাড়ি সম্পূর্ণ লুট করে নিয়ে যায়।

একাত্তরের ঘাতক দালাল জামায়াত নেতা সাঈদী বিভিন্ন ওয়াজ তফসিরের নামে এখন বাঙালি জাতিসত্তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন।

৩. আব্দুল খালেক মজুমদার চরিত্র সম্পর্কে আগে বিস্তারিত লিখেছি। খালেক কী ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় আমিনুলের লেখায়। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ না হলে এক রাজাকার সম্পর্কে আরেক রাজাকার এমন মন্তব্য করে না। বিস্তারিত হওয়া সত্ত্বেও আমি বিবরণটি উদ্ধৃত করছি কারণ এতে একজন রাজাকার সম্পর্কে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে। আমিনুল লিখছেন, খালেক "একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকা সিটি জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব হিসাবে কারাগারে তার আচার আচরণ, তার সন্ত্রস্ত অনুভূতি, তার প্রলুব্ধ চেতনা, তার স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ আমাদের যথেষ্ট আহত করেছে। অন্য কোন সংগঠনের নেতা তেমন কোন ঘটনার অবতারণা করলে আমার মনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না এবং সেটা স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু একটা মৌলবাদী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যমূলক জীবনবোধ বিকাশ ঘটানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালু থাকা অবস্থায় তার নেতার অধঃপতিত মানসিকতা দেখে আমার পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক। এটা তাকে খাটো করার জন্য নয়, এই বাস্তবতার নিরিখে তিনি স্বয়ং এবং আরও শত শত নেতা ও কর্মী দিকনির্দেশনা পাবে। তা না হলে এ সব দুর্বলতাকে

লুকিয়ে রাখার অর্থ হবে আমি জেনেশুনে একটা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করলাম।

১০, সেল ডিভিশনে আমার সেলে আমার সাথে তিনি থাকতে শুরু করলেন। তফসির ক্লাস পুনরায় চালু হলো। আমার খুব ভাল লাগছিল একজন আলেমকে আমার সথে পেয়ে। তিনি আমার সাথে ১০, সেল ডিভিশনে থাকলেও তার অফিসিয়াল যোগসূত্র তৃতীয় শ্রেণীর সাথে রয়ে যায়। কয়েদী অবস্থায় তিনি বড় চৌকির ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষিত মানুষ বলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। একদিন দেখলাম ১০, সেল ডিভিশনের ২০ জনের জন্য রান্না করা ২০টা মাছের মাথা নিয়ে একজন মেট হাজির। জিজ্ঞাসা করলাম– 'কে পাঠিয়েছে?' জবাব পেলাম– 'ম্যানেজার সাহেব।' এতে আমার ডিভিশনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। আমার মোটেও ভাল লাগেনি। তৃতীয় শ্রেণীতে এমনিতেই খাদ্য সঙ্কট, তরিতরকারি মাছ মাংসের দারুণ অভাব। তাদের বঞ্চিত রেখে খালেক ভাই কোন্ মানবিক তাগাদায় ২০টি মাছের মাথা আমাদের সেল ডিভিশনে পাঠালেন বুঝলাম না। তবুও যদি এখানে তেমন খাদ্য সঙ্কট থাকত তাহলে সেটা মেনে নেয়া যেত। অনেকে আবার টিপ্পনি কাটলেন, 'এরা আবার ইনসাফ কায়েম করবে?' এরা মানে তো আমরা। আমিও তো জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কথাটা আমার অসহ্য মনে হলো। লজ্জিত হলাম।...

রাতে ঘুমাতে এলেন। তাঁর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম। আমরা যে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করা উপহার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি এটা তিনি টের পেয়েছেন। প্রসঙ্গ আমি তুললাম। বললাম– 'আপনার বিবেক বলে তো একটা কিছু থাকা উচিত। থাকা উচিত আপনার দূরদর্শিতা। এখানে প্রত্যেকটা মানুষ সংবেদনশীল। আমার প্রতি এখানকার সকলের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এক নিমিষে সেটা ধ্বংস করে দিলেন। আপনার এ হাল্কা চেতনাবোধ আন্দোলনের ওপর কত বড় আঘাত করে, আপনার এটা বোঝা উচিত ছিল। অথচ সংগঠনের সব মানুষই এমন নয়। কত হাজার হাজার মানুষ দৃষ্টির আড়ালে কত বড় বড় কোরবানি দিচ্ছে। তাদের কৃতিত্ব আর কোরবানিগুলো হয়ত ভেসে উঠবে না। কিন্তু আপনাদের এই ত্রুটিগুলো দুর্গন্ধ হয়ে ভেসে বেড়াবে।' আর বললাম, 'যা কিছু করবেন একটু ভেবেচিন্তে করবেন। আপনাদের উপদেশ দেয়া তো সাজে না।'

পাবনা আটঘরিয়ার মওলানা বেলাল আমাদের সংগঠনেরই একজন। তিনি একাত্তরের তথাকথিত চেতনার শিকার। প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন তিনিও। ১০, সেল ডিভিশনের এক কোণে আমার সাক্ষাতে আব্দুল খালেক

মজুমদারের উদ্দেশে রাগতভাবে বললেন, 'আপনি সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় লোক হয়ে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে কী করে টাকা নিলেন? ঐ টাকা কি আপনাকে তারা বকশিশ দিয়েছে? এতে কি সাধারণ কয়েদীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? আপনি বলুন হলপ করে বলুন যে, কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আপনি টাকা নেননি?' আব্দুল খালেক মজুমদারকে নীরব থাকতে দেখেছি। দেখেছি রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতে। আবারও আমি খালেক ভাইকে সংগঠনের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সংযত হতে বললাম। প্রতিবাদী কণ্ঠ বেলাল ভাইকে বললাম 'এ নিয়ে আর এগুবেন না।'...

সব চাইতে বেশি আমি ঘৃণা করতাম তার কাপুরুষোচিত অভিব্যক্তি। আমি মনে করি একজন মুসলমান জীবনের সঙ্কটে অথবা কোন দুর্বল মুহূর্তে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু বুঝদীল হতে পারে না। যখন কেউ মনে করবে পুরস্কার ও শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ্ এবং কিসমত যখন নির্ধারিত হয় ওপরে। জিন্দেগীর ফায়সালা যখন আসে লওহে মাহফুজ থেকে তখন একজন ইমানদার মুনাফেক ও কাফেরদের প্রতারণায় ভীতসন্ত্রস্ত হবে কেন? অথচ তাঁকে দেখেছি কারাগারের নিভৃত কোণেও তটস্থ থাকতে। হতে পারে আগে যে অমানুষিক জুলুম আর অত্যাচার তাঁর ওপর হয়েছে তা থেকেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই ভীতি।

কারাগারে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। তাদের সাথে আমার বিরোধ শুধুমাত্র আদর্শগত। আমি জেলখানায় দাওয়াতী ও তরবিয়তী প্রোগ্রাম বলতে গেলে ভালমতো চালু করেছি। খালেক ভাইয়ের উচিত ছিল আমার পাশে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো। অথচ আমি তাঁকে তেমনভাবে পাইনি। বরং আমার আবেগ আর অনুভূতিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন– কারাগারে আমার অবস্থান থেকে একটু পিছু হটে আসতে। একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। কারাগারে কিভাবে তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন। একদিন আমি তিন রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলছি। বলছিলাম– আওয়ামী লীগ আমাকে টার্গেট করে তাদের ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। ডিআইজি পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এতে শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় ডিআইজি হয়ত এখান থেকে আমাকে অন্য কোন জেলে পাঠিয়ে দেবেন। যেটা আওয়ামী লীগ চায়। এমনটি হলে তারা সফল হবে। আমরা হব ব্যর্থ। আমাদের মিশনও হবে ব্যর্থ। আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। 'আপনি তো আমাদের নেতৃস্থানীয়। বাইরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় কিনা?' তিনি কি বলতেন জানি না। দূর থেকে রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে দেখে আড়ালে সরে গেলেন। বুঝলাম ভীতি তাঁকে

পেয়ে বসেছে। আমাদের সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ রয়েছে অথবা আমাদের জন্য কোন সহানুভূতি রয়েছে এমনটি প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়ুক তিনি তা চাইতেন না।

রুহুল আমিন ভূঁইয়া চলে যাওয়ার পর তিনি আবার এলেন। আমি তাঁকে বললাম- 'প্রাচীরের আড়াল হয়ে কি পরিচয় লুকাতে পারবেন, নাকি আমাদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে তাদের সহানুভূতি পাবেন? সহানুভূতি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকলে মিথ্যা মামলায় আপনাকে ওরা জড়াত না। নেতার এমন আচরণের প্রকাশ ঘটলে কর্মীরা তো দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্তত আপনার কাছে আমি এমনটা আশা করি না। কাপুরুষতা আর বুঝদীলির নাম হিকমত নয়।' তিনি লা জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ওদিকে মেজর জয়নাল আবেদীন একটি বই লেখায় হাত দিয়েছেন। তিনি মনে করলেন আব্দুল খালেক মজুমদার তার সহযোগী হলে তার কাজে সুবিধা হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমার কাছ থেকে খালেক সাহেবকে তাঁর নিজের সান্নিধ্যে টেনে নিলেন। আলবদরের ডেরা থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে খালেক ভাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।"

৪. শফিউল আলম প্রধান : "তার ভারতবিরোধী চেতনা আমাদের মতোই মজবুত।"

৫. অলি আহাদ : "হিন্দুস্তানবিরোধী একটি বলিষ্ঠ বিবেক একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি সোচ্চার কণ্ঠ।" এনএসএফ নেতা সৈয়দ নেসার নোমানী আমিনুলকে পরিচয় করিয়ে দেন অলি আহাদের সঙ্গে। অলি আহাদ তাঁকে আবার পরিচয় করিয়ে দেন যাদু মিয়ার সঙ্গে।

৬. মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) আমিনুলকে বলেছিলেন, "তোমাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। বাতাস উল্টো বইছে। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা ব্যাপক গণআন্দোলনে নামব। ঐ জালেম মুজিবের তকতে তাউস ভেঙ্গে আমরা খান খান করে দেব। এ দেশের মাটিতে হিন্দুস্তানের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তোমরা দেখে নিও।... মুজিব তাঁর নাটকের শেষদৃশ্যে এসে গেছে।"

৭. মেজর (অব) জলিল : "জাতীয় স্বার্থ এবং আদর্শ বিরোধী অভীষ্ট অর্জনের জন্য জাসদের নায়কেরা এবং আসম আবদুর রব স্বয়ং দেশপ্রেমিক মেজর জলিলের ভারতবিরোধী ইমেজ চাতুরীর সাথে ব্যবহার করেছেন।"

৮. আসম আবদুর রব : "তাঁর সদম্ভ অভিব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করতাম একাত্তরের আগে থেকে। মালেক হত্যার নেপথ্যেও তিনি ছিলেন আদিম স্বৈর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন তিনি বলেন, 'আমি মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিলাম আমিই আবার প্রত্যাহার করে নিলাম। এ যেন ছেলের হাতের মোয়া।" রব জেলে

পরীক্ষা দেবার সময় নকল করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেন।

৯. খাজা খয়ের উদ্দিন : "আমি এই দেশ, এই বাংলার মাটিতে আর নয়। আমাকে শূন্য হাতে যেতে হলেও কারামুক্তির পর এ দেশ থেকে হিজরত করব। এ দেশ আর সেই দেশ নেই। মুর্শিদাবাদ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের দেশপ্রেমিক সম্মানী ব্যক্তিত্বগুলো যেমন মুনাফেক গাদ্দারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনি দু' শ' বছর পর এ দেশের হাওয়ায় মুর্শিদাবাদের গন্ধ।"

১০. এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান : "শেখ মুজিব আমাদের চেয়ে বেশি অসহায়। তাঁর ইচ্ছা-সদিচ্ছা যাই থাক না কেন, তাঁর করার কিছু নেই। হিন্দুস্তানী চক্রের কাছে তাঁর হাত-পা বাঁধা। তাঁর চারপাশে রুশ-ভারত চক্র এমন ব্যূহ রচনা করে রেখেছে যে তা থেকে তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সন্ত্রাস আর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে কোন্ শাসক না চায়? কিন্তু চাইলেই সেটা করা সম্ভব নয়। এটা করলে মুজিব যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা ধসে পড়বে। আর সেও নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সেনাবাহিনী ময়দানের নামিয়ে সে চেষ্টাও তো করেছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হয়। এর চেয়ে বড় কথা হিন্দুস্তান বাংলাদেশকে এক অরাজক পরিস্থিতির দিকে টেনে আনতে চাচ্ছে এবং সেটা সুপরিকল্পিতভাবে। হিন্দুস্তানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও বাংলাদেশকে দৈন্য-দুর্দশা ও অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। রুশ-ভারত চক্র থেকে দেশটাকে মুক্ত করার মুজিবের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আস্ফালন, তর্জন-গর্জন এবং গালভরা বক্তব্য যা কিছুই করুক না কেন ইন্দিরার চোখের দিকে চোখ রেখেই সেটা করতে হয়। বলতে গেলে মুজিব এখন একটা রোবট, এর রিমোট কন্ট্রোল ইন্দিরার হাতে।"

১১. ফজলুল কাদের চৌধুরী : "...এই শার্দুল নেতার কণ্ঠরোধ করার জন্য সম্ভবত হিন্দুস্তানের কালোহাত, কারাপ্রাচীর আর লোহার গরাদ ভেদ করে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কারাগারের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি যতটুকু জেনেছি– এক কম্পাউন্ডার দ্বারা জনাব চৌধুরীর দেহে সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়ার ফলে ফজলুল কাদের চৌধুরী মুসলিম বাংলার এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, শাহাদাত বরণ করেন। তার সমস্ত শরীর নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল। মুজিব প্রশাসন পরবর্তীতে সেই কম্পাউন্ডারকে সরকারী খরচে তাঁর সচেতন গুনাহ্ মাফের জন্য হজ্জে প্রেরণ করে।"

আমিনুল যাদের কথা আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু ছিলেন খাস রাজাকার। এদের মধ্যে খাজা খয়েরের উক্তিটি দেখুন। শান্তি কমিটির প্রধান বলছেন, "রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ"কে সম্মান দেখান হচ্ছে না। আগেই উল্লেখ করেছি,

রাজাকাররা এ ধরনের উক্তি প্রায়ই করেছে। কিন্তু কখনও এ কথা আসেনি যে, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা তাদের "রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ"-এর কথা দূরে থাকুক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী আচরণ করেছে। বিপাকে পড়লেই তারা আশা করে শত্রুর সঙ্গে বন্ধুর আচরণ। ফজলুল কাদের সম্পর্কে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তা গল্পই। আমরা বরং শুনেছি, ফজলুল কাদের চৌধুরীকে জনরোষ থেকে বাঁচাবার জন্যই শেখ মুজিব তাঁকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন।

এ ছাড়া উপর্যুক্ত যেসব ব্যক্তির কথা আমিনুল আলোচনা করেছেন তারা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে রাজাকারি দর্শনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাদের কার্যকলাপ আমাদের অজানা নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি খাস রাজাকার ও রাজাকারি দর্শনে দীক্ষিতদের সঙ্গেই আমিনুলের পরিচয় হয়েছিল এবং তাদের প্রশংসাও তিনি কোন না কোনভাবে করেছেন, রব ও খালেক ছাড়া। তবে এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন দল করলেও তাদের মতাদর্শে তেমন কোন ভিন্নতা ছিল না। রাজাকারই চেনে রাজাকারের মন।

১১

এরই মধ্যে চলে এল ১৫ আগস্ট। এ ঘটনা শুনে অভিবিদদের কী মুনাজাত করলেন তা বলি– "ইয়া মাবুদ, তুমি ছিলে, তুমি এখনও আছ। তুমি কোনো ব্যাপারে গাফেল নও। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। তুমি আধুনিক দুনিয়ার নব্য নমরুদ-সাদ্দাদের পতন ঘটিয়ে প্রমাণ করলে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই সমস্ত সার্বভৌমত্বের মালিক।" রাজাকারের মন কেমন নির্দয় বা নিষ্ঠুর এ মুনাজাত তার প্রমাণ। কোন রাজাকার ১৯৭১-এর পর মারা গেলেও শুনিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ এমন মুনাজাত করেছেন। সেখানে শিশু, মহিলাসহ একটি পরিবারকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার পর যদি কেউ এ ধরনের মুনাজাত করে তাকে কী অভিধা দেয়া যায়? এখানেই শেষ নয়, হত্যাকারীদের বিষয়ে তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে– 'ইয়া মাওলা, এই বীর সৈনিকদের হাতগুলো মজবুত করে দাও, হিম্মত দাও এদের বাহুতে।' নারী-পুরুষ যে হত্যা করে সে বীর হয় কীভাবে? তবে এ ধরনের উক্তি কিন্তু এখনও শোনা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখে। এর যোগসূত্র ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭৫ সালের পর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক অনেককে কারাগারে নেয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আমিনুলের কথোপকথনের বিবরণ আছে। এঁদের অনেকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় বলে উল্লেখ করেছেন। মুজিব হত্যাকাণ্ডে যে তাঁরা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তা ঐ বিবরণ থেকে বোঝা যায়।

আগরতলা মামলার আসামী আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে তার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতাকালে আমিনুল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকার একটি অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। তার মতে, আওয়ামী লীগ বিহারীদের ওপর 'বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়েছে। "গণউত্তেজনা সৃষ্টি করে শত শত ইপিআর,

সেনাবাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে ছাগলের মতো হত্যা করা হয়েছে। এর পরও সশস্ত্র বাহিনী তাদের হত্যাকারীকে চুমু খাবে? এমনটি হবে না জেনেই আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তারা চেয়েছিল সেনাবাহিনী জনগণকে অত্যাচার করুক। তাহলে তারা হিন্দুস্তানে যেতে বাধ্য হবে। এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে অস্ত্র।"

প্রথমত, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 'শত শত' লোককে হত্যা করা হয়নি। যদি হতো তাহলে পাকিবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা চালাতে পারত না। দ্বিতীয়ত, ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীই নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যারা আগে থেকে সতর্ক ছিল তারা বেঁচেছে এবং যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের আত্মরক্ষার্থেই করতে হয়েছে। তৃতীয়ত, কথিত হত্যাকাণ্ডের কারণে পাকিবাহিনীরা যদি কথিত হত্যাকারীকে 'চুমু' না খায় তাহলে আলবদরদের হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদের 'চুমু' খাওয়া হবে কেন? কেন প্রতিটি রাজাকার তাদের বইতে লিখেছে তাদের প্রতি 'অমানবিক' ব্যবহার করা হচ্ছে? 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অমানবিক ব্যবহার করা অনুচিত'-এ অভিযোগ কেন তারা করছে? এই যুক্তি ধরেই বলা যায়, হত্যাকারী তো হত্যাকারীই, সে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয় কীভাবে?

আমিনুল তার বক্তব্যের রেশ ধরে আরও বলেছিলেন, "পাকিস্তান ছিল জনগণের রায়। এটা চাপানো কোন বস্তু ছিল না। আপনারা এই রায়কে পাল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের অপরাধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে কী পর্যায়ের ভেবে দেখেছেন কি? অথচ যারা সেই রায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে তারাই দেশের শত্রু, আপনাদের পরিভাষায় দালাল।"

পাকিস্তান যদি জনগণের রায় হয়, বাংলাদেশও জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান যত লোক চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি মানুষ বাংলাদেশ চেয়েছিল। তাহলে একই যাত্রায় পৃথক ফল হলো কেন?

আহমদ ফজলুর রহমান ও কামাল (পরিচয় জানা যায়নি। আগরতলা মামলার কি?) তাঁদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর ঐ সদস্যদের সঙ্গে মিল আছে নাকি আদর্শের, যে আদর্শ পাকিস্তান থেকে ধার করা। সে জন্যই আগে উল্লেখ করেছি, মুক্তিযুদ্ধ করলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব নয় যদি মনের গহীনে রোপিত থাকে রাজাকারি আদর্শ।

আহমদ ফজলুর রহমান বলেছিলেন– "পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে আমাদের ওপর। উল্টো করে টাঙ্গিয়ে চাবকাল তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত। সব চাইতে বড় কথা, তারা যে ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেটা বাংলা নয় উর্দুতে। মনে হলো আমি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি।"

কামাল বলেছিলেন, সেই সব সৈনিকের "নির্মমতা পাকিস্তানীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের ওপর তাদের যেন এক আদিম আক্রোশ জমে ছিল। পাকিস্তানী মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ আজও সেনাবাহিনী দখল করে আছে।"

এর বিপরীতে আমিনুলের ভাষ্য "মুক্তিফৌজরা গ্রামবাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে জাতীয় বিবেকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য।"

আরও অনেকের সঙ্গে আমিনুলের আলাপ হয়েছে জেলে। কোরবান আলী তাঁকে বলেছিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলাম করবেন। এতে কতটুকু সত্যতা আছে জানি না। তবে কোরবান আলী পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ময়মনসিংহ জেলে তোফায়েল আহমেদ নাকি তাকে বলেছিলেন, "আমিন, আমরা কি একাত্তরে ভুল করেছিলাম?" তোফায়েল আহমেদ এ কথা বলতে পারেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমিনুলের ক্রোধ বেশি হিন্দু জেলার নির্মল রায়ের প্রতি। হিন্দু ধর্মের হওয়ায় জনৈক সেকশন অফিসার রাখাল বাবুর ওপরও তার ক্রোধ ছিল। কিন্তু ক্রোধ বেশি ছিল অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের প্রতি। কারণ মযহারুল ইসলাম তাকে পাত্তা দেননি এবং সবাইকে পরামর্শ দিতেন রাজাকারদের এড়িয়ে চলার জন্য। সে কারণে, মযহারুল ইসলাম সম্পর্কে আমিনুলের মন্তব্য, "তার রবীন্দ্রপ্রীতির আতিশয্য এত অধিক ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা পরিবর্তিত হয়ে হিন্দুপ্রীতিতে পরিণত হয়। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পেয়েছিল পুরোপুরি। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করার ব্যাপারে এতটুকু সংশয় ছিল না। কোন জাতির মগজে পচন ধরলে সে জাতির অধঃপাত ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার সাথে [তাঁর] মতবিরোধের প্রেক্ষিতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, আওয়ামী লীগের কেউ যেন আমার সাহচর্যে না আসে আওয়ামী লীগ নেতারা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, এটা হয়েছিল ডক্টর মযহার সাহেবের ইঙ্গিতে।"

নির্মল রায় সম্পর্কে মন্তব্য, "নির্মল রায় একাত্তরের সঙ্কটেই ভারতে পাড়ি না জমিয়ে হিন্দুস্তানের সপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য দুঃসাহসে ভর করে ঢাকায় যায়।" নির্মল রায়ের অপরাধ হিন্দু হয়ে কেন তিনি ভারতে যাননি। অর্থাৎ বাংলাদেশ মুসলমানদের জন্য, হিন্দুদের জন্য নয়। রাখাল ভট্টাচার্য সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা কল্পকাহিনী মনে হবে। প্রতিপক্ষ বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে রাজাকাররা এ ধরনের গল্পের অবতারণা এখনও করে। কীভাবে রাজাকার আমিনুলরা দেখেছেন হিন্দুদের তার আরেকটি বিবরণ– "একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ের কোন হিন্দুর বাংলাদেশে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। কালামে পাকের অনেক সূরা অর্থসহ তাঁর জানা। নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। একাত্তরে তিনি বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়িয়েছেন। এমনকি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদে ইমামতি করেছেন বলেও তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার অনেক আগে থেকে তিনি হিন্দুস্তানের শত্রু চিহ্নিত করে হত্যা করিয়েছেন। এ দেশের তথ্য হিন্দুস্তানে পাচার করেছেন। তার মুসলিমবিদ্বেষী জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি কারাগারের অভ্যন্তরেও। এখানে মুসলমান অবুঝ তরুণদেরকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

আমি একদিন আমার সেলে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা উত্তেজিত কণ্ঠ আমার কানে এল। বলতে শুনলাম– "আমরা একাত্তরের আলবদর, রাজাকার আর শান্তি কমিটির লোকদের ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। সামনের দিনগুলোতে আমরা আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। বঙ্গবন্ধু এদের জেলে পাঠিয়ে রক্ষা করেছেন। ওরা জেলখানাকে ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত করেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, কি দুঃসাহস! একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ওরা জেলখানায় বীজ বপন করছে। ওদের ক্ষমা করা আর ঠিক হবে না।"

আজ ত্রিশ বছর পর মনে হয়, রাখাল ভট্টাচার্য যদি সে কথা বলেই থাকেন তাহলে কি খুব ভুল বলেছিলেন? গল্পের এখানেই শেষ নয়। আমিনুল নিজের সেল থেকে বেরিয়ে দেখেন এ উক্তি রাখালের। আমিনুল রাখালকে বলেন, "এটা একাত্তর নয়, ছিয়াত্তর, একাত্তরে অন্ধ তরুণ, যাদের দিয়ে জঘন্যতম কাজ করিয়েছেন। তাদের বিরাট অংশ এখন আমার পাশে।"

আমিনুলের এই উক্তির প্রথম লাইনটি ঠিক। '৭৫ সালের পর থেকে নতুন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়, যার নাম পাকি-বাংলাদেশ হলেও তাদের আপত্তি হতো না। '৬৯-৭১ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আদর্শ তরুণরা গ্রহণ করেছিল, '৭৫-এর পর থেকে পাকি-বাংলা নামে একটি আদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেয়া হলো। ঐ সময়ের পাঠ্য বই, টিভি/সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা তার উদাহরণ।

এ প্রসঙ্গে আমিনুল আরেকটি মন্তব্য করেছিলেন যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লিখেছেন তিনি, '৭৫ সালের পর আওয়ামী ও আওয়ামী সমর্থক বন্দীতে জেল ভরে উঠতে লাগল। জেলে আমিনুলরা হটে যেতে লাগল, তাদের ভাষায়, আওয়ামীদের উদ্ধত আচরণের কারণে– "আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী উদ্ধৃত আচরণের আর একটি কারণ হলো পঁচাত্তরে আওয়ামী প্রশাসনের পতনের পর থেকে ক্রমশ কারামুক্তির ফলে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে গ্রেফতার হয়ে আওয়ামী সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

আওয়ামী লীগের শাসনে আল-বদর বা রাজাকাররা অন্তত জেলে ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের মানুষরা জেলে ছিল আর রাজাকারদের মুক্ত করা হয়েছিল।

১৫ আগস্টের পর বড় ঘটনা জেলহত্যা। রাজাকাররা কি খুশি হয়নি জেল হত্যায়? হয়েছিল। তবে, সেই খুশিটা প্রকাশের ভাষা ছিল অন্য। আমিনুল জেলহত্যা সম্পর্কে লিখেছেন, "এটা অমানবিক বর্বরতা। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে আমরা ঠেকাব কি দিয়ে। একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বালির বাঁধকে ভেঙ্গে দিতে পারে। আশ্চর্য হলাম দু'শ' বছর পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখে। মোহাম্মদী বেগরা অপঘাতে মরবে এটাই তো স্বাভাবিক।"

এ প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান ও খন্দকার মোশতাককে রাজাকাররা কীভাবে মূল্যায়ন করেছে দেখা যাক। আমিনুল ছাড়া অন্য রাজাকাররা এ বিষয়ে খুব একটা আলোকপাত করেননি।

জিয়া সম্পর্কে রাজাকারদের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। জিয়া ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে হয়ত তাঁর ভূমিকাও থাকতে পারে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কর্নেল ফারুকের, খন্দকার মোশতাকের। সুতরাং শেষোক্তদের বিশ্বাস করা যায়। জিয়া সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল, জিয়া তাদের লোক ঠিক আছে। হয়ত পাকিস্তান-বাংলা আদর্শকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতাও পাকাপোক্ত করবেন কিন্তু প্রয়োজনে তাদের আবার ত্যাগও করতে পারেন নিজের সুবিধার জন্য। এ বিষয়ে আমিনুলের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলেই তা প্রমাণিত হবে।

"পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণকারী তরুণ সেনা নায়করা দেশের মাটিতে আর নেই। দারুণভাবে দুঃখ পেলাম। মনে হলো সেই জানবাজদের কাছে জাতির অনেক পাবার ছিল। দেশের প্রতি জাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ ছিল বলেই তারা চূড়ান্ত কোরবানির প্রস্তুতি নিয়ে মুজিবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের তত্ত্বাবধানে তিন মাসের বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ ঘটে বাংলাদেশ। তাদের সদিচ্ছা তাদের প্রাণের স্পর্শের সাথে কারও তুলনা করা যাবে না। জিয়ার ক্ষমতারোহণ, এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। কেননা দেশের পটপরিবর্তনে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু পরিস্থিতির সুফলটা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমার মনে হয়েছিল পঁচাত্তরের চেতনা তাঁর মধ্যে নেই বলে ক্ষমতায় আট-ঘাট হয়ে বসবার চিন্তা-চেতনা দ্বারাই তিনি চালিত হবেন। অর্থাৎ আদর্শ নয়, ঐতিহ্য নয়, জাতি নয়, দেশ নয় তাঁর কর্মের কেন্দ্রবিন্দু মসনদ। [illegible] সেলে বসে জিয়া সম্বন্ধে আমার যে ধারণার উন্মেষ হয় জিয়া তার শাসনকালের প্রতিটি কর্মে অনুরূপ স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমত, পঁচাত্তরের নায়কদের বাংলাদেশে আসতে দেননি। আসলেও তাদেরকে জুলুম নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে তিনি নিজেই মসনদে সমাসীন হয়েছেন। তৃতীয়ত, বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তোয়াবকে দেশ ত্যাগ বাধ্য করেছেন। কেননা এ দেশটাকে ইসলামী দেশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন বিমানবাহিনী অফিসারদের হত্যা করিয়েছেন। শত শত তরুণ সামরিক অফিসার ও জোয়ানকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। শত শত সৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। রাজনীতিকদের তেজারতের মালে পরিণত করেছেন। তাঁর শাসনামলে রাজনীতিকদের কেনা-বেচা শুরু হয়। তিনিই সেনাবাহিনীকে রাজনীতির মোহে আবিষ্ট করেছেন। তাঁর ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে ভাঙনের দিকে

নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহর ছত্রছায়ায় তিনি ইসলামী চেতনাকে নস্যাত করার সুযোগ করে দেন। কর্নেল নাসেরের মতো একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সমস্ত কাজ বিঘূর্ণিত হতে থাকে। সরকারী ব্যয়ে তরুণদেরকে তাঁর রাজনীতির মুখাপেক্ষী করে তোলেন। সবচেয়ে বড় কথা এ দেশটার স্বকীয় সত্তার বিকাশ না ঘটিয়ে আমেরিকা ও রুশ-ভারত অক্ষশক্তির চারণভূমিতে পরিণত করেন।"

এরপর আমিনুল ইরান যান। ইরানী বিপ্লব তাকে প্রভাবান্বিত করে। তারপর যান মক্কা। সেখানে ইরানী বিপ্লবের পক্ষে হাজীদের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করেন। আমিনুলের কাহিনী এখানেই শেষ।

১৯২ পৃষ্ঠার বইটি পড়ে জানা গেল, আল-বদররা দেশের জন্য কাজ করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। এই পরাজয় সাময়িক। রাজাকারদের অন্যভাবে চিত্রায়িত করা হয় যা ঠিক নয়। এগুলো স্বল্প কিছু লোকের কারসাজি। রাজাকারি জজবার প্রতি লোকের আস্থা আছে, এমনকি বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজনীতিবিদদেরও। সচেতন পাঠক যদি না হন তাহলে *আমি আলবদর বলছি* পড়ে এই ধারণাই হবে। এবং মনে হবে, 'রাজাকার' ছিল তো কি হলো?' এই মনে হওয়াটাই বিপজ্জনক। এই মনে হওয়ার অর্থ রাজাকারির দিকে এক পা এগোনো এবং পাকিস্তান-বাংলা আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রথম ধাপ। আর সব রাজাকার আলবদররা এ ধারণাটিই সবার মধ্যে আগে সঞ্চারিত করতে চায়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত আলবদর সংক্রান্ত প্রতিবেদন

১৯৭১-১৯৭২

আলবদররা ১৯৭১ সালে যা বলেছে
সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবে

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের চারজন নেতা গতকাল শনিবার ঢাকায় প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে জাগ্রত ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ভারতকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবে।

এ পি পি জানায়, পাকিস্তানের অস্তিত্ব ধ্বংস করার ভারতীয় দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত ও অবাঞ্ছিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের জীবন দুর্বিসহ করার হীন মানসে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির ঘৃণ্য ভূমিকা পালনে মেতে উঠেছে। একদিকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ প্রস্তুতি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত বন্ধু সেজে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার পুরাতন দুঃস্বপ্নে বিভোর হয়েছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে সম্প্রতি যে উক্তি করেছেন তা থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব গ্রহণ এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ, সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতয়েন ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় বেতারের দুরসন্ধিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তথাকথিত "স্বাধীন বাংলা" আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে গোলামে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মোহাম্মদ ইউনুস, পূর্ব পাক সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও ঢাকা শহর সংঘের সভাপতি সৈয়দ শাহ্‌জামাল চৌধুরী।

দৈনিক সংগ্রাম : ১১ এপ্রিল ১৯৭১ঃ ২৮ চৈত্র ১৩৭৭

সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক ওসমান রম্‌জ
দেশের দু' অংশের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

করাচী, ২৭ শে এপ্রিল (এপিপি)- চট্টগ্রাম জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান রম্‌জ আজ এখানে বলেছেন যে, যখনই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক না কেন, দেশের দু'অংশের মধ্যেই তা করতে হবে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন, সরকারের প্রথমে দেশের পশ্চিমাংশে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মতো কোনো ভুল করা উচিত নয়। কারণ, এর পরিণাম মারাত্মক আকার ধারণ করবে। অধ্যাপক রম্‌জ বলেন, এতে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে বলে তারা মনে করবে। ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

তিনি আরো বলেন, এই মনোভাবে যারা এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী তাদের মাঝেও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে গ্রহণের জন্য কতকগুলো পদক্ষেপের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক রম্‌জ বলেন, খারাপ পথে পরিচালিত করে এমন সব বিদেশী সাহিত্য নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তথ্য ও প্রকাশনা কার্য পরিচালনাকারী অদেশপ্রেমিক ও পাকিস্তানের আদর্শে অবিশ্বাসী লোকদের এসব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া উচিত।

জনাব রম্‌জ আরো বলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে ইসলাম ও পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিলেবাস পরিবর্তন করা উচিত। তিনি বলেন, হিন্দুদের এবং পাকিস্তান বিরোধী লোকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা অপরিহার্য। এছাড়া জনগণকে ভুল পথে পরিচালনাকারী অন্যান্যের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অধ্যাপক রম্‌জ বলেন, সময় নষ্ট না করে পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকার সমস্যাগুলো দূর করা উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান তার বিচ্ছিন্নতাবাদ পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করেন এবং অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের নামে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ বল প্রয়োগ শুরু করেছিল।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাকারী হিন্দুরাই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৯ এপ্রিল ১৯৭১ : ১৫ বৈশাখ ১৩৭৮

লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযম

পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি অবজ্ঞাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর কারণ

লাহোর, ২০শে জুন (এপিপি)।- পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আদর্শের প্রতি আমাদের চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার উদ্ভব হয়।

আজ এখানে দলীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দানকালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত প্রধান বলেন, এই উপমহাদেশের মুসলমানরা কোন চাপের বশবর্তী হয়ে নয় বরং স্বেচ্ছায় তাদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি লাভে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নেতারা সেই আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। যার দরুন সমাজতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জামায়াত নেতা বলেন, বিশেষ করে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের দশ বছরের একনায়কত্ব শাসন দেশের জনগণকে পাকিস্তানের মূল আদর্শ থেকে বিপথে পরিচালিত করে। তাছাড়া গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্যেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূয়রে সরে যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজনীতির দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানীরা মনে করে যে, দেশের প্রশাসনে সমঅংশের সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে এবং যারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নয় তারা এই অভিযোগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তিনি বলেন, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন রাজনৈতিক দলসমূহকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

জামায়াত নেতা আরো বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অধিক সংখ্যক অমুসলমানের সহায়তায় শেখ মুজিবুর রহমানের হয়তো বিচ্ছিন্নতার ইচ্ছা থাকতে পারে। তবে তিনি প্রকাশ্যে কখনও স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করেননি। অবশ্য যদিও তার ছয়দফা স্বাধীনতাকে সম্ভবপর করে তুলতে পারতো বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানীই প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলেন এবং তাঁর এই ধারণা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গোটা পূর্ব পাকিস্তান সফর করে বেড়ান। অনুরূপভাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং আতাউর রহমান খানের দলও এই উদ্দেশ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তিনি বলেন, এসব ব্যক্তিই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার দরুন শেখ মুজিবুর রহমানই উক্ত পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হন। এ প্রসঙ্গে জামায়াত নেতা আরো বলেন যে, বিচ্ছিন্নতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে চিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের তো গ্রেফতার করা হয়নি। তাছাড়া বর্তমানে এসব নেতাই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করছেন-বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতারা নয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের গণভোট ছিল সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর। তিনি বিচ্ছিন্নতার জন্য গণভোট চাননি। সুতরাং যারা আওয়ামী লীগকে ভোট

দিয়েছেন তাদেরকে পাকিস্তান বিরোধী বলে চিহ্নিত করা উচিত হবে না বলে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত প্রধান মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, শক্তি নয় বরং গণতন্ত্রই দেশের দু'অংশের ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধন আরো জোরদার করবে।

তাছাড়া কর্তৃপক্ষের পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের হৃদয় জয় করা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া উপায় ছিল না

ইতিপূর্বে পিণ্ডিতে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন যে, দেশের পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, গত শনিবার রাতে এখানে হাসমত আলী ইসলামীয়া কলেজে দলীয় কর্মীদের এক সভায় অধ্যাপক আযম বক্তৃতা দানকালে একথা বলেন। স্থানীয় জামায়াত প্রধান মওলানা ফতেহ মোহাম্মদ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত প্রধান বলেন যে, দেশের সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহ কাজ করছে তারা কতিপয় সীমান্ত এলাকা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেন যে, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সকল দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করেছে এবং বর্তমানে এমন কোনো শক্তি নেই যা সেনাবাহিনীর প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। অধ্যাপক আযম বলেন, বিরোধী ব্যক্তিরা এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস না পেয়ে বরং তারা রাতের অন্ধকারে ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেদের লিপ্ত রেখেছে। তিনি বলেন, তার দল পূর্ব পাকিস্তানে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এ কারণেই দুষ্কৃতিকারীদের হাতে বহু জামায়াত কর্মী শহীদ হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁর দল দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে বলে জামায়াত নেতা অভিমত প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান ও ইসলাম এ দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং কেবলমাত্র ইসলামী আদর্শই পাকিস্তানের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে বলে অধ্যাপক আযম অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে এক নব অধ্যায় সূচিত হবে সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২১ জুন ১৯৭১

সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশকে রক্ষা করার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।
-গোলাম আযম

লাহোর, ২১শে জুন (এপিপি)।- আজ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ রোডে অবস্থিত জামায়াত অফিসে গতকাল কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার অন্যা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।

তিনি বলেন, বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালের বাংলার বিদ্রোহের চেয়েও দশগুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।

অধ্যাপক আযম বলেন, ১৯৬৯ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর ছয়জন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম "স্বাধীন বাংলাদেশ"- এর শ্লোগান তোলে। পরবর্তীকালে তাদেরকে সামরিক আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা হাজির হয়নি। পরে তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান এক তারবার্তায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানান।

অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং ঢাকা আসেন এবং উক্ত ছাত্রদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ২২ জুন ১৯৭১

করাচীতে অধ্যাপক গোলাম আযম
পূর্ব পাকিস্তানীরা সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে একত্রে বাস করবে

করাচী, ২২শে জুন (পিপিআই)।-পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম আজ এখানে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সব সময়ই তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে একত্রে বসবাস করবে।

আজ বিকেলে করাচীর এক হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন যে, ভারত কোনো মতেই পূর্ব পাকিস্তানীদের বন্ধু হতে পারে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের আদর্শ গোটা জাতির জন্য পথ-নির্দেশক এবং একমাত্র ইসলামই দেশের দুই অংশকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যে সব দল খোলাখুলিভাবে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করেছিল এবং স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করেছিল, সে সব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক গোলাম আযম জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং দুষ্কৃতিকারী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের কার্যকরীভাবে প্রতিহত করার জন্য ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানান।

জামায়াত নেতা পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এক্ষণে সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা পূনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে কার্যকরী সহযোগিতার সাথে কাজ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সাথেও সহযোগিতা করতে হবে। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আযম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনও বিচ্ছিন্নতার জন্য ভোট দেয়নি। তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের জন্য ভোট দিয়েছিল।

তিনি প্রসঙ্গত বলেন যে, কায়েদে আজম পাকিস্তানের মহান নেতা ছিলেন এবং দেশের উভয় অংশের লোক ঐক্যবদ্ধভাবে এই বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম করেছিল।

যে নীতি দেশের উভয় অংশকে এখনও পরস্পর ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া ও কাজ করার জন্য জামায়াত নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না এবং নির্বাচন ও অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন যে, পিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি প্রেসিডেন্টকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৩ জুন ১৯৭১

জামাত নেতার আহবান

গ্রামে গ্রামে রক্ষীদল গঠন করুন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ২রা জুলাই (এপিপি)।- পাকিস্তান বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের অশুভ তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

জনাব খালেক গ্রামে গ্রামে রক্ষীদল (রাজাকার বাহিনী) গঠনের এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির ওপর নজর রাখারও আহ্বান জানান।

আখাউড়ায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী ভারত পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই কখনও মেনে নিতে পারেনি। এবং তাই যেভাবেই হোক পাকিস্তানের বিনাশ সাধনই তার লক্ষ্য।

জামাত নেতা বলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারত এখন পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং তার এজেন্টদের দিয়ে দেশের এক অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করছে। তিনি বলেন, ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।

স্থানীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় বক্তৃতাকালে জনাব খালেক ভারতীয় মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা জাতির পিতা কায়েদে আজমের পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হয়ে এবং তাদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়।

জামাত নেতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ তাদের অভাব-অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। তারা কখনই বিচ্ছিন্নতার জন্যে ভোট দেয়নি। এই পর্যায়ে জনাব খালেক সমবেত জনতার কাছে জানতে চান তারা পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ভোট দিয়েছিলেন কিনা? উপস্থিত সকলে একবাক্যে না বলে ওঠেন।

তিনি বীর জওয়ানদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা শান্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় জনাব এ. আর. মোল্লা, জনাব পীয়ারা মিয়া, জনাব মুজিবুর রহমান ও জনাব আবদুল্লাহ ভূইয়া ও বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পাকিস্তান : ১৮ আষাঢ় ১৩৭৮

চট্টগ্রামের সুধী সমাবেশে প্রখ্যাত ছাত্রনেতা নিজামী
দুনিয়ার কোনো শক্তিই পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না

চট্টগ্রাম, ৩রা আগস্ট।-বিশ্ব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম সদস্য সংগঠক পাকিস্তান ইসলাম ছাত্রসংঘের নিখিল পাকিস্তান সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী দলীয় ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ ছাত্র-সুধী সমাবেশে ভাষণ দানকালে জনাব নিজামী এই আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, এখন ব্যক্তিগত মর্যাদা বা দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন নয়, এখন প্রশ্ন পাকিস্তান টিকে থাকার। পাকিস্তান টিকে থাকলেই কেবলমাত্র এখানকার মুসলমানরা টিকে থাকতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

"পাকিস্তানের বর্তমান জাতীয় সংকট এবং নাগরিকদের দায়িত্ব" শীর্ষক বিষয়ে আলোচনকালে ছাত্রনেতা নিজামী বলেন, ১ লা মার্চ থেকে দুষ্কৃতিকারী ও ভারতীয় অনুচররা যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে কোনো মানুষই আশা করতে পারেনি যে, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানরা স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকে থাকবে। দুষ্কৃতিকারীরা দেশের বুকে যে রক্তের প্রবাহ বইয়েছে তার নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনাব নিজামী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানী ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও দলসমূহের অনৈক্যের কারণেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল এবং দেশে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

জনাব নিজামী বলেন, দেশপ্রেমিক জনগণ যদি ১লা মার্চ থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতো তাহলে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারতো না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ঈমানদার মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা রাজনৈতিক পন্থায় করতে ব্যর্থ হল, তখন আল্লাহ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তার প্রিয়ভূমির হেফাজত করেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছাত্রনেতা জনাব নিজামী পাক সেনাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের সকল আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী হামলার মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাহস ও ত্যাগের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন।

পাকিস্তানের বর্তমান সংকটের কথা বলতে গিয়ে জনাব নিজামী বলেন, অনেকেই এর জন্যে দেশের ছাত্র সমাজকে দায়ী করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ছাত্রদের কিছু অংশ এর জন্যে দায়ী হলেও সমগ্র ছাত্রসমাজ এর জন্যে দায়ী নয়। বরং বিগত ২৩ বছরে যারা ছাত্র সমাজকে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস, পাকিস্তানপূর্ব ভারতের মুসলমানদের দুরবস্থার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত রেখেছে তারাই এর জন্যে দায়ী বলে জনাব নিজামী মন্তব্য করেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, বিগত আমলে ছাত্রদেরকে একদিকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান দেয়া হয়নি অন্যদিকে শাসকদের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কর্মপন্থার ফলে ছাত্রদের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তান অর্জনের পর বহুদিন আমরা আমাদের পরিচয় ভুলে ছিলাম। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারত যখন আমাদের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায় তখন আমরা আত্মসচেতনতার পরিচয় দিলাম কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আবার আমরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার আমাদের ওপর গজব আসল। এবার আমরা আবার আত্মসচেতন হলাম। যদি এই আত্মসচেতনতার পর আবার আমরা ভুল করি তাহলে হয়ত আল্লাহ আমাদেরকে আর সুযোগ নাও দিতে পারেন।

জনাব নিজামী অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পাকিস্তানের যুবকদের জাতীয় আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরিশেষে জনাব নিজামী বলেন,

পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। আল্লাহ্ একে বার বার রক্ষা করেছেন, ভবিষ্যতেও রক্ষা করবেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি পাকিস্তানেক নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।

সভায় বক্তৃতাকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আবু নাছের পাকিস্তানপূর্ব ভারতে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচারের এক বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সেই হিন্দুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি, সেই হিন্দুদের সাথে আমরা কোনদিন এক হতে পারি না। ভারতের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে শহর শাখার সভাপতি জনাব মীর কাসেম আলী বলেন যে, পাকিস্তান আবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। পাকিস্তানের বুকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একে টিকিয়ে রাখা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি এলাকা থেকে শত্রুর শেষ চিহ্ন মুখে ফেলার জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় হামলার নিন্দা এবং বৃটেন ও বিবিসির মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সকল বৃটেনী দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২০ শ্রাবণ ১৩৭৮

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ

পাকিস্তান ভূখণ্ডের নাম নয় একটি আদর্শের নাম

আজাদী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঐতিহাসিক ছাত্র একাত্তরের ঘাতক-দালাল : যা বলেছে যা করেছে ১৩৫ সমাবেশে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী বলেন, পাকিস্তান কোনো ভূখণ্ডের নাম নয়, একটি আদর্শের নাম। ইসলামী আদর্শের প্রেরণাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এবং এই আদর্শই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম।

ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্তৃক আয়োজিত এ সমাবেশে জনাব নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ইসলামপ্রিয় ছাত্র সমাজ বেঁচে থাকতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকবে।

পাকিস্তানের শত্রু ইহুদী, ভারত ও রাশিয়ার পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে ছাত্রনেতা নিজামী বলেন, শুধু রাশিয়াই নয় সারা দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ভারতের পেছনে দাঁড়ালেও ভারত পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারবে না। তিনি বলেন, রাজনৈতিক শর্তসাপেক্ষে আমরা কোন দেশের সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি নই। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারের প্রতি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা জারি করার দাবী জানিয়ে বলেন, ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তন হলে আমাদের বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তিনি আরো বলেন, মুসলমান ভিক্ষা নেয় না, ভিক্ষা দেয়।

নূরুল ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য সকল প্রকার পন্থাই অবলম্বন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি পঙ্গু করা এবং অর্থনৈতিক ও শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য ভারত তাদের চরদের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ প্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু দেশপ্রিয় নাগরিক ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ তাদের সকল ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে ও দিচ্ছে।

জনাব নূরুল ইসলাম বলেন, দেশপ্রেমিক ছাত্র সমাজকে আজাদী রক্ষার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছাত্র সমাজকে আজাদীর রক্তাক্ত ইতিহাস জানার আহ্বান জানান।

সমাবেশে ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামুসুল হক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শওকত ইমরান বক্তৃতা করেন। পূর্ব পাক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহীদ কতিপয় প্রস্তাব পাঠ করেন।

ঐতিহাসিক মিছিল

সমাবেশ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়। ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রদের এই বিশাল মিছিলটি গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পুরানো হাইকোর্ট ভবনের সম্মুখস্থ পথ ধরে বায়তুল মোকাররম এসে মিছিল শেষ হয়।

মিছিলের ছাত্ররা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে শ্লোগান তোলেন-আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে, পাকিস্তানের উৎস কি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইসলামী শিক্ষা কায়েম কর, ভারতের দালাল খতম কর ইত্যাদি।

দৈনিক সংগ্রাম : ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৮

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরার প্রস্তাব

পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য কতিপয় বিদেশী শক্তির নিন্দা

লাহোর, ২০শে আগষ্ট (এপিপি)।- জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা তাকে সেক্রেটারী জেনারেলের কার্যসীমার বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন।

আজ লাহোরে অনুষ্ঠিত মজলিসে সুরার সকালের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "বিশ্বসংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে উথান্ট যে মর্যাদা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন এই বিবৃতির মাধ্যমে তিনি তা নষ্ট করে ফেলেছেন।"

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, উথান্টের উচিত কোনো দেশের প্রভাবে পড়ে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মত বিষয়ে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে সকল সদস্য দেশের আস্থা অর্জন করা।

জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে সুরার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দলের সহকারী প্রধান মওলানা আবদুর রহীম। এতে জামায়াতে প্রধান মওলানা মওদুদীও উপস্থিত ছিলেন।

যে সব বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে তাদের মর্জি মোতাবেক একটি সমাধান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সাহায্যকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, জামায়াতের মজলিসে সুরার অধিবেশনে সে সব দেশের নিন্দা করা হয়।

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার এ ধরনের শর্ত মেনে নিতে পারেন না।

এপিপির অপর এক খবরে প্রকাশ, গতকাল অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরার দ্বিতীয় অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অধিবেশনে ভাষণ দেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক। জামায়াতে প্রধান মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এতে উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর থেকে পিপিআই জানান, ভারতীয় যুদ্ধরাজ ও তাদের চরদের যোগসাজসে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দমন করার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মজলিসে সুরা তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ৫ ভাদ্র ১৩৭৮

শুক্কুরে মওলানা আবদুর রহীমের অভিমত

দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর অর্থহীন

শুক্কুর, ২৮শে আগস্ট (পিপিআই)।- পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ডেপুটি আমীর মওলানা আবদুর রহীম সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, দেশে পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অর্থহীন। তিনি আরও বলেন যে, দেশের পূর্বাঞ্চলে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি।

পূর্বাঞ্চলকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে এটাই বোঝা যাবে যে, ক্ষমতা গ্রহণকারী ও ক্ষমতা হস্তান্তরকারী কেউই দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী নন।

কোনো বেসামরিক গভর্নর নিয়োগের দ্বারা পূর্ণ পাকিস্তানের পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না বলে মন্তব্য করে জামায়াতে নেতা বলেন যে, সুস্পষ্ট কার্যকরী পন্থা

অবলম্বনই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উপায়। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের কোনো সদস্যেরই আন্তরিকতা নেই এবং তাদের আনুগত্য পুনরায় পরীক্ষা করা যেতে পারে না।

মুসলিম লীগের উপদলগুলোর একত্রীকরণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, জাতিকে দেয়ার কোনো পরিকল্পনা মুসলিম লীগের না থাকায় এ একত্রীকরণের দ্বারা কোনো সুফল হবে না।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৯ আগস্ট ১৯৭১

যশোরে ছাত্রনেতা মতিউর রহমান নিজামীর মন্তব্য
অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির জন্য দায়ী

যশোর, ১৪ই সেপ্টেম্বর।- নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামীর আগমনে যশোর ইসলামী ছাত্রসংঘের শহর শাখার উদ্যোগে এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

তিনি গত ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় সংঘ অফিসে এক কর্মী বৈঠকে মিলিত হন এবং বিকেল ৪টায় স্থানীয় বিডি হলে সুধী সমাবেশে ভাষণ দান করেন। এ সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংঘের জেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হক, শহর শাখার সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম। সংঘকর্মী জনাব আজিজুল হকও বক্তৃতা দান করেন।

নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মতিউর রহমান নিজামী তাঁর সারগর্ভ ভাষণে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি যা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক, কিন্তু সবকিছুই অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ কিছুসংখ্যক অপরিণামদর্শী নেতার বল্গাহীন রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। বিগত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আঞ্চলিক দল ও সারা পাকিস্তানভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য ছিল।

তিনি বলেন, সম্প্রতি যারা পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানকে যারা আজিমপুরের গোরস্তান বলে শ্লোগান দিয়েছিল তাদেরকে পাকিস্তানের মাটি গ্রহণ করেনি। তাদের জন্য কোলকাতা আর আগরতলার মহাশ্মশানই যথেষ্ট।

সংঘনেতা জনাব নিজামী ছাত্র সমাজ ও দেশের জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অতীতের এ দুঃখজনক ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য সকল মহলকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমরা কোন জাতি। কিন্তু ৬৫-এর ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত যেদিন পাকিস্তানের পাক ভূখণ্ডে নগ্ন হামলা চালিয়েছিল সেদিন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে রেডিও টেলিভিশন ও জনগণ সরকারীভাবে কলেমা পড়ে মুসলমানিত্বের স্বকীয় ঐতিহ্য স্বীকার করলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ৬ বছরের মধ্যে এত বড় দুর্ঘটনা

ভুলে গিয়ে ১৯৭১ সালে ডেকে আনলাম নিজেদের সর্বনাশ। এদেশের মুসলমানরা ভারতীয় হিন্দু দাদাদের ধোঁকায় পড়ে গেল। এতে শুধু দেশেই নয় বিদেশেও তারা খ্যাতি হারিয়েছে।

জনাব নিজামী উপসংহারে বলেন, দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমরা জীবনের বিনিময়ে যেমনভাবে পাকিস্তানের সেবায় এগিয়ে এসেছি তেমনি সরকারের উচিত হবে আমাদেরকে খাঁটি সৈনিকরূপে গড়ে তোলা। তিনি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে তরুণ ছাত্র সমাজকে সত্যিকার পাকিস্তানী হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় বক্তৃতাকালে জনাব জিয়াউল হক পাকিস্তানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বর্তমান অনৈসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিকট জোর আবেদন জানান।

জনাব নূরুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছি।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারতীয় দালাল ও তাঁর এজেন্টদের পাকিস্তান ধ্বংসের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে নতুন প্রাদেশিক গভর্নরের ঘোষিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার জোর দাবী জানানো হয়েছে।

অপর এক প্রস্তাবে সরকারী অফিস-আদালত থেকে ইসলাম ও পাকিস্তান বিরোধী সকল কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করে খাঁটি দেশপ্রেমিক মুসলমানদের নিয়োগ করার দাবী জানানো হয়েছে।

জনাব মতিউর রহমান নিজামী গত শুক্রবার সকালে যশোর জেলা রেজাকার সদর দফতরে সমবেত রেজাকারদের উদ্দেশে পবিত্র কোরান শরীফের সুরায়ে তওবার ১১১ ও ১১২ আয়াতের আলোকে জাতির এই সংকটজনক মুহূর্তে প্রত্যেক রেজাকারকে ঈমানদারীর সাথে তাদের ওপর অর্পিত এই জাতীয় কর্তব্য সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেককে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান সৈনিক হিসেবে পরিচিত হওয়া উচিত এবং মজলুমকে আমাদের প্রতি আস্থা রাখার মত ব্যবহার করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে ঐ সকল ব্যক্তিকে খতম করতে হবে, যারা সশস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের লিপ্ত রয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৯ ভাদ্র ১৩৭৮

বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গণজমায়েতে অধ্যাপক গোলাম আযম

বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং অধিকার অক্ষুন্ন রেখে বেঁচে থাকতে হলে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতিকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে।

গতকাল শনিবার বায়তুল মোকাররম প্রাংগণে ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট গণজমায়েতে ভাষণ দানকালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম একথা বলেন। ঢাকা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস, জনাব এম. এ. রশীদ, জনাব এ. এইচ. এম. হুমায়ুন ও জনাব মাহবুবুর রহমান গোরহা বক্তৃতা করেন।

দেশে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমি ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম গণসমাবেশে ভাষণ দানকালে জননেতা গোলাম আযম জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য পরিচালিত মিথ্যে প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত নয়। মিথ্যে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আত্মহত্যার দিকে নিজেদের ঠেলে দিতে পারি না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙালি মুসলমানদের যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তা পাকিস্তান হাসিলের পরই হয়েছে। আজাদীপূর্ব যুগের মুসলমানদের করুণ চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংগালী মুসলমানদের ইংরেজ এবং হিন্দুদের যৌথ গোলামীর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত।

ভুট্টো বিচ্ছিন্নতার পথ প্রশস্ত করেছেন

অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান সংকটে পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জনাব ভুট্টো একগুঁয়ে নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতার পথ আরও প্রশস্ত করেন। তেসরা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব পরিষদ সদস্য ঢাকায় আসবেন, তাঁদের ঠ্যাং ভেংগে দেয়ার ফ্যাসিবাদী হুমকি ছেড়ে ভুট্টো গোটা পরিস্থিতিকে সংকটময় করে তুলেছেন বলে জনাব আযম অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, এক দেশে দুটো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরী তুলে এবং দেশের দু-অঞ্চলের ক্ষমতা দুটো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ওপর অর্পণের উদ্ভট দাবী তুলে ভুট্টো বিচ্ছিন্নতার ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। এই দুই আঞ্চলিক নেতার সংকীর্ণ ভূমিকাই দেশকে বর্তমানে সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে জননেতা গোলাম আযম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন। পরিশেষে অধ্যাপক গোলাম আযম জোর দিয়ে বলেন, দেশে একমাত্র বেসামরিক সরকারই স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে পারে। জামায়াত ইসলামী গোটা দেশে বেসামরিক সরকার কায়েমের পথকে সুগম করার জন্যেই শান্তি কমিটির মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ৩০ আশ্বিন ১৩৭৮

আল-বদর বাহিনীর অভিযান
চট্টগ্রামে ৪০ জন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার

চট্টগ্রাম, ১০ই নভেম্বর।- চট্টগ্রামের আল-বদর বাহিনী গতকাল সন্ধ্যায় চাকতাই-এ এক অভিযান চালিয়ে ৪০ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছে। দেশপ্রেমিক জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানকালে চট্টগ্রামে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিলপত্রও আলবদর বাহিনী হস্তগত করে।

এ অভিযানকালে আলবদর বাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের কাছ থেকে ১টি স্টেনগান, ২টি রিভলবার, ৯টি গ্রেনেড, ১টি ইলেকট্রিক ভোল্টেজ টেস্টিং মেশিন, ১টি গুলিভর্তি স্টেনগান ম্যাগজিন, ২০ রাউন্ড রিভলবারের গুলি, ৪৭ রাউন্ড পিস্তলের গুলি, ৪৫ রাউন্ড রাইফেলের গুলী ও ৩ হাজার প্রচারপত্র উদ্ধার করে।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৪ কার্তিক ১৩৭৮

বদর দিবসে বায়তুল মোকাররমের জনসভা
ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা করার আহ্বান

বদরের যুদ্ধে যে নৈতিক বল ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমানরা কাফের বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা করার জন্য এছলামী ছাত্রসংঘ দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

বদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রবিবার বিকালে বায়তুল মোকাররম প্রাংগণে আয়োজিত এক জনসমাবেশে এই আহ্বান জানানো হয়। এছলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শহর এছলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব শামছুল হক। পূর্ব পাকিস্তান এছলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

মোহাম্মদ মুজাহিদ

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন যে, পাকিস্তান এছলামী ছাত্রসংঘ পৃথিবীতে হিন্দুস্থানের কোনো মানচিত্র স্বীকার করে না। এছলামী ছাত্রসংঘ ও আলবদর বাহিনীর কাফেলা দিল্লীতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রসংঘের একটি কর্মীও বিশ্রাম গ্রহণ করিবে না।

প্রসংগক্রমে মোহাম্মদ মুজাহিদ ঘোষণা করেন যে, এখন হইতে দেশের কোনো পাঠাগার, গ্রন্থাগার, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী কোনো পুস্তক রাখা চলিবে না। কোনো স্থান, গ্রন্থাগার ও দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী পুস্তক দেখা গেলে তাহা ভস্মীভূত করা হইবে।

ছাত্রনেতা এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু কিছু লোক এখনও পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী কাজ করিতেছে। জনগণ তাহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছেন।

ইহুদীদের কবল হইতে বায়তুল মোকাদ্দসসহ দখলকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি সমগ্র মোছলেম জাহানের প্রতি আহ্বান জানান।

কাশেম আলী

মীর কাশেম আলী বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, ১৪ শত বৎসর পূর্বে কাফেররা রছুলুল্লাহর উপর যেভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল হিন্দুস্থান ও উহার চররা বর্তমানে পাকিস্তানের উপর সেইভাবে হামলা চালাইতেছে।

তিনি বলেন যে, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত থাকিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৭কোটি মানুষকে হিন্দুস্থানের গোলামে পরিণত হইতে দিবে না।

দৈনিক আজাদ : ২১ কার্তিক ১৩৭৮

প্রদেশব্যাপী বদর দিবস পালিত

পাকিস্তানের বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

রাজশাহী, ৮ই নভেম্বর।-ঐতিহাসিক বদর দিবস উপলক্ষে গতকাল স্থানীয় ভুবন মোহন পার্কে আলবদর বাহিনীর বেসামরিক বিভাগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আলবদর বাহিনী প্রধান জনাব আবদুল হাই ফারুকী।

এক তারবার্তায় প্রকাশ, সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নবনির্বাচিত এম এন এ এডভোকেট আফাজউদ্দীন আহমদ এবং এম পি এ জনাব আয়েন উদ্দীন আহমদ বদরযুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানোর জন্য ভারতের তীব্র নিন্দা করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব আবদুল হাই ফারুকী জনগণকে পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করার কাজে আলবদর সেনাদের সহায়তা করার আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের ঘৃণ্য প্রচারণার নিন্দা ও জনগণকে বদর সেনাদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার নিন্দা করা হয় এবং তা বদলিয়ে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবী করা হয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৩ কার্তিক ১৩৭৮

বদর দিবসের ডাক

যুদ্ধবাজ ভারতের অশুভ পাঁয়তারাকে নস্যাৎ করো

কোটচাঁদপুর (যশোর), ১০ই নভেম্বর (সংবাদদাতা)।- ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় মডেল স্কুলে গত ৭ই নভেম্বর বদর দিবসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম বিজয় এবং তার শিক্ষা ও তাৎপর্যের ওপর বিষদ আলোচনা করেন মাষ্টার মতিয়ার রহমান, জনাব আফছার উদ্দীন ও মওলানা ফজলুল হক প্রমুখ। বক্তাগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে আলবদরের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে সামনে রেখে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিককে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। সভায় যুদ্ধবাজ ভারতের অশুভ পাঁয়তারাকে নস্যাৎ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

চাঁদপুর

ঐতিহাসিক বদর দিবসে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে এক বিরাট ছাত্র জনজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা এর আয়োজন করে। চাঁদপুর কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।

বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা আবদুর রব, আবুল বাসার, নূরুল্লাহ প্রমুখ।

জমায়েত শেষে জনাব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল বের হয়।

পূর্বাহ্নে সকাল ৮টায় স্থানীয় কর্মীরা বদর দিবসের অনুপ্রেরণায় ব্যক্তিগতভাবে শপথ গ্রহণ করে।

টাঙ্গাইল

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, টাঙ্গাইলে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বদর দিবস পালিত হয়। এ উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইল জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়ার যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়।

জনাব আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আবদুল খালেক, হাকীম হাবীবুর রহমান, অধ্যাপক হাবীবুর রহমান, আবদুল্লাহেল ওয়াছেক এডভোকেট, আবদুল জব্বার মোক্তার, এস. এম. রেজা, ডাক্তার আবদুল বাসেত ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বিশিষ্ট জামায়াত কর্মী অধ্যাপক এম. এম. আব্দুল কাদের আলবদরের উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনান।

নেতৃবৃন্দ বদর দিবসে মুসলিম জাতির আজকের দিনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে বক্তৃতা করেন। খোদাদ্রোহী শক্তি তথা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত থাকার জন্য তারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে সমবেত সুধীদের নিয়ে একটি মিছিল বের হয়। এতে 'আলবদর জিন্দাবাদ,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'পাকিস্তানের উৎস কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' প্রভৃতি শ্লোগান সহকারে মিছিলটি জামে মসজিদে গিয়ে শেষ হয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৫ কার্তিক ১৩৭৮

লাহোরে আব্বাস আলী খানের মন্তব্য

ভারত আক্রমণ করলে কোলকাতাও দিল্লীতে ঈদের নামাজ পড়বো

লাহোর, ৮ই নভেম্বর।-পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত সদস্য জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, আমরা আন্তঃঙ্করিতাপূর্ণ দাবী করি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ওপর আমাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে। ভারত যদি পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে আমরা কোলকাতা ও দিল্লীতে ঈদের নামাজ আদায় করবো।

তিনি বলেন, পাকিস্তান কোনো বংশ বা সম্প্রদায়ের মালিকানা নয় বরং এটা উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সম্মিলিত চেষ্টা সাধনার ফল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, এদেশ বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী ও পাঠানদের নয় বরং ইসলামের জন্যই অর্জন করা হবে।

জনাব আব্বাস আলী খান সামানবাদে লাহোর জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রেজাকার বাহিনী ও আলবদর বাহিনীর প্রশংসা করে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না বরং আল্লাহকে ভয় করে। ভারত যদি পাকিস্তানের ওপর হামলা করে তবে তার ভূখণ্ডেই যুদ্ধ সংঘঠিত হবে এবং আমরা কোলকাতা ও দিল্লীতে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করবো। পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৩ কার্তিক ১৩৭৮

বিভিন্ন স্থানে বদর দিবস পালিত

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোনো কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান

গাইবান্ধা, ১১ই নভেম্বর।-গত সোমবার এখানে যথোপযুক্ত মর্যাদার সাথে বদর দিবস পালিত হয়। ইসলামী ছাত্রসংঘের গাইবান্ধা শাখার সভাপতি ও বদর বাহিনীর কমান্ডার জনাব লূৎফর রহমান বদর দিবসের উদ্বোধন করেন। বদর বাহিনী বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বদর বাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাহিনীর

কমান্ডার জনাব লুৎফর রহমান সকলকে পাকিস্তান রক্ষার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে কোনো কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

সকল পাকিস্তানবাদী মুসলমানকে সামরিক ট্রেনিং দানের দাবী

যশোর জেলার মনিরামপুর থেকে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গত রোববার মনিরামপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মওলানা দীন মোহাম্মদ ও জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার যশোর জেলা শাখার সভাপতি শেখ আবদুল মতিন বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রতিটি পাকিস্তানবাদী মুসলমানকে সামরিক ট্রেনিং দিয়ে দেশ ও ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান হয়। ইসলামী শাসন কায়েম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপের দাবী জানিয়ে ও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৭ কার্তিক ১৩৭৮

ঢাকা জামায়াতের প্রস্তাব

দুষ্কৃতিকারীদের চক্রান্ত বানচালের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান

গতকাল সোমবার ঢাকা জামায়াতের মজলিসে সুরার উদ্বোধনী অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক রাজধানী ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, মজলিসের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের হীন চক্রান্ত বানচালের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার বলেন যে, দেশ ও জাতি চরম সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। ঢাকা জামায়াতে ইসলামীর নবনির্বাচিত মজলিসে সুরার উদ্বোধনী অধিবেশনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় সুরার সদস্যদেরকে পরিস্থিতির অনুধাবন এবং অবস্থা অনুসারে নীতি নির্ধারণের আবেদন জানান বলে এপিপির খবরে বলা হয়েছে।

অধ্যাপক সারওয়ার পূর্ব পাকিস্তানকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করার ভারতীয় হীন চক্রান্তকে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধের জন্য পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আশা করেন যে, শত্রুদের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করবে।

মজলিস সাংগঠনিক কাজের ব্যাপক পর্যালোচনা করে এবং জামায়াতের কাজ সম্প্রসারণের জন্য বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করে।

মজলিসের গৃহীত প্রস্তাবে রেজাকারদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র এবং দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষমতাদান করে রেজাকারদের সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান হয়।

প্রস্তাবে বিনা উস্কানিতে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় হামলা পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদী ভারত এসব উস্কানিমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না হলে পাকিস্তানের জনগণ আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় যুদ্ধবাজদের অস্ত্রবলকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে মজলিসে সুরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা
গ্রহণ করতে হবে
-গোলাম আযম

লাহোর, ২৩শে নভেম্বর (এপিপি)। -পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ কৌশল শত্রুকে উৎসাহী ও উদ্যমশীল হতে সাহায্য করে মাত্র।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে এখানে এসে পৌছানোর পর সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোলাম আযম উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, বর্তমান মুহূর্তে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করাই হবে দেশের জন্য আত্মরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকৌশল শত্রুকে উৎসাহী ও উদ্যমশীল হতে সাহায্য করে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে চাইলে পাকিস্তানের পক্ষে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ভারতের সর্বশেষ হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জামায়াত নেতা বলেন, ভারতের এই হামলা নতুন কিছু নয়, কেবলমাত্র নতুনত্ব হচ্ছে এবারকার হামলা আগের চাইতে ব্যাপক। তিনি বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত এমন একটি বিমানবন্দর দখল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে যাতে ভারত "বাংলা দেশের" নামে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে পারে। ভারতীয় হামলার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য অধ্যাপক আযম জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জামায়াত নেতা জানান যে, পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে এবং এর ফলে আসন্ন উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ কষ্টসাধ্য হতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সকল দেশপ্রেমিক, শান্তি কমিটির সদস্য এবং রেজাকারদের উন্নতমানের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য অধ্যাপক আযম দাবী জানান। সাধারণ ক্ষমার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে অধ্যাপক

আযম বলেন, এটা আংশিকভাবে সত্য যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দুষ্কৃতিকারীরা তাহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বমন্ত্রী মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ এবং জামায়াতের সহকারী প্রধান মওলানা আবদুর রহীম ও এখানে এসেছেন।

দৈনিক সংগ্রাম : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

দেশপ্রেমিক জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
-গোলাম আযম

রাওয়ালপিন্ডি, ২৭শে নভেম্বর (পিপিআই)।- পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম জোর দিয়ে বলেছেন যে, শত্রুর হামলার মোকাবেলায় আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নয়, বরং শত্রুর দেশে পাল্টা আক্রমণ চালানোই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা। কোনো জাতি যুদ্ধকালে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়াই টিকে থাকতে পেরেছে এমন কোনো নজীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক গোলাম আযম আজ পিন্ডি আইনজীবী সমিতির এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম ও জাতীয় অখণ্ডতায় বিশ্বাসী জনগণ ভারতের ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে। তারা নিজেদের পবিত্র জন্মভূমির এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমিও ভারতের কবলে যেতে দেবে না। জামায়াত নেতা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সকল শক্তি নিয়োগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছে। খোদা না করুক, পূর্ব পাকিস্তান যদি ভারতের দখলে চলে যায়,তাহলে দেশের অপর অংশও টিকে থাকতে পারবে না।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেন এবং তথাকথিত বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য মওলানা ভাসানী, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উপদলগুলোকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত পদ্ধতিও বিচ্ছিন্নতার পথ সুগম করে দিয়েছে।

অধ্যাপক গোলাম আযম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিচ্ছিন্ন হবার জন্য ভোট দেয়নি। নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী অভিযানে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিল যে, এই দল এক ও শক্তিশালী পাকিস্তানে বিশ্বাসী এবং তারা কোরআন ও সুন্নাহর খেলায় কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।

তিনি বলেন, আসল কথা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভোট দিয়েছিল আরো অধিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য, বিচ্ছিন্নতার জন্য নয়।

দৈনিক সংগ্রাম : ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

সওয়াল : বিদ্রোহ দমনের জন্য কেন সামরিকবাহিনী পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়েছিল? শুরু থেকেই কি এ বিদ্রোহ দমন করা যেতো না?

জওয়াব : ২৫ মার্চ-এর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল এদেশের মাটি রক্ষা করার জন্য, এদেশের জনগণকে রক্ষা করার জন্য।

....এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ণ বিজয় লাভ করেন এবং তথাকথিত বাংলাদেশের সমর্থকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু ২৪ মে করাচীতে প্রেসিডেন্টের সাংবাদিক সম্মেলনের পর তাদের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হয়। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের অধিকাংশই যাদের শেখ মুজিবের আসল উদ্দেশ্য জানা ছিল না। তারা শীগগিরই সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু যখন তারা জানতে পারেন যে, আওয়ামী লীগের পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তারা সহযোগিতা করতে ইতস্তত।

সওয়াল : আপনার মতে বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের কতিপয় পরিষদ সদস্যপদ বহাল করা ছাড়া কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল?

জওয়াব : আমি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী প্রত্যেক দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ এ সাক্ষ্য দেবেন যে এরূপ পরিষদ সদস্যের সংখ্যা কিছুতেই ২০/২১ জনের অধিক হবে না। যারা বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় জড়িত ছিল না এবং নীরবতা অবলম্বন, ভালো-মন্দ না বলাই শ্রেয় মনে করেছে, আমি মনে করি না যে সরকার এ সত্য সম্পর্কে অনবহিত রয়েছেন। পরিষদ ভেঙ্গে দেয়াই ছিল নীতি এবং পরিস্থিতি ও সাহসিকতার তাগিদ। কিন্তু তা না করে যা কিছু করা হয়েছে শিগগিরি তার ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সওয়াল : কতিপয় আওয়ামী লীগ সদস্যের সদস্যপদ বহাল রাখার ব্যাপারে আপনার কি নীতিগত পার্থক্য রয়েছে নাকি এমন কোনো প্রমাণ রয়েছে যাতে বুঝা যায় যে মূলতই তারা দলের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার অংশীদার ছিল?

জওয়াব : নীতিগত পার্থক্য ও রয়েছে। কিন্তু এর প্রমাণ ও রয়েছে যে তাদের অধিকাংশই বিদ্রোহাত্মক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতে রয়েছে এবং সেখানে দুষ্কৃতিকারীদের ট্রেনিং দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে। নামতো অনেকই রয়েছে। যদি সরকার নিজের সূত্রের মাধ্যমে জানতে না পারেন তবে তালিকা ও দেয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আব্দুল মালেক উকিল এবং কুমিল্লার ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর উল্লেখ করছি। এরা ভারতে থেকে দুষ্কৃতিকারীদের ট্রেনিং দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এদের কি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে উপবিষ্ট হওয়ার অধিকার রয়েছে? যাদের কাজ জনগণকে নিশ্চিন্ত করা তারাই যদি এরূপ পদক্ষেপের দ্বারা জনগণকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয় তাহলে যে কি হবে তা আমি বলতে পারি না।

সওয়াল : পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে ও নিকট ভবিষ্যতে কি উপ-নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠবে?

জওয়াব : সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি ও বন্যার কারণে নির্বাচনী অভিযান চলতে পারে না। শেখ মুজিবের মোকদ্দমায় বিলম্ব এবং অধুনালুপ্ত দলের পরিষদ সদস্যদের আসনে বহাল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহস বৃদ্ধি করে দিয়েছে। আমি আশংকা করছি যে, যেখানে সেনাবাহিনী ও রেজাকার বাহিনী নেই সেখানে অংশগ্রহণকারীদের দুষ্কৃতিকারীরা হত্যা করবে, তার বাড়ি-ঘর লুট করবে ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।... কোনো কোনো এলাকায় অবস্থা এরূপ রয়েছে যে পাকিস্তান রেডিও শুনতে দেওয়া হয় না। কোলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ রেডিও অনবরত প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে নিকট ভবিষ্যতে উপ-নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। জামায়াতের নির্বাচনে অংগ্রগহণের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই নেয়া হবে।...

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামায়াতকে মনে করতো পয়লা নম্বর শত্রু। তারা তালিকা তৈরি করেছে এবং জামায়াতের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করছে। তাদের বাড়ী-ঘর লুট করছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এখনো দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও জামায়াতকর্মীরা রাজাকারে ভর্তি হয়ে দেশের প্রতিরক্ষায় বাধ্য, কেননা তারা জানে বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো স্থান হতে পারে না। জামায়াতকর্মীরা শহীদ হতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না।...

শান্তিকমিটিসমূহে যোগদানকারী অন্যান্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেই হত্যার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জামায়াতের সাধারণ কর্মীদের ও ক্ষমা করা হয় না।...

জওয়াব : আমি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে সফর করেছি। আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও জামায়াতকর্মীদের মনোবল অটুট রয়েছে। ২রা আগস্ট খুলনা শান্তিকমিটির অফিসে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, এতে সতের জন আহত হয়েছে। আহদের মধ্যে সাবেক এম.এল. এ প্রাদেশিক জামায়াতের সহকারী আমীর এবং খুলনা শান্তিকমিটির সভাপতি মওলানা ইউসুফ ও মওলানা শামসুর রহমানও রয়েছেন। তাঁরা জামায়াতের মজলিসে সুরার অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য টিকেটও ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু আহত হবার কারণে আসতে পারেননি।

সওয়াল : পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিস্টদের কার্যক্রম ও তাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ এবং সেখানে তাদের প্রভাব কতটা গভীর?

জওয়াব : আইয়ুব খানের সময়ে কম্যুনিস্টদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ হলো যত নেতা সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিত এবং বর্তমানে উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপ ধারণ করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের কবল মুক্ত করা। এরা ময়দানে কাজ

করতে সুদক্ষ। এদের কারণেই গেরিলা তৎপরতা চালু রয়েছে। সরকারি দফতর, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র সর্বত্রই এরা মওজুদ রয়েছে। এরা 'গাইড' হিসেবে রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে।...

সওয়াল : কোনো কোনো মহল বলেন, এবার জামায়াতে ইসলামীর দীর্ঘকালের জন্য নির্বাচনী ফ্রন্ট থেকে দূরে সরে শুধু চিন্তাগত কাজ ও সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত, আপনি কি এর সঙ্গে একমত?

জওয়াব : নির্বাচন জামায়াতের কর্মসূচির একটা অংশ। এটা ছেড়ে আমরা যেন এটাই মেনে নেব যে, ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। মূলত কেউ কেউ আমাদেরকে এ পরামর্শ দিয়ে জ্ঞাতসরে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা করে। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম এবং একটি জীবন ব্যবস্থাই নয়-একটি আন্দোলনও বটে। আমরা জ্ঞানের আন্দোলন এবং কাজের আন্দোলন দুটোই পরিচালনা করি। এ আন্দোলন সকলের নিকট ব্যাপকভাবে পৌছানোর জন্য রাজনৈতিক পথই একমাত্র পথ।

দৈনিক সংগ্রাম -৩-৯-১৯৭১

[আলী আকবর ঢাবী-*সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা*, ঢাকা-২০১১]

আলবদর

আলবদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, আলবদর সেখানেই। যেখানে দুষ্কৃতিকারী আলবদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা অনুপ্রবেশকারীদের কাছে আলবদর সাক্ষাৎ আজরাইল।

২২শে এপ্রিল জামালপুরে পাক-বাহিনীর পদার্পণের পর পরই মোমেনশাহী জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। আলবদর সম্পূর্ণ রূপে একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আল-কোরআনের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত, সত্য ন্যায় ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত পাকিস্তানবাদী এসব তরুণরা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়।

সরলপ্রাণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাবনার চরম মুহূর্তে আলবদর বিশেষ আশ্বাস নিশ্চয়তা নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও ইসলামের হেফাজতে আলবদরের বলিষ্ঠ ভূমিকা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সমূলে উৎখাত করে জনজীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার কার্যকরী ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ জনসাধারণকে শুধু মুগ্ধই করেনি, বরং তাহাদেরকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। জনজীবনে আলবদর তাই সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক।

জামালপুর মহকুমায় এ পর্যন্ত আলবদর ৭টিরও অধিক ক্যাম্প স্থাপন করেছে। বিভিন্ন সময় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সাথে প্রত্যেকটি মোকাবেলায়

শুধু প্রচুর সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীকে হত্যাই করেনি, বরং তাদের অনেককে আটক করেছে, তাদের কাছ থেকে এত বেশি পরিমাণ অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে যা ভাবাই যায় না।

দেওয়ানগঞ্জে আলবদর মুজিব বাহিনীর দুষ্কৃতিকারীদেরকে শুধু প্রতিহতই করেনি, পরাস্তও করেছে। আলবদর নওজওয়ানদের হাতে দুষ্কৃতিকারী নিহত হয় এবং তারা ১১টি রকেট বোমা, ১টি রাইফেল ও মেশিনগানের প্রচুর গুলি রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ইসলামপুরে আলবদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর এক হামলার মোকাবেলায় ৫ জন শত্রুকে হত্যা করে এবং ৬টি হাতবোমা, ১টি রাইফেল, ৮৪ রাউন্ড গুলি, ৬ বাক্স বিস্ফোরক দ্রব্য ও জি.এ. ও রাইফেলসহ ম্যাগজিন, স্ট্যানগান, মর্টার উদ্ধার করে। এখানে জনৈক মুজাহিদ কমান্ডার ও ইসলামপুর থানা কমান্ডের সভাপতি ও তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ক্যাপ্টেন নিহত হয়। ইসলামপুর আলবদর ও ভারতীয় দালাল ভারু দেওয়ানের কাছ থেকে ৩শো ৫০ মণ পাট উদ্ধার করে । এ পাট নৌকাযোগে ভারতে পাচার করা হচ্ছিল।

সরিষাবাড়ীতে আলবদর দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় ১৭ জনকে হত্যা করে ও অসংখ্য আহতকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এখানে একজন দুষ্কৃতিকারীকে ১টি রাইফেল ও মর্টার শেলসহ গ্রেফতার করা হয়।

কালীবাড়ী এলাকায় আলবদর একটি রাইফেল, ৭টি দুই ইঞ্চি মর্টার, ৬টি হাতবোমা ও প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

নান্দিনা ও মেলান্দহ এলাকায় আলবদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে হটে যেতে বাধ্য করে।

জামালপুর শহরে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ৭জন সদস্য আলবদর বাহিনীর কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে এবং আলবদর তিনজন ভারতীয় চরকে এখানে গ্রেফতার করে।

নখলা এলাকায় পাক ফৌজের সহায়তায় আলবদর ২০০ শোরও বেশি অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে এবং ধানুয়া জামালপুরে ৩০০ শোরও অধিক অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা ও ১১৩ জনকে গ্রেফতার করে। এখানে মর্টার, মেশিনগানসহ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। শত্রুর মোকাবেলা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেও আলবদর পিছপা নয়। স্থানীয় আলবদরের কাছ থেকে বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা পাওয়ায় সম্প্রতি জামালপুর মহকুমায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এস.এস.সি এইচ.এস.সি প্রাইমারি টিচার্স ও দাখিল পরীক্ষা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিরুদ্বেগ ও প্রফুল্লচিত্তে এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এ সমস্ত পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই পরীক্ষা চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও দুষ্কৃতিকারীদের সম্ভাব্য

সবরকম হুমকীর মোকাবেলায় আলবদর ট্রেনিং নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তারা বদর বাহিনীতে যোগ দেয়।

স্থানীয় প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ১৯৭১-৭২ সালে কোর্সে ভর্তির জন্য এবার এত বেশি ভীড় হয় যে ১৫০টি সিটের জন্য ৩০০ আবেদনকারীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

আলবদর ও বদর বাহিনী তাই আজ জামালপুরবাসীর কাছে শুধু মুখেই উচ্চারিত নয় আর্শীবাদপুষ্টও। জামালপুর মহকুমার যে কোনো হাট-বাজার-গঞ্জ, স্কুল-কলেজ আজ কলহমুখর-আগের মতোই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। দুষ্কৃতিকারী, অনুপ্রবেশকারী কিংবা ভারতীয় চর সম্পর্কে গ্রামবাসী পর্যন্ত সর্বদা সজাগ। রেললাইন, হল, নদীপথ প্রভৃতি স্থানে আজ তাদের দুর্বার প্রতিরোধ। ভারতীয় অপপ্রচারের জবাবে আজ তাদের কণ্ঠমুখর-জেহাদী প্রেরণায় তার উদ্দীপ্ত।

জামালপুরবাসী তাই আজ আলবদর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু জামালপুর নয় মোমেনশাহীও নয়, সমস্ত প্রদেশই আলবদর আজ উচ্চ প্রশংসিত।

দৈনিক সংগ্রাম -১৪.৯.১৯৭১

বদর দিবস : পাকিস্তান ও আলবদর
-মতিউর রহমান নিজামী

এবারে সতেরই রমজান ইসলামের হারানো স্মৃতি পুনরুজ্জীবনের তারিখ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মত দিন। এই দিনে পাকিস্তানের তরুণ সমাজ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে নতুন করে তুলে ধরেছে বিশ্বের সামনে। এবারে এই দিনে চট্টলা সমুদ্র সৈকত থেকে খাইবারের তুরখাম পর্যন্ত সর্বত্র মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক বদর দিবস। মুসলমানদের দেশ এই পাকিস্তানে এতদিনে আমরা বহু দিবস পালন করেছি, কিন্তু মানবতার মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থক বিজয়ের এ ঐতিহাসিক দিনটিকে আমরা ইতিপূর্বে স্মরণ করতে পারিনি। আমাদের দেশে ঘটা করে লেনিন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মুসলিম জনতার পয়সায় পরিচালিত রেডিও টেলিভিশন ও ট্রাস্টের পত্র-পত্রিকায় বিজাতীয় আদর্শের বীর পূজার অনুষ্ঠানসমূহকে যেরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা বলতেও আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য বলতে হবে এবারে সর্বাত্মক জাতীয় সংকটের মুহূর্তে সতেরই রমজানের যে কর্মসূচী তওহীদি জনতাকে জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো, পারতো গোটা মুসলিম মিল্লাতের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করতে আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চাপা দিতে প্রয়াস পেয়েছে।

বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহের অসহযোগী মনোভাবের ফলে

তা জনগণের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এভাবে সারা পাকিস্তানবক্যাপী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার মুসলমানরা ছিল ভেতরে ও বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের বর্তমান অবস্থা বদর যুদ্ধের পটভূমির সাথে মিলিয়ে দেখলে সম্পূর্ণ অভিন্নই মনে হবে। মক্কার কাফেরদের নিকট মুসলমানদের একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠা যেমন ছিল অসহ্য, অনরূপ পাক-ভারতের বুক চিরে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্রে গঠন এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ হিন্দু ভারত কোনোদিন বরদাশত করতে রাজি হয়নি। তারা যুক্ত ভারতে যুক্ত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন করতে ছিল বদ্ধপরিকর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়াতে তাদের সেই স্বপ্নসাধ চিরতরে নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও তারা হাল ছাড়েনি। ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে গ্রাস করার কথা তারা বহুবার ঘোষণা করেছে।

হায়দ্রাবাদ, মানভাদার, জুনাগড় ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলোতে চোরাপথে হামলা চালিয়ে দখলে নেওয়ার পেছনে উল্লেখিত মানসিকতাই কার্যকর ছিল। তারা একই উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ফ্রন্টে সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছিল। সেই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডকে ভারতের দখলে নেওয়া। ১৯৬৫'র যুদ্ধে মার খেয়ে ভারত পাকিস্তানকে ঘায়েল করার চোরা পথ বেছে নিয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে তারা সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে কিছু দালাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই উপায়ে তারা প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে তারপর সারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে চায়।

তৎকালীন মক্কার কাফেরদের মানসিকতার সাথে যেমন হিন্দুস্তানের মানসিকতার হুবহু মিল রয়েছে তেমনি কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের নিরস্ত্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তবুও ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলমান বীর যোদ্ধারাই সেখানে কাফেরদের পর্যুদস্ত করে ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক বিজয় সূচিত করতে সক্ষম হয়েছে।

হিন্দু বাহিনীর সংখ্যা শক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রে ও তারা পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুসজ্জিত। দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের কিছু মোনাফিক তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদের দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত রয়েছে। তাদের মোকাবেলা করেই তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। শুধু পাকিস্তান রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালিয়েই এ পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না। হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ভারতকে পদানত করেই পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

পাকিস্তানি মুসলমানদের মনে অনুরূপ সংকল্প সৃষ্টি করতে হলে বদরের স্মৃতিকে অবশ্যই সামনে আনতে হবে। বদরের যুদ্ধে যে ঈমানী শক্তি মুসলমানদের বিজয় দান করেছিল সেই ঈমানী শক্তি আমাদের অবশ্যই সঞ্চয় করতে হবে।

বদর যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখবার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকেরা কেউ পেশাদার বা বেতনভুক্ত সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক। তারা সবাই মিলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ঈমানের তাগিদেই তারা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিরাট শক্তির মোকাবিলায়। বৈষয়িক কোনো স্বার্থই ছিল না তাদের সামনে। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী-এই ছিল তাদের বিশ্বাসের আস্থা। ঈমানের পরীক্ষায় তারা সবাই ছিলেন উত্তীর্ণ। সংখ্যায় চেয়ে গুণের প্রাধান্য ছিল সেখানে লক্ষ্যণীয়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের লেশমাত্র ছিল না তাদের মধ্যে।...আজকের কাফেরদের পর্যুদস্ত করতে হলে আমাদের মধ্যে অনুরূপ গুণালবলীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটাতে হবে।

আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতি অবলম্বন করে তারাও তিনশত তেরজন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি আলবদরের তরুণ মর্দে মুজাহীদদের মধ্যে ইনশাল্লাহ্ সেইসব গুণাবলী আমরা দেখতে পাব।

পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে গঠিত আলবদরের যুবকরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছেন, যাদের তেজদৃপ্ত কর্ম তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশব্যাপী তথা দুনিয়ার মুসলমানদের সামনে হারানো স্মৃতি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাল্লাহ্ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে। আর সেদিনই পূর্ণ হবে বিশ্ব মুসলমানের অন্তরের অপূর্ণ আকাঙ্খা।

দৈনিক সংগ্রাম -১৪.১১.১৯৭১

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ প্রাদেশিক ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র-সংঘের প্রাদেশিক সভাপতি জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকে প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেছেন বলে সংঘের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রাদেশিক সাংগঠনিক সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হক ও জনাব মুহাম্মদ আতাউর রহমান হিলালীকে নিযুক্ত করেছেন।

সংঘের প্রাদেশিক মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবেও জনাব আ. আ. মু-মুজাহিদ, জনাব এ কে, এম, আলী, জনাব শামসুল হক ও জনাব মুহাম্মদ নজমুল হককে মনোনীত করা হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম, ৮.৭.১৯৭১

বরিশালে ছাত্র সংঘের উদ্যোগে জনসভা

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার সঙ্কল্প ঘোষণা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বরিশাল, ২রা আগস্ট। এছলামী ছাত্র সংঘ বাকেরগঞ্জ শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তান এছলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মতিয়র রহমান নিজামী এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সর্দার আবদুস ছালাম।

জনাব মতিয়র রহমান নিজামী বলেন, তথাকথিত স্বাধীন বাংলার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ভারতের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়ার ষড়যন্ত্র। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আঞ্চলিকতার তীব্র সমালোচনা করেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার সঙ্কল্পই ঘোষণা করা হয় এবং সেনা বাহিনীর সময়োচিত হস্তক্ষেপের প্রশংসা করা হয়।

দৈনিক আজাদ, ৫.৮.১৯৭১

ছাত্র জনতার বুলন্দ আওয়াজ

পাকিস্তানের দুশমনদের উৎখাত করা হইবেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

২৪তম আজাদী বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গত শনিবার সকাল ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে এক ছাত্র সমাবেশে যে কোন মূল্যে প্রয়োজন হইলে রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানকে রক্ষার এক বজ্র কঠোর শপথ গ্রহণ করা হয়। এছলামী ছাত্রসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই ছাত জমায়েতে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার জনকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এছলামী সমাজ, জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানান হয়।

ঢাকা শহর এছলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শামছুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ছাত্র সমাবেশ গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের পবিত্র জমিন হইতে ভারতীয় চর ও রাষ্ট্র বিরোধীদের সমূলে উৎখাত করার উদাত্ত আহ্বান জানান হয়।

মতিউর রহমান নিজামী

নিখিল পাকিস্তান এছলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মতিউ রহমান নিজামী পাকিস্তান আন্দোলন ও এদেশে এছলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বীর শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বক্তৃতা শুরু করেন।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান একটি আদর্শের নাম। সেই আদর্শ হইতেছে এছলাম। তিনি বলেন যে, রক্তের বিনিময়ে প্রমাণ করিয়া দিব যে কোন বিদেশী চর পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানিতে পারিবে না।

এছলামী ছাত্রসংঘ প্রধান ভাব গম্ভীর কণ্ঠে বলেন যে, কেবলমাত্র পাকিস্তান নহে, সমগ্র মোছলেম জাহান আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একদিকে এছরায়েলী এহুদীবাদ অপর দিকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ, মোছলেম জাহানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, আমরা প্রমাণ করিয়া দিবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ মালেকের উত্তরসুরী রহিয়াছে।

তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের উপর্যুপরি চক্রান্তের ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকদের বাছিয়া নিয়া ৬ দফা কর্মসূচী দেয়। এই ৬ দফা শেষ পর্য্যন্ত জয় বাংলা ও তথাকথিত বাংলাদেশ এ রূপান্তরিত হয়। খোদার রহমতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাহাদের এই চক্রান্ত নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আবার তাহারা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করার অপচেষ্টায় মাতিয়াছে।

তিনি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, এবার যুদ্ধ হইলে দুই ফ্রন্টেই যুদ্ধ হইবে। আমরা ভারতের উপর সিংহের ন্যায় ঝাপাইয়া পড়িব এবং তাহাদে যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটাইয়া দিব।

শর্ত্ত যুক্ত ঋণ প্রত্যাখ্যান করা হইবে– এই মর্মে প্রেসিডেন্ট যে ঘোষণা দিয়াছেন, নিখিল পাকিস্তান এছলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি উহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট প্রতিটি খাঁটি পাকিস্তানী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকের মনের প্রতি ধ্বনিই করিয়াছেন।

নূরুল ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান এছলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম বলেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস রক্ত ঝরার ইতিহাস। কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তান হাছেল করা হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুইশত বৎসর পর্যন্ত উপমহাদেশের মুছলমানদের শোষণ করিয়াছে। এই শোষণের হাতিয়ার ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় চরদের অনুপ্রবেশ, পাকিস্থানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাংগিয়া দেওয়ার হিন্দুস্তানী, চক্রান্ত ও ফরাক্কা বাধ নির্মাণের কঠোর সমালোচনা করেন।

ছাত্র নেতা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী মুছলমানদের গোলামে পরিণত করার জন্য জয় বাংলা শ্লোগান তোলা হইয়াছিল এবং বাংগালী জাতীয়তাবাদের উম্মাদনা সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

শওকত ইমরান

উদীয়মান তরুণ ছাত্র নেতা ঢাকা শহর এছলাম ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা শওকত ইমরান অনলবর্ষী বক্তৃতায় বলেন যে, আজ ২৪ তম আজাদী বার্ষিকী। আজ নিছক আনন্দের দিন নহে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হামলাকে প্রতিহত করার জন্য আজ আমাদের অগ্নি শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

বক্তৃতা শেষে সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে মওলানা মোস্তফা আল মাদানী ভারতীয় চরের গুলীতে শাহাদৎ বরণ করায় গভীর শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং তাহার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

ছাত্র মিছিল

সমাবেশ শেষে ছাত্ররা মিছিল সহকারে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। তাহারা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "কায়েদে আজম জিন্দাবাদ", "ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ খতম কর, "হিন্দুস্থানী চরদের উৎখাত কর' প্রভৃতি শ্লোগান দেয় ও উক্ত শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড বহন করে। মিছিলটি বায়তুল মোকাররমে সমাপ্ত হয়।

জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া

গতকাল সকালে এছলামী একাডেমীতে পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া এই সেমিনারের আয়োজন করে।

অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আখতার ফারুক ও ডক্টর মোহর আলী সেমিনারে বক্তৃতা করেন। তাহারা পাকিস্তানে সত্যিকার এছলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানান। সম্মিলিতভাবে ভারতীয় হামলার মোকাবেলার জন্য তাহারা দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

আজাদী দিবস উপলক্ষে এ ছাত্রসংস্থা কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে।

দৈনিক সংগ্রাম, ১৬.৮.১৯৭১

২৬ জনের আত্মসমর্পণ

আল বদর বাহিনী ১৩ জন দুষ্কৃতিকারীকে আটক করেছে

নলিতাবাড়ী আলবদর বাহিনী গত ২৫ শে আগস্ট থেকে ৩০ শে আগস্ট পর্যন্ত ১৩ জন দুষ্কৃতিকারীকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এদের মধ্যে 'মোমেনশাহী জেলা স্কুলের একজন শিক্ষক, একজন এম এ ও একজন বি এস সিও রয়েছে।

উক্ত সময়ের মধ্যে ২৬ ব্যক্তি আল বদর শিবিরে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাছাড়া ঐ একই সময়ের মধ্যে উক্ত বাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের কাছ থেকে দুটো অটোমেটিক রাইফেল, তিনটা রাইফেল, ১৩টি ম্যাগজিন, একটা হালকা মেশিন গানের ম্যাগজিন, একটা টেলিফোন, একটা ডামি রাইফেল, ১৭টি চার্জর, ২২টি হাত বোমা ও ১শোটি চর্ট লাইট বাল্বের উদ্ধার করেছেন।

দৈনিক সংগ্রাম, ১.৯.১৯৭১

গফরগাঁয়ে আল-বদর বাহিনী গঠিত

গতকাল বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গফরগাঁওয়ের আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়েছে। এতদুপলক্ষে এখানে এক সভার আয়োজন করা হয় এবং তাতে স্থানীয় শিক্ষক, ছাত্র, যুবক, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যবর্গসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মওলানা আনিসুর রহমান মুর্শিদাবাদী বক্তৃতায় আল-বদর বাহিনীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং আল-বদর বাহিনীর দেশপ্রেমিক যুবকদের দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংঘের নেতা জনাব মুহীউদ্দিন ও ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্র সংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান।

দৈনিক পাকিস্তান, ৬.৯.১৯৭১

রেজাকার ও মুজাহিদদের সফল অভিযান
প্রদেশের বিভিন্নস্থানে বহু দুষ্কৃতিকারী নিহতঃ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আটক

গত বৃহস্পতিবার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত আকমলপুর গ্রামের একটি বাড়িতে স্থানীয় মুজাহিদ বাহিনীর ও রেজাকার বাহিনীর জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে ৩ জন ভারতীয় চরকে খতম করেছেন এবং বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছেন।

নিহতদের মধ্যে চরদের অধিনায়কও ছিল। এই অধিনায়কের নাম জনৈক নূর মোহাম্মদ বলে জানা গেছে।

দেশপ্রেমিক জনগণের কাছ থেকে ভর পেয়ে মুজাহিদ ও রেজাকার বাহিনীর লোকেরা এই অভিযান পরিচালনা করেন। উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের ওপর ভারতীয় চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

'আল বদর' বাহিনীর কৃতিত্ব

'আল বদর' স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর জওয়ানরা সপ্রতি মোমেনশাহী থেকে প্রায় ১০ মাইল দূর মুক্তাগাছা থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান বলে জানা গেছে।

এপিপি জানান, এই অভিযানে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী নিহত হয়েছে এবং ৪টি রাইফেল ও ১ শো ৮৮ রাউণ্ড গুলী 'আল-বদর' বাহিনীর লোকেরা উদ্ধার করেছেন।

বরিশালে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী নিহত

বরিশাল থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গত রোববার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী বাকেরগঞ্জ থানা। রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে হামলা চালালে কর্মরত পুলিশের জওয়ানরা তাদেরকে প্রতিহত করেন। ফলে সংঘর্ষে ৩/৪ জন দুষ্কৃতিকারী নিহত ও অনেকে আহত হয়। ডিএসপি জনাব জোনাব আলী এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন যে, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করে। উল্লেখ্য যে, জনাব জোনাব আলী দুষ্কৃতিকারীদের আড্ডা খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

নেত্রকোনায় ৪৫ জন অনুপ্রবেশকারী নিহত

নেত্রকোনা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, স্থানীয় দেশপ্রেমিক লোকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সশস্ত্র বাহিনীর একটি গ্রুপ গত ২৯ শে আগস্ট নেত্রকোনা মহকুমার মদন থানার অদূরে এক গ্রামে দ্রুত গমন করে এবং ২০ জন ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে ও বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। সশস্ত্র বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছামাত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা গুলী বর্ষণ শুরু করে। তখন সশস্ত্র বাহিনীও পাল্টা গুলি নিক্ষেপ করে। এতে ২০ জন ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী নিহত হয় এবং অন্যরা পলায়ন করে। সশস্ত্র বাহিনী পরে থানা তল্লাশী করে অনুপ্রবেশকারীদের বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করে এবং ১ মণ ঘি সহ প্রচুর খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করে। এসব খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেটে ভারতীয় ছাপ বিদ্যমান ছিল।

সশস্ত্র বাহিনী শত্রুদের দুটি বড় বড় দুটি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। সশস্ত্র বাহিনী গত শনিবার সুনামগঞ্জ মহকুমার ধর্মপাশা থানার নিকটবর্তী এক স্থানে হানা দিয়ে ২৫ জন ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে।

দৈনিক সংগ্রাম, ৮.৯.১৯৭১

ছাত্র সমাবেশে মতিউর রহমান নিজামী
পাকিস্তানের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগই বর্তমানে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব

পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রধান জনাব মতিউর রহমান নিজামী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাদের স্থানীয় দালালরা দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করার জন্য যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকরাই তাদের কার্যকারীভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম।

ছাত্রনেতা নিজামী গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় আলীয়া মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্রসংঘ কর্তৃক আয়োজিত এক চা-চক্রে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী।

ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রধান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, বর্তমান অবস্থা আর যুদ্ধকালীন অবস্থার সাথে কোন পার্থক্য নেই। আমরা ভেতর ও বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। তিনি বলেন, এখন কথার সময় নেই প্রয়োজন শুধু কাজের। অতীতেও ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে পাকিস্তানের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগই হচ্ছে সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী।

তিনি বলেন বর্তমান সঙ্কটের ফলে একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যারা ইসলামকে ভালবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালবাসে। এই বারের উদঘাটিত এ সত্যটি যাতে আমাদের শাসক রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। চালানোর জন্য তিনি সবাইর প্রতি আহ্বান জানান।

ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রধান বলেন, পাকিস্তান যে ইসলামকে বাদ দিয়ে টিকে থাকতে পারে না এটা নেতৃবৃন্দকে উপলব্ধি করতে পারলেই পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করার পথে সত্যিকারের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, গত ২৪ বছরে প্রতিটি সরকারই মাদ্রাসা ছাত্রদের সবচাইতে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে। অপরপক্ষে সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সাধারণভাবে পাকিস্তানকে ধবংস করার কাজে সবচাইতে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছে। অপর দিকে চরম অবহেলিত মাদ্রাসা ছাত্ররাই একবাক্যে পাকিস্তানের জন্য জান দিতে এগিয়ে এসেছে। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামীকরণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন।

দৈনিক সংগ্রাম, ২৪.৯.১৯৭১

ছাত্র সংঘ নেতার বিবৃতি

রেজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ

রেজাকারদের ভূমিকা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের অস্থায়ী সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ জনা ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতি মাহমুদের তীব্র সমালোচনা করেন বলে গত বুধবার পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য আজ এগিয়ে এসেছে এবং রেজাকার ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসাবে জাতির সেবা করছে।

অথচ সাম্প্রতিক লক্ষ্য করা গেছে যে, কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যেমন জনাব জেড এ ভুট্টো, কাউসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রেজাকার এবং অন্যান্য দেশহিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করেছেন।

ছাত্রসংঘ নেতা বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, যখন আমাদের দেশপ্রেমিক যুবকেরা তাদের সময় অর্থ এবং এমন কি জান কোরবানী দিচ্ছেন সে সময় এসব রাজনৈতিক নেতা বিলাসবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করে আপত্তিকর মন্তব্য, বিবৃতি ও অন্যান্য কার্যকালাপের মাধ্যমে সকল দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী নাগরিকদের নিন্দা করেছেন এবং সেই সংগে তাদের নিরুৎসাহিত করছেন।

সুতরাং এসব নেতার এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার এবং এ ব্যাপারে কঠো মনোভাব গ্রহণ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

পরিশেষে ছাত্রসংঘ নেতা ক্লাসে যোগদানের জন্য এবং সেই সঙ্গে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য দেশহিতৈষী ছাত্রদের প্রতি আবেদন জানান।

দৈনিক সংগ্রাম, ১৫.১০.১৯৭১

জামালপুরে ছাত্রসংঘ সভা

ছাত্রদের প্রতি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে যাওয়ার আহ্বান

সম্প্রতি জামালপুরে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের এক কর্মী সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন ছাত্র নেতা মুহাম্মদ আবদুর বারী।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব আবদুল মান্নান, আবদুল হক, এম, পাহলোয়ান ও আল বদর কমান্ডার কামরান।

জনাব সভাপতি তাহার বক্তৃতায় বলেন, আজ আমাদের একথার প্রমাণ দিতে হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ছাত্রগণ একই সারিতে কাতারবদ্ধ। তাহারা পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তিনি ভারতের সাম্রাজ্যবাদী, পাকিস্তান বিদ্বেষী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি দেশও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ছাত্রদেরকে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক আজাদ, ২০-১০-১৯৭১

বিভিন্ন স্থানে রাজাকারদের তৎপরতা

শান্তিকামী নাগরিকদের জীবন রক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত রাজাকারদের 'আল-বদর' ও 'আল শামস' শাখা আজ রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া জেলায় ৫ জন ভারতীয় চরকে নিহত করে। রাজাকারদের 'আল বদর' পার্টি রাত্রিকালে টহলদারী কার্য্যে নিয়োজিত থাকার সময় সকালে ভারতীয় চরকে রাজশাহী জেলার মরাগ্রাম রেল সেতুর নিকট ডিনামাইট স্থাপনের চেষ্টা করিতে লক্ষ্য করে এবং

তাহারা রাজাকারদের দেখিয়া প্রতিরোধ চালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু বীর রাজাকারগণ ভারতীয় অনুচরদের প্রতিহত করে। দুইজন ভারতীয় চর তাহাদের হাতে নিহত হয় এবং অপর দুইজন পালায়ন করে। রাজাকারগণ পানি হইতে রাইফেল উদ্ধার করে এবং ব্রিজ হইতে ডিনমাইট চার্জ অপসারণ করে।

রংপুরে দারাগঞ্জে ভারতীয় চরদের সহিত রাজাকারদের অপর একটি সংঘর্ষ হয়। উহার ফরে রাজাকারদের হাতে ৩ জন ভারতীয় চর নিহত হয় এবং রাজাকারগণ ২টি রাইফেল ও তিনটি শর্টগান উদ্ধার করে। উক্ত এলাকায় ভারতীয় চরগণ টেলিফোন লাইন অপসরণের চেষ্টা করিলে রাজাকারদের সহিত সংঘর্ষ বাধে।

রংপুর হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে রাজাকারদের আল শামস গ্রুপ বড়খাতার নিকট গোপন অস্ত্রগার খুজিয়া বাহির করে এবং ১৫০ রাউন্ড বিস্ফোরক, ৩৯টি মাইন এবং ১১৮টি গ্রেনেডে উদ্ধার করে।

বগুড়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, রাজাকারদের আল বদর গ্রুপ জানিতে পারে যে, একদল ভারতীয় চর অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া আদমদীঘির নিকট শান্তি কমিটির একজন সদ্যসের গৃহের নিকট গমন করিতেছে। রাজাকারগণ তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে গমন করে এবং অল্পক্ষণ ধরিয়া গুলী বিনিময়ের পর দুইজন ভারতীয় চরকে আটক করে। তাহাদের মধ্যে একজনের পা বুলেটের আঘাতে জখম হইয়াছিল।

দৈনিক আজাদ, ১৮-১১-১৯৭১

রাজাকারদের সাফল্যজনক অভিযান

পিরোজপুর, ৪ঠা নভেম্বর

মহকুমার নাজিরপুর থানার রাজাকাররা থানা পুলিশের সাহায্যে সাতকানিয়ায় এক দল ভারতীয় চরের সঙ্গে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে। সংঘর্ষে ৪ জন ভারতীয় চর নিহত হয়েছে এবং একজন ভারতে তৈরী একটি স্টেনগান, একটি রাইফেল ও দুটো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সহ ধরা পড়েছে বলে এক সরকারী হ্যান্ডআউটে প্রকাশ।

ভারতীয় চর লুৎফর রহমান জানায় যে তাদের ভারতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, রাজাকাররা দ্রুত অভিযান চালিয়ে বান্দরবন এলাকা থেকে ভারতীয় চরদের নির্মূল করেছে।

তারা দু'জন ভারতীয় চরকে হত্যা ও দু জনকে বন্দীও করেছে। এছাড়া তারা ভারতে তৈরী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও উদ্ধার করেছে।

এসব ভারতীয় চর স্থানীয় লোকদের হয়রানি করছিল– দিচ্ছিল ও সম্পত্তি লুট করছিল।

সিলেট থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রাজাকারদের আল-শামস বাহিনী সুনামগঞ্জের উত্তর পশ্চিম এলাকার টহল দেয়ার সময় দুটো সন্দেহজনক নৌকাকে চ্যালেঞ্জ করলে আরোহীরা তাদের প্রতি গুলি ছুড়তে শুরু করে। ফলে একজন রাজাকার আহত হয়।

রাজাকাররা সাথে সাথে পাল্টা গুলি চালালে নৌকার আরোহীরা পানিতে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের ৪ জন নিহত হয়। রাজাকাররা নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

ভৈরব বাজার থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আল-বদর বাহিনী ভৈরব বাজার থেকে ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে শিমুলকান্দিতে ভারতীয় চরদের গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে ৬টি রাইফেল, ৪টি স্টেনগান, ৮টি বেয়নেট ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে। ভারতীয় চররা রাজাকারদের দেখা মাত্র আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে বলা হয়েছে যে রাজাকাররা বিদ্যাকোটের কাছে ভারতীয় চরদের সাথে এক সংঘর্ষে ৩ জনকে হত্যা করেছে। অপর ৫ জন অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে।

দৈনিক পাকিস্তান, ৫-১১-১৯৭১

খুলনায় আল-বদর বাহিনীর শপথ অনুষ্ঠিত

খুলনা জেলায় নবগঠিত আল-বদর বাহিনী শপথ অনুষ্ঠান গত রোববার এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, শান্তি কমিটির সদস্য এবং খুলনার ডেপুটি কমিশনারসহ অনেক উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, জেলা আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার জনাব সিদ্দিক জামাল, মহকুমা কমান্ডার জনাব এ কে এম ফারুকী ও জনাব আনসার উদ্দীন প্রমুখ।

বক্তাগণ বদরের গৌরবময় বিজয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলমানরা বিপুল প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও কাফেরদের ওপর বিজয় লাভ করে। তারা পাকিস্তানের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাকে বদরের মুজাহিদদের অবস্থার সাথে তুলনা করেন।

দৈনিক সংগ্রাম, ৫-১১-১৯৭১

রেজাকারদের হাতে ৫ জন ভারতীয় চর খতম

রেজাকার সংগঠনের দুটি শাখা আল-বদর এবং আশ-শামস রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া জেলায় বিভিন্ন সংঘর্ষে ৫ জন ভারতীয় চরকে হত্যা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বলে এপিপির খবরে প্রকাশ।

'আশ-শামস' শাখার রেজাকারদের একটি দল রাজশাহীতে রাত্রিকালীন প্রহরার সময় কিছুসংখ্যক ভারতীয় চরকে মরাগ্রাম রেল সেতুটি উড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিনামাইট স্থাপনে চেষ্টারত অবস্থায় দেখতে পায়। রেজাকারদের দেখা মাত্র দুষ্কৃতিকারীরা হামলা চালানোর প্রস্তুতির নেয়। কিন্তু অসীম সাহাসী রেজাকাররা পাল্টা আক্রমণ করলে দু'জন ভারতীয় চর নিহত হয় ও অন্যান্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে

রেখে পালিয়ে যায়। পরে রেজাকাররা পানি থেকে কতকগুলো রাইফেল উদ্ধার করে এবং সেতুতে পেতে রাখা মাইনটি তুলে নেয়।

রংপুরের দরোগঞ্জে ভারতীয় চরদের সাথে একটি সংঘর্ষে রেজাকাররা ৩ জন ভারতীয় চরকে হত্যা করে ২টি রাইফেল এবং ৩টি শর্ট গান উদ্ধার করে। দুষ্কৃতিকারীরা স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

রংপুর থেকে পাওয়া অপর এক খবর জানা গেছে যে, আল-শামস দলীয় রেজাকাররা বড়খাতা অঞ্চলের একটি ময়লা ফেলা জায়গার মাটির নিচ থেকে ১ শ ৫০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য, ৩৯টি মাইন এবং ১শ ১৮টি গ্রেনেড উদ্ধার করে।

বগুড়ায় 'আল-বদর' রেজাকারদের একটি দল গোপনসূত্রে খরব পায় যে, কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী তাদের কুমতলব হাসিলের জন্য শান্তি কমিটির জনৈক সদস্যের বাড়িতে যাচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্র দেশপ্রেমিক রেজাকাররা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দুষ্কৃতিকারীদের সাথে কিছু গুলী বিনিময়ের পর ২ জন ভারতীয় চরকে বন্দি করে। বন্দিদের ১ জনের পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়।

দৈনিক সংগ্রাম, ৫-১১-১৯৭১

বিভিন্ন স্থানে রেজাকারদের সফল অভিযান
১৭ জন ভারতীয় চর নিহত : ৬টি স্টেনগান উদ্ধার

ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বান্দরবন এলাকায় ভারতীয় চরদের উপদ্রবের খবর পেয়েও জনসাধারণেও অনুরোধক্রমে রেজাকাররা উক্ত এলাকায় অভিযান চালান। এতে দশজন ভারতীয় এজেন্ট নিহত এবং দুজন ধৃত হয়। অভিযানকালে রেজাকাররা দুষ্কৃতিকারীদের গোপন আড্ডা থেকে ভারতীয় চিহ্নযুক্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করেন। এপিপি আরও জানিয়েছেন যে, ধৃত ভারতীয় চরদ্বয় তাদের সাথী কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর সন্ধান প্রদান করে। তখন আরও কতিপয় আড্ডায় হানা দিয়ে ভারতীয় চরদেরকে পর্যুদস্ত করা হয়। একটি রাইফেল ও একটি স্টেনগানসহ বহু গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

সিলেট থেকে পিপিআইর এক খবরে প্রকাশ, রেজাকারদের আল-শাম্স শাখা বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে এক এলাকায় টহলদানকালে তাহেরপুরের নিকট দুটো নৌকাকে সন্দেহজনভাবে চলতে দেখেন। নৌকারোহীদের পরিচয় জানার জন্য তাঁরা নৌকার কাছে এগিয়ে গেলে আরোহীরা তাঁদের ওপর গুলীবর্ষণ করে। ফলে, একজন রেজাকার আহত হন। অবিলম্বে তারা আরোহীদের আক্রমণ করেন। কয়েক রাউণ্ড গুলীবর্ষণের পর দুষ্কৃতিকারী আরোহীরা প্রাণের ভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের ৪ জন নিহত হয়।

নৌকা থেকে উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নৌকারোহী লটি নিকটবর্তী এলাকার তাদের সহযোগীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসছিল।

দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে খবর পেয়ে রেজাকারদের আল-বদর বাহিনী ভৈরব বাজারের তিন মাইল উত্তর পূর্বে শিমুলকান্দিতে ভারতীয় চরদের এক গোপন আড্ডায় হানা দেয়। তাঁরা ৬৪টি স্টেনগান, ৮টি বেরোনেট ও তিন হাজার রাউন্ডের ও বেশী গুলী উদ্ধার করেন। রেজাকারদের আগমনের আঁচ পেয়েই ভারতীয় চরেরা আড্ডা ছেড়ে পালায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রাপ্ত অপর এক খবরে জানা যায় যে, বিদ্যাঝোটের নিকট রেজাকার ও ভারতীয় চরদের এক সংঘর্ষে তিনজন চর নিহত হয়। বাকী পাঁচজন চর আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের রাইফেল ও কয়েক ব্যাগ হাত বোমা রেজাকারদের দিয়ে দেয়।

এক সরকারী হ্যান্ড আউটে প্রকাশ, পিরোজপুর মহকুমার নাজিরপুর থানার রেজাকাররা পুলিশের সহায়তায় একদল ভারতীয় চরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ভারতে তৈরী একটি ষ্টেনগান একটা রাইফেল ও অন্য দুটো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ভারতীয় চর লুৎফর রহমান বলেন যে, ভাতীয় সেনাবাহিনী তাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে।

দৈনিক সংগ্রাম, ৬-১১-১৯৭১

কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলায়

আল-শামস ও আল বদর বাহিনীর সফল অভিযান

আজ রাজাকার বাহিনীর "আল শামস" ও "আল-বদর" গ্রুপ কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলায় দুইটি সাফল্যজনক অভিযান চালায়।

তাহারা ১৮৫০ রাউণ্ড গুলীসহ ১০টি রাইফেল, অস্ত্রশস্ত্রের ১১টি ম্যাগাজিনসহ ২টি ষ্টেনগান, ৯৫টি গ্রেনেড এবং ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করিয়াছে।

কুমিল্লা হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, আল-শামস রাজাকারগণ জানিতে পারে যে, একদল ভারতীয় চর শান্তিকামী নাগরিকদের হয়রানী করার জন্য কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের দক্ষিণে গুলসিয়া গ্রামের দিকে আসিতেছে। রাজাকারগণ পূর্বাহ্নেই উক্ত গ্রামে উপস্থিত হয় এবং ওত পাতিয়া থাকে। ভারতীয় চরগণ উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইলে রাজাকারগণ তাহাদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদের ৫ জনকে হত্যা করে।

দৈনিক আজাদ, ৭-১১-১৯৭১

আল-শামস ও আল বদর বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান

রেজাকারদের বাহিনীর "আল শামস" ও "আল-বরদ" শাখা গতকাল শনিবার কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলায় দু'টি সাফল্যজনক অভিযান চালিয়েছে। এপিপি পরিবেশিত খবরে গতকাল একথা জানানো হয়।

তারা এ দুটি অভিযানে ৫ জন ভারতীয় চরকে খতম করে এবং ১৮'শ ৫০ রাউণ্ড গুলীসহ ১০টি রাইফেল, ১১টি ম্যাগাজিন গুলীসহ ২টি স্টেনগান, ৯৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য আটক করে।

কুমিল্লা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় চরদের কয়টি দল কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের দক্ষিণে গুলসিয়া গ্রামের দিকে যাচ্ছে বলে আল শামস বাহিনীর রেজাকাররা জানতে পারে। রেজাকাররা আগেই সে গ্রামে পৌঁছে লুকিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ভারতীয় চররা গ্রামের কাছাকাছি এসে গেলে রেজাকাররা তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের ৫ জনকে হত্যা করে। ভারতীয় চরদের অন্যান্যরা ৩৭৫ রাউণ্ড গুলীসহ ৩টি রাইফেল, ১১ ম্যাগাজিন গুলীসহ ২টি স্টেনগান ও ৬০টি হাতবোমা ফেলে পালিয়ে যায়।

রাজশাহী থেকে পাওয়া অপর একটি খবরে জানা যায় রেজাকাররা গতকাল শনিবার রাজশাহী জেলার নওগাঁর ১০ মাইল দক্ষিণে চৌধুরী ভবানিপুরের কাছে ভারতীয় চরদের এক গোপন আড্ডায় হানা দেয়। ভারতীয় চররা রেজাকারদের আগমনের খবর পেয়ে রেজাকারদের এখানে পৌঁছানোর আগেই ১৪'শ ৭৫ রাউণ্ড গুলীসহ ৭টি রাইফেল, ও ৩৫টি হাতবোমা ও ১৩০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলে পালিয়ে যায়।

দৈনিক সংগ্রাম, ৭-১১-১৯৭১

আল বদর বাহিনীর সফল অভিযান
কিশোরগঞ্জে ১১ জন ভারতীয় চর গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জে আল বদর বাহিনীর জওয়ানরা ভারতীয় চরদের দুটি আড্ডায় অবিযান চালিয়ে তাদের ১১ জনকে গ্রেফতার করেছেন বলে গত শুক্রবার আল বদর বাহিনীর একজন মুখপাত্র তার যোগে জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ভারতীয় চর ও দুষ্কৃতিকারীরা মোমেনশাহী জেলার কিশোরগঞ্জ শহর ও তার উপকণ্ঠে গোপন আড্ডা স্থাপন করে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর মতলবে ছিল। এ খবর পেয়ে আল বদর বাহিনীর জওয়ানরা গত বুধবার শহরের এক আড্ডায় অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে ৪ জন দুষ্কৃতিকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন।

দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় গত শুক্রবার শহর হতে দেড় মাইল দূরে। ভারতীয় চরদের একটি দল সেখানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল

ইসলামের বাড়ীর কাছে আড্ডা গেড়ে বসেছিল। তড়িৎগতি সম্পন্ন বদর বাহিনীর জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে সেই আড্ডা হতে ৭ জনকে গ্রেফতার করেন। তাদের কাছে রাইফেল, হাতবোমা ও অনেক বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গেছে।

পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল এদের ভেতর ৩ জন স্বীকার করে যে, তারা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর মতলব নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল। উল্লেখ্য যে, আল-বদর বাহিনী মোমেনশাহী ও কিশোরগঞ্জসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সাথে দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে দুষ্কৃতিকারীদের ভেতর ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, বরিশাল ও দিনাজপুর জেলায় গতকাল শুক্রবার রেজাকাররা সাফল্যজনকভাবে ভারতীয় চরদের আড্ডায় হানা দিয়ে তাদের ৫ জনকে হত্যা করেছে। তারা বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য ও উদ্ধার করে।

বরিশালের এক খবরে প্রকাশ রেজাকারদের 'আল-শামস' গ্রুপ দেশপ্রেমিক নাগরিকদের নিকট থেকে খবর পেয়ে বরিশাল জেলার ভেতর গৌরনদী ধান-ডোবার নিকট ভারতীয় চরদের একটি আড্ডায় হানা দেয়। আড্ডার নিকটবর্তী হলে একদল ভারতীয় চরের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ৫ জন চর নিহত হয়। একজন রেজাকার সামান্য আহত হন। তারা উক্ত আড্ডা থেকে ৩টি রাইফেল ২৫ শো রাউণ্ড গুলী ৭০টি বোমা ও প্রায় ৫০ পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

দিনাজপুর থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, আল বদর বাহিনী কয়েকটি গাছ-পালার নিকট বসা একদল লোককে চ্যালেঞ্জ করেন। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের গুদাম ছিল। প্রহরারত এ সমস্ত ভারতীয় চরের সাথে এক সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর আল-বদর বাহিনীর জওয়ানরা ১৫ হাজার ছোট অস্ত্রশস্ত্র, ৩৫০টি মাইন, ২২০টি বোমা এবং প্রায় ৫ শো পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

দৈনিক সংগ্রাম, ৭-১১-১৯৭১

শামস ও বদর বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসিকতয় ভারতীয় চরেরা নাজেহাল

রেজাকার বাহিনীর আল-শামস ও 'আল-বদর' দল গতকাল রোববার বিভিন্ন স্থানে প্রবল বিরোধিতার মুখে উল্লেখযোগ্য বীরত্ব প্রদর্শন করে।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে এপিপি একথা জানান।

দিনাজপুর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, পশ্চিম দিনাজপুরের মহেষপুর এলাকায় টহল দেয়ার সময় আর শামস বাহিনীর একটি দল গতকাল ভারতীয় অনুচরদের একটি দলের মোকাবিলা করে। ভারতীয় অনুচরেরা অশুভ

উদ্দেশ্যে নিকটস্থ গ্রামে প্রবেশ করছিল। ভারতীয় অনুচরেরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করলে রেজাকাররা পাল্টা গুলী ছুঁড়ে। ১৫ মিনিট যাবত তাদের মধ্যে গুলী বিনিময় হয়। এ সময় কিছুসংখ্যক রেজাকার ভারতীয় অনুচরদের সামনে থেকে ব্যস্ত রাখে এবং আর কিছু রেজাকার তাদেরকে পাশ থেকে ঘিরে গুলী ছুঁড়ে।

ভারতীয় অনুচরেরা তাদের পাশ থেকে গুলীর আওয়াজ শোনা মাত্রই ৩টি স্টেনগান, ৩টি রাইফেল এবং ২২টি হাতবোমা ফেলে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় রেজাকারদের গুলীতে ৫ জন ভারতীয় অনুচর নিহত হয়। সংঘর্ষে দু'জন রেজাকার আহত হয়।

গতকাল আল-বদর রেজাকাররা মোমেনশাহী জেলার সরিষাবাড়ী ও ইসলামপুরের নিকটস্থ দু'টি সেতু রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় অনুচরেরা এ দু'টি সেতু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করেছিল।

একদিকে যশোর জেলার সাদারপুরের নিকট ভারতীয় অনুচরেরা রেল লাইন সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে রেজাকাররা তাদের প্রতিহত করে। এখানেও দু'জন ভারতীয় অনুচর আহত হয়।

রাজশাহী জেলায়ও রেজাকার বাহিনী অনুরূপ সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেয় বলে খবর পাওয়া গেছে।

দৈনিক সংগ্রাম, ৮-১১-১৯৭১

চারটি জেলায় শামস ও বদরদের তৎপরতা

দিনাজপুর, মোমনেশাহী, যশোর ও রাজশাহী জেলায় আল শামস এবং আল-বদর বাহিনী প্রবল বিরোধিতার মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দিনাজপুর জেলার মহেশপুর এলাকায় 'আল-শামস' রাজাকাররা ভারতীয় এজেন্টদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মুখে চ্যালেঞ্জদেয়। ভারতীয় এজেন্টরা দুর ভসন্ধি নিয়া নিকটস্থ একটি গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল। রাজাকাররা ১৫ মিনিট তাহাদের সাথে গুলী বিনিময় করে।

এই প্রতিরোধের মুখে ভারতীয় এজেন্টরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইয়া যায়। তাহাদের ৫ জন নিহত হয়।

বদর বাহিনী মোমনেশাহী জেলার সরিষাবাড়ীর নিকট একটি এবং ইসলামপুরের নিকট একটি ব্রীজ ভারতীয় এজেন্টদের কবল হইতে রক্ষা করে।

যশোর জেলার সফদরপুরের নিকট রেললাইন তুলিয়া ফেলার জন্য ভারতীয় এজেন্টদের একটি উদ্যোগ রাজাকাররা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সংঘর্ষকালে দুইজন ভারতীয় এজেন্ট আহত হয়।

দৈনিক আজাদ, ৯-১১-১৯৭১

রাজশাহীতে বদর বাহিনীর শপথ অনুষ্ঠান

পাকিস্তানী আল বদর বাহিনীর শপথ অনুষ্ঠান স্থানীয় জিন্না হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা আল বদর বাহিনীর সভাপতি জনাব আবদুল হাই ফারুকী। প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন জনাব আবদুল নইম।

প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকারে বদর কর্মীদের সম্পর্কে আশা প্রকাশ করিয়া বলেন, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহিরে শত্রুদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তিনি তাহাদেরকে উৎসাহিত করিয়া বলেন যে, পাকিস্তান ও এছলামের খাতিরে তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন।

জনাব আফাজুদ্দিন এম এন এ তাহার বক্তৃতায় মহানবীর (দ.) নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং সেই যুদ্ধের আলোকে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য বদর কর্মীদের অভিনন্দিত করেন।

জনাব আয়েনউদ্দিন আহমদ এমপিএ তাহার বক্তৃতায় বদর কর্মীদের সম্পর্কে একই আশার প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব আবদুল হাই ফারুকী বলেন যে, পাকিস্তান ও এছলামের স্বার্থে আল-বদর জীবনপাত করিবে। কেননা, পাকিস্তানকে আল্লার আর্শীবাদ হিসাবে তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।

দৈনিক আজাদ, ৯-১১-১৯৭১

গাইবান্ধায় আলবদর সেনাদের ট্রেনিং

বিলম্বে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি সেখানে আল-বদর বাহিনীর ট্রেনিং শুরু হয়েছে। গত ১৭ই অক্টোবর থেকে গাইবান্ধার আনসারক্যাম্পে এই ট্রেনিং পুরোদমে চলছে।

ভারতীয় এজেন্ট ও অনুপ্রবেশকারীদের খতম করে দেশর অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহাদী প্রেরণার উদ্বুদ্ধ হয়েই ছাত্ররা এই ট্রেনিং গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন।

দৈনিক সংগ্রাম, ১০-১১-১৯৭১

বদর দিবসে তেজগাওয়ে জনসভা
হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ

গত রবিবার অপরাহ্নে মহান বদর দিবস পালন উপলক্ষে তেজগাও থানা জামায়াতে ইসলামীর এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের থানা সভাপতি জনাব মহবুবুর রহমান গোরহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধশান মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, পবিত রমজানের শুরু থেকেই এ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর হইতে দেশে এক চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করিতেছে। এবং মার্চ মাস হইতে দুষ্কৃতিকারীদের উৎপাতে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। সমাজবিরোধী হিন্দুস্তানী চরদের নাশকতামূলক কার্যতৎপরতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন প্রায়। ফলে প্রদেশের প্রায় সর্বত্রই দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করিতেছে। সুতরাং মূল্য হ্রাসের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয় বলিয়া পার্টির এক প্রেস রিলিজে জানা গিয়াছে।

হিন্দুস্তানী চক্রান্তের নিন্দা অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, হিন্দুস্থান অনুচর ও তার সমর্থকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় জোরপূর্বক এ প্রদেশকে দখল করার পায়তারা শুরু করেছে। প্রতিদিনই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর ওপর মর্টার ও কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়া নারী ও শিশু নির্বিশেষে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা ও জখম করিতেছে এবং সীমান্তে ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে দুশমনদের জঘন্য পায়তারা সত্ত্বেও সদা জাগ্রত পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনী চরম ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। এই উত্তেজনার পরিণতি এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে যাহার সকল পরিণতির জন্য ভারতই দায়ী থাকিবে বলিয়া সভায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানানা হয় যে, যে কোন পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক জনগণ সরকারের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের ওয়াদা খেলাপ শুরু হয়। গত ২৪ বছরে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে এ বিশ্বাসঘাতকতা এমন একস্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে যাহার পরিণতি আজ পাকিস্তানবাসী স্বচক্ষে দেখিতেছে। এমতাবস্থার দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে জীবনের সকলস্তরে এছলামী আদর্শকে বাস্তবায়িত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ ১৪ই আগস্টের পরিবর্তে ২৭ শে রমজানুল মোকারককে আজাদী দিবস হিসেবে ও রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাবে সরকারের প্রতি দাবী জানান। পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়া ছিল তাহাছিল পবিত্র সাতাশে রজমান রোজ শুক্রবার। আর শুক্রবারই হইতেছে মুছলমানদের জাতীয় দিবস।

দৈনিক আজাদ, ১১-১১-১৯৭১

আল-বদর বাহিনীর অভিযান

চট্টগ্রামে ৪০ জন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার

গতকাল সন্ধ্যার শরহতলী চাকতাই-এ এক অভিযান চালিয়ে ৪০ জন দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফতার করেছে। দেশপ্রেমিক জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানকালে চট্টগ্রামে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিলপত্র ও আল-বদর বাহিনী হস্তগত করে।

এ অভিযানকালে আল-বদর বাহিনী দুষ্কৃতিকারীদের কাছ থেকে ১টি স্টেন গান, ২টি রিভলবার, ৯টি গ্রেনেড ১টি ইলেকট্রিক ভোল্টেজ টেস্টিং মেশিন ও ১টি স্টেন গান ম্যাগাজিন, ২০ রাউণ্ড রিভলবারের গুলী, ৪৭ রাউণ্ড পিস্তলের গুলী, ৪৫ রাউণ্ড রিভলবারের গুলী ও ৩ হাজার প্রচারপত্র উদ্ধার করে।

দৈনিক সংগ্রাম, ১১-১১-১৯৭১

পাবনায় ভারতীয় চারদের আড্ডা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

গতকাল বুধবার স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে খবর পেয়ে একদল রেজাকার ও সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান পাবনা শহরের ৮ মাইল দূরে চরকেষ্টেতে ভারতীয় অনুচরদের এক গোপন আড্ডায় হানা দেয়। বীর রেজাকার ও সামরিক জওয়ানদের উক্ত হানায় ১০ জন ভারতীয় চর নিহত এবং বিপুল সংখ্যক আহত হয়। এছাড়া রেজাকার ভারতীয় অনুচরদের ফেলে আসা ২২টি রাইফেল, ১০টি স্ট্রেন গান, ১০টি হাত বোমা, ৩টি মেশিন গান ও ৩০০০ হাজার রাউন্ড গুলী উদ্ধার করে এর ফলে দুষ্কৃতিকারীদের পাকড়াও করার কাজে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনগণ ভারতীয় অনুচরদের গোপন আড্ডার খবর প্রতিনিয়ত সামরিক বাহিনী ও রেজাকারদের কাছে পৌঁছাচ্ছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক সংগ্রাম, ১১-১১-১৯৭১

অভিযান শুরু

যে কোন মূল্যে দুষ্কৃতিকারী বাহিনীকে নির্মূল করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন

সম্প্রতি বাকেরগঞ্জ জিলা আল-বদর বাহিনীর উদ্যোগে দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যাপক গণ-সংযোগ অভিযান শুরু হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৩রা নভেম্বর স্থানীয় সরকারী ব্রজমোহন কলেজ মিলনায়তনে এক সাধারণ ছাত্র-শিক্ষ সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের উপ-অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ। বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-নেতা মোহাম্মদ আবদুল জলিল, ওবায়দুর রহমান, আমীনুল ইসলাম ও বাকেরগঞ্জ জিলা আল-বদর প্রধান জনাব মাহমুদ হোসাইন আল মামুন।

বক্তাগণ বলেন, পাকিস্তানের এক নম্বর ভারত, পাকিস্তানের সহিত সম্মুখ সমরে পর্য্যুদস্ত হইয়া চোরাপথে সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া ধ্বংসাত্মক কার্য্যের দ্বারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদী ভারতের একই হীন উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবার নয়। পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এই ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জিলা আল-বদর প্রধান জনাব মাহমুদ হোসাইন আল-মামুন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আল-বদরের ভূমিকা এবং আল-বদরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন।

তিনি বলেন যে, দুষ্কৃতিকারী বাহিনীর নির্মম কার্যকলাপ আমাদিগকে শিক্ষাদান ছাড়িয়া অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, দেশের এই ঘৃণ্য শত্রুগুলিকে যে কোন মূল্যে নির্মূল করিতে আল-বদর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীও শিক্ষকগণকে আল-বদরের কাছে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সভাপতি তাহার ভাষণে 'আল-বদর'-কে আরবের আইয়ামে জাহেলীয়াতে নবী করিম (ছ.) কর্তৃক গঠিত 'হিলফুল ফুজুলের' সাথে তুলনা করিয়া তাহাদের উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। তিনি দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সকলের নিকট আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়া যাওয়ার আহ্বান জানান।

দৈনিক আজাদ, ১২-১১-১৯৭১

বদর দিবসের ডাক

যুদ্ধবাজ ভারতের অশুভ পাঁয়তারাকে নস্যাৎ করো

কোটচাঁদপুর (যশোর) ১০ই নভেম্বর

ইসলামী ছাত্র সংঘ ও জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় মডেল স্কুলে গত ৭ই নভেম্বর বদর দিবসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম বিজয় এবং তার শিক্ষা ও তাৎপর্যের ওপর বিশদ আলোচনা করেন মাষ্টার মতিয়ার রহমান, জনাব আফছার উদ্দীন ও মওলানা ফজলুল হক প্রমুখ। বক্তাগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে আল-বদরের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে সামনে রেখে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিককে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। সভায় যুদ্ধবাজ ভারতের অশুভ পায়তারাকে নস্যাৎ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

চাঁদপুর

ঐতিহাসিক বদর দিবসে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে এক বিরাট ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা এর আয়োজন করে। চাঁদপুর কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।

বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা আবদুর রব, আবুল বাসার, নুরুল্লাহ প্রমুখ।

জমায়েত শেষে জনাব হাবিবুল্লার নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল বের হয়।

পূর্বাহ্নে সকাল ৮ টায় স্থানীয় কর্মীরা বদর দিবসের অনুপ্রেরণায় ব্যক্তিগত শপথ গ্রহণ করে।

চাঁদপুর ইসলামী ছাত্রসংঘ এ খবর পরিবেশন করেছে।

টাঙ্গাইল

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, টাঙ্গাইলেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বদর দিবস পালিত হয়। এ উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইল জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জমিয়তে তালাবায়ে আরবিয়ার যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়।

জনাব আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আবদুল খালেক, হাকীম হাবীবুর রহমান, অধ্যাপক হাবীবুর রহমান, আবদুল্লাহেল ওয়াছেক এডভোকেট, আবদুল জব্বার মোক্তার, এস, এম, রেজা, ডাক্তার আবদুল বাসেত ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বিশিষ্ট জামায়াত কর্মী অধ্যাপক এম এম আবদুল কাদের আল-বদরের উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনান।

নেতৃবৃন্দ বদর দিবসে মুসলিম জাতির আজকের দিনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে বক্তৃতা করেন। খোদাদ্রোহী শক্তি তথা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত থাকার জন্য তারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে সমবেত সুধীদের নিয়ে একটি মিছিল বের হয়। এতে 'আল-বদর জিন্দাবাদ' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তানের উৎস কি লা ইলাহা ইল্লাহা' প্রভৃতি শ্লোগান সহকারে মিছিলটি জামে মসজিদে গিয়ে শেষ হয়।

আল-বদর বাহিনী গঠিত

সপ্রতি টাঙ্গাইলে জনাব ছোমছামউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আল-বদর বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এতে প্রায় সত্তর জনের মত পাকিস্তানী খাঁটি মুসলিম ছাত্র যোগ দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে এর ট্রেনিং শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক সংগ্রাম, ১২-১১-১৯৭১

বিভিন্ন স্থানে বদর দিবস পালিত

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোন কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান

গত সোমবার এখানে যথোপযুক্ত মর্যাদার সাথে বদর দিবস পালিত হয়। ইসলামী ছাত্রসংঘের গাইবান্ধা শাখার সভাপতি ও বদর বাহিনীর কমান্ডার জনাব লুৎফর রহমান বদর দিবসের উদ্বোধন করেন। বদর বাহিনী বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বদর বাহিনীর বিভিন্ন প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাহিনীও কমান্ডার জনাব লুৎফর রহমান সকলকে পাকিস্তান রক্ষার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যে কোন কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

সকল পাকিস্তানবাদী মুসলমানকে সামরিক ট্রেনিং দানের দাবী

যশোর জেলার মনিরামপুর থেকে সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, গত রোববার মনিরামপুর মসজিদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মওলানা দ্বীন মোহাম্মদ ও জমিয়তে তালাবয়ে আরাবিয়ার যশোর জেলা শাখার সভাপতি শেখ আবদুল মতিন বক্তৃতা করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রতিটি পাকিস্তানবাদী মুসলমানকে সামরিক ট্রেনিং দিয়ে দেশও ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানান হয়। ইসলামী শাসন কায়েম, ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপের দাবী জানিয়েও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দৈনিক সংগ্রাম, ১৪-১১-১৯৭১

সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছাত্রসংঘ নেতৃবৃন্দের আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার খাতিরে সৈনিক হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দেশের দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় প্রদত্ত এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রসংঘ নেতাদ্বয় উপরোক্ত আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং ভারতের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে করেন যে, মুসলিম বিশ্ব অনুরূপ হামলা কখনো বরদাশত করবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী যুবকদের পক্ষ থেকে নেতাদ্বয় সাম্রাজ্যবাদী ভারত এবং তার মিত্রদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে মুসলমানরা শান্তিপ্রিয় জাতি কিন্তু তারা যে কোন বর্বরোচিত হামলার সমুচিত জবাব দেয়ার মত শক্তির অধিকারী।

ভারতের ওপর মরণাঘাত হানার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ছাত্র সংঘ নেতাদ্বয় দলীয় কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন।

দৈনিক সংগ্রাম, ২৪-১১-১৯৭১

ছাত্র সমাজের প্রতি ডাক
হিন্দুস্তানী হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

পাকিস্তান এছলামী ছাত্রসংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে হিন্দুস্তানী হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য দেশের ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

তাঁহারা বিবৃতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করেন।

প্রসংগক্রমে দুইজন ছাত্রনেতা বলেন, "আমরা মুছলমান এবং মুছলমানরা শান্তিপ্রিয় জাতি। আমরা বর্বরোচিত হামলার দাঁত ভাংগা জবাব দিতেও প্রস্তুত।" মোছলেম জাতি ইতিপূর্বেও এ ধরনের নির্লজ্জ দুশমনের সমুচিত জবাব দিয়াছে এবং

বর্তমানেও জবাব দিতে সক্ষম। তাঁহারা ছাত্রসংঘের প্রতিটি কর্মীর প্রতি পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন।

দৈনিক আজাদ, ২৪-১১-১৯৭১

রাজধানীতে বদর বাহিনীর মিছিল

হাতে নাও মেশিনগান খতম কর হিন্দুস্তান

পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী ভারতের বর্বর হামলার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা শহরে আল-বদর বাহিনী এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে।

আছর নামাজের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ হইতে মিছিলটি জিন্নাহ এভিনিউ, নওয়াবপুর রোড, বাহাদুর শাহ পার্ক হইয়া সদর ঘাটে শেষ হয়। মিছিলকারী আল বদর তরুণ গণ গগনবিদারী আওয়াজ তোলেন– "কাশ্মীর পাঞ্জাব নিয়ে নাও বীর বাহিনী এগিয়ে যাও" আসাম বাংলা দখল কর "ভারতকে খতম কর" হাতে নাও মেশিনগান খতম কর হিন্দুস্তান" "আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবেই"।

বিক্ষোভ মিছিল শুরু করার আগে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক পথ সভায় আল বদরের তিনজন কমান্ডার জ্বালামীয় ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তানের হীন কারসাজির তীব্র প্রতিবাদ করুন। তাহারা বলেন যে, তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর ছদ্মাবরণে সম্প্রসারণবাদী ভারত পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব নস্যাৎ করিয়াছে তৌহিদবাদী পাকিস্তানীগণ তাহা চিরকালের মত ব্যর্থ করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারাহা এই মর্মে হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, অবিলম্বে পাকিস্তান বিরোধী তৎপতা বন্ধ না করিলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত নিজের সত্ত্বা হারাইতে বাধ্য হইবে।

দৈনিক আজাদ, ২৬-১১-১৯৭১

মোমেনশাহীতে পূর্ত উজির

বদর ও রেজাকারদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম বিদ্যুৎ এবং সেচ দফতরের উজির জনাব এ, কে মোশাররফ হোসেন জাতির বর্তশান সংকটে আল-বদর ও রেজাকারদের সেবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত বৃহস্পতিবার এখানে আল বদর স্বেচ্ছাসেবকদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে উজির ছাহেব আরও বলেন যে, জাতি চিরদিন আল-বদর ও রেজাকারদের সেবার কথা স্মরণ রাখিবে। তিনি বলেন, রেজাকার ও আলবদর বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের জীবনের ঝুঁকি লইয়া দুশমন ও উহার দালালদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সব তরুণেরা ভবিষ্যৎ নেতা এবং উন্নত নৈতিক মনোবলের অধিকারী বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

নিরপরাধ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রখার জন্য তিনি বদর রেজাকারদের প্রতি আহ্বান জানান।

পূর্বাহ্নে তিনি সম্বয় কমিটির এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সভায় জনগণের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধিকল্পে শ্রোতৃমণ্ডলী ও শান্তি সেনাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দৈনিক আজাদ, ৭-১২-১৯৭১

হিন্দুস্তানী হামালার বিরুদ্ধে গণসমাবেশ

গতকাল শুক্রবার বিকালে বায়তুল মোকাররক প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক গণসমাবেশে যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের উপর হিন্দুস্তানের হামলাকে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। আল বদর বাহিনী এই গণসমাবেশের আয়োজন করে।

পূর্ব পাকিস্তান এছলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আল মোজাহিদ হিন্দুস্তানের সম্প্রসারণবাদের প্রতি মরণ আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। পাকিস্তানের নিরাপার জন্য হিন্দুস্তানকে খতম করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্যরা যে অপূর্ব রণকৌশল ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করিতেছেন ছাত্র নেতা তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ও আমাদের বীর জোয়ানদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মীর কাসিম

পূর্ব পাকিস্তান এছলামী ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব মীর কাসিম হিন্দুস্তানী যুদ্ধবাজ ও আকাশ বানীর মিথ্যা প্রচার ও গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, আমরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতেছি। খোদার রহমতে জয় আমাদের অবধারিত।

দৈনিক আজাদ, ১১-১২-১৯৭১

শহীদানের লাশ পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

জামাতে ইসলামীর বর্বর বাহিনীর নিষ্ঠুরতম অভিযানে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অসংখ্য লাশ এখনো সেইসব নারকীয় বধ্যভূমিতে শনাক্তবিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারা সবাই শহীদ-তারা সবাই অমর। অথচ এ-পর্যন্ত তাদের পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করা যায়নি। বর্বরদের নৃশংস অভিযানে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের লাশ

শনাক্তের অপেক্ষায় না রেখে অবিলম্বে দাফনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এরা শনাক্তের অযোগ্য হলেও লাওয়ারিশ নন এবং লাওয়ারিশ লাশের জন্য যেমন ডোম বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম দিয়ে দাফনের দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয় এদের জন্য তা বাঞ্ছনীয় ও নয়।

তা ছাড়া ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করার প্রাক্কালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়। তাঁদের লাশ ও এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং বিকৃত হতে হতে বীভৎস হয়ে উঠছে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই তাদের দাফনের ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন।

যাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি

পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আলবদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জল্লাদদের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গলিত-বিকৃত শবগুলো মানবীয় বিবেককে প্রতি মুহূর্তে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত করছে। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবেন না। এই জল্লাদদের অনেকে আত্মগোপন করেছে, অনেকে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের বিবর থেকে অনতিবিলম্বে এদের বের করে এনে প্রকাশ্য আদালতে উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করা হবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

এ-প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জল্লাদরা যেসব প্রখ্যাত মনীষী, সাংবাদিক এবং চিকিৎসাবিদকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের অনেকের এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘাতকচক্রের দুর্গগুলোর আশপাশে কোথাও এদের আটক করে রাখা হয়েছে কি না ব্যাপক তল্লাশির মাধ্যমে সেটা উদ্ঘাটন করা বোধহয় অসম্ভব হবে না। এই হতভাগ্য ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী পুত্র-কন্যা এবং স্বজনগণ কী দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আমরা সবাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। আশা করি কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই প্রার্থিত তদন্তের ব্যবস্থা করে আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করবেন।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বাংলা সমিতির শোকসভা

আজ মবঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় কলাভবনে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা সমিতি

সকাল দশটায় বটতলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতির উদ্যোগে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

এখনও ড. আমিনউদ্দিনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি

পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. আমিনউদ্দিনকে বিগত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় তার বাসভবন ১৯/বি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি হতে আলবদররা ধরে নিয়ে গেছে। অদ্যাবধি তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তার খোঁজ পেলে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শাহরিয়ারের খোঁজ নেই

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টায় কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর একটি সশস্ত্র দল মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের পুত্র মোস্তাফা কামাল শাহরিয়ার (ওরফে মিন্টু) কে ৯নং কে এম দাস লেন. ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র।

দৈনিক বাংলা, ২১-১২-১৯৭১

খুনী পাকবাহিনী ও তার চরেরা এদের হত্যা করেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

হানাদার পাকিস্তানি দস্যু বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন সর্বজনমান্য কৃতী অধ্যাপককে হত্যা করেছে। গত ২৫শে মার্চের রাতে এই হত্যালীলা শুরু হয় এবং প্রথম দিকে ১০ জন সেরা অধ্যাপক প্রাণ হারান। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে ১৪ই ডিসেম্বর অপর দশজন প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রথশ দিকের দশজন হচ্ছেন : (১) ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব (দর্শন) (২) অধ্যক্ষ এ এন এম, মনিরুজ্জামান (সংখ্যাতত্ত্ব), (৩) ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজি) (৪) ড. ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), (৫) জনাব এ মুকতাদির (ভূ-বিদ্যা), (৬) জনাব শরাফত আলী (অংক), (৭) জনাব এ আর কে খাদেম (পদার্থ বিদ্যা), (৮) শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থবিদ্যা), (৯) জনাব এম সাদেক (শিক্ষা) ও (১০) ড. এম সাদত আলী (শিক্ষা)।

গত ১৪ই ডিসেম্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় অধ্যাপকগণ হচ্ছেন (১) অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী (বাংলা), (২) জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), (৩) জনাব আনোয়ার পাশা (বাংলা), (৪) ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), (৫) মি. সন্তোষ ভট্টাচার্য

(ইতিহাস), (৬) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), (৭) জনাব রসিদুল হাসান (ইংরেজি), (৮) ড. সিরাজুল হক খান (শিক্ষা), (৯) ড. ফজলুল মহী (শিক্ষা) ও (১) এম মর্তুজা (চিকিৎসক)।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানাচ্ছেন যে, বিগত নয় মাসে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের তাঁবেদার আল-বদর ও রাজাকারদের হাতে বিভিন্ন সময় নিহত বহু চিকিৎসক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। স্বাধীনতার স্বাদ তাঁরা শেষ মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে পারেননি। বহু চিকিৎসকের মৃত্যু সংবাদ আজও রাজধানীর মানুষের কাছে এসে পৌঁছেনি। এ পর্যন্ত ২৬ জনের নাম বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির দফতরে এসে পৌঁছেছে। তারা হলেন :

১। অধ্যাপক ডা. এম এফ রাব্বী, ২। অধ্যাপক ডা. আলীম চৌধুরী, ৩। অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমেদ, ৪। অধ্যক্ষ লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান, ৫। ডা. হুমায়ুন কবীর, ৬। ডা. আজহারুল হক, ৭। ডা. সোলায়মান খান, ৮। ডা. মিসেস আয়েশা বদেরা চৌধুরী, ৯। ডা. কশির উদ্দীন তালুকদার, ১০। ডা. মনসুর আলী, ১১। ডা. গোলাম মোর্তজা, ১২। ডা. মফিজউদ্দীন খান, ১৩। ডা. জাহাঙ্গীর, ১৪। ডা. আলহাজ মফিজউদ্দীন, ১৫। ডা. নুরুল ইমাম, ১৬। ডা. এস কে লালা, ১৭। ডা. হেমচন্দ্র বসাক, ১৮। ডা. ওবায়দুল হক, ১৯। লে. কর্নেল তাহের এএমসি, ২০। লেঃ কর্নেল হাই এএমসি, ২১। লেঃ কর্নেল বদিউর চৌধুরী এএমসি, ২২। মেজর রিজাউর রহমান, ২৩। মেজর ওয়াসিমুল ইসলাম, ২৪। ডা. আসাদুল হক, ২৫। ডা. মোসাব্বের আহমেদ, ২৬। ডাক্তার জব্বার।

দৈনিক বাংলা, ২২-১২-১৯৭১

হত্যার চেষ্টা অব্যাহত

অল্পের জন্য দুই শতাধিক চিকিৎসকের প্রাণরক্ষা

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

গত সোমবার ঢাকা শহরের চিকিৎসকরা কুখ্যাত আলবদরদের আর একটি হত্যা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আকস্মিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন। এই কুখ্যাত দস্যুদের হাতে নিহত চিকিৎসকদের উদ্দেশে আহুত এক শোকসভায় যখন ঢাকা শহরের দুই শতাধিক চিকিৎসক সমবেত হয়েছিলেন তখনই এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। জেলখানা রোডস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির চত্বরে গত সোমবার সকাল এগারোটার সময় এই সভা শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চত্বরের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি ম্যানহোলের ঢাকনির পাশে সুদৃশ্য একটি সোনি ও ট্রানজিস্টার দেখা যায়। আকস্মিকভাবে একটি দামি টানজিস্টারটিকে পড়ে থাকতে দেখে সভায় আগত কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তারা উপস্থিত সবাইকে সরে যেতে বলেন ও মিত্রবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দলকে খবর দেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রবাহিনীর একটি দল উপস্থিত হন এবং প্রাথমিক পরীক্ষার পর উপস্থিত চিকিৎসকদের দূরে সরে

গিয়ে সত্বর সভা শেষ করার অনুরোধ জানান। এরপর বিকেলের দিকে মিত্রবাহিনীর দ্বিতীয় দল ইঞ্জিনিয়ারসহ আসেন এবং সন্ধ্যা ৬টার দিকে ট্রানজিস্টারের মধ্যে রক্ষিত মাইনটির নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটান। মাইনটি নিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটালেও এর প্রচণ্ড শব্দে আশপাশের বিল্ডিংয়ের কাচের শার্সিগুলো ভেঙে যায়। তবে অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সম্ভবত এই শক্তিশালী বিস্ফোরকটির দ্বারা হানাদার বাহিনীর তাঁবেদাররা সভায় আগত সমস্ত চিকিৎসককে হত্যা করতে চেয়েছিল। উক্ত স্থানে এই শোকসভার কথা পূর্বাহ্নেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল।

ঘোষণা

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, পি এইচডি (মানচেস্টার), এমএসসি (মান), এম এসসি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট গোল্ড মেডালিস্ট (ঢাকা), ডিপ্লোমা ইন ফ্লুইড মেকানিক্স (ইংল্যান্ড), ফেলো অফ দি রয়াল মেট সোসাইটি, লন্ডন, ফেলো অফ দি সোসাইটি অফ এপ্লাইড মাথামেটিক্স এবং ফেলো অফ দি মেট সোসাইটি অফ বোস্টন গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে আল বদর কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।

ডা. আজাদ এবং অন্যান্য শহীদের বিদেহী আত্মার নিদর্শনস্বরূপ শহরের একমাত্র সান্ধ্য পত্রিকা ইভনিং পোস্টের প্রকাশনা বন্ধ রাখা হয়েছে। উহার প্রকাশনা শিগগিরই পুনরায় শুরু করা হবে।

হাবিবুল বাশার, সম্পাদক, ইভনিং পোস্ট

দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

ডা. আয়েশা চৌধুরীর কুলখানি অনুষ্ঠিত

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর গুলিতে গত ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় নিহত পরলোকগত ডাক্তার আয়েশা বেদোরা চৌধুরীর (আইসিআই-এর ম্যানেজার ডাক্তার এম এ বাশারের পত্নী) কুলখানি গত সোমবার ধানমন্ডি ৩২ নং রোডে জনাব হাতেম আলী খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ডাক্তার আয়েশা অবিভক্ত বাংলার সাবেক মন্ত্রী, সাবেক স্পিকার এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নওশের আলীর বড় নাতনি ছিলেন।

ভাইয়ের সন্ধানে সৈয়দ আমজাদুল হক

সৈয়দ আমজাদুল হক গত সোমবার সারাদিন ধরে উন্মাদের মতো তার ভাই সৈয়দ নজমুল হকের সন্ধান করেন। সৈয়দ নজমুল হক ফ্যাসিবাদী আলবদর রাজাকারগণ কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার কয়েকদিন পর অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের যে দু'জন কূটনীতিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের

পক্ষাবলম্বন করেন, সৈয়দ আমজাদুল হক তার অন্যতম। তিনি নয়াদিল্লিস্থ সাবেক পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রেস এটাচি ছিলেন। পাকবাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। অপর একজন কূটনীতিক হচ্ছেন জনাব এস কে শাহাবুদ্দিন। তিনি নয়াদিল্লিস্থ সাবেক পাকিস্তানি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন।

বিপিআই-এর খবরে বলা হয়, সৈয়দ আমজাদুল হক তার ভাই সৈয়দ নজমুল হকের অপহরণের খবর পেয়ে ঢাকা এসেছেন। সৈয়দ নজমুল হক সাবেক পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (পিপিআই)- এর চিফ রিপোর্টার ছিলেন।

ভাইকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়ার জন্য তিনি রায়ের বাজার এলাকার বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন। সেখানে আলবদর রাজাকাররা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সহায়তায় বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, লেখক ও বিজ্ঞানীদের হত্যা করেছে। এই বধ্যভূমিতে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর গলিত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কিন্তু মোহাম্মদপুর এলাকায় কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে আটক করে রাখার খবরে এখনো অনেকে আশায় ভর করে দিন কাটাচ্ছে। সৈয়দ আমজাদুল হক তার ভাইকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার আশা করছেন।

ডা. মোমতাজ হোসেন চৌধুরীর হোন্ডা

গত ৮ই ডিসেম্বর কুখ্যাত বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ঢাকার কমলাপুরের সৈয়দ ফার্মেসির ডাক্তার সৈয়দ মোমতাজ হোসেনের পরিবারবর্গ (সৈয়দ সালমা পারভীন ও সৈয়দ মুনীর হোসেন) যেখানেই থাকুন না কেন তাদের শাহ আলম চৌধুরী, কেয়ার অব ২৭৩৪, আউটার সার্কুলার রোড (দরগাহ রোড জংশন) ঢাকা-১৪ ঠিকানা থেকে একটি হোন্ডা নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দৈনিক বাংলা, ২২-১২-১৯৭১

এদের সন্ধান চাই

আওয়ামী লীগের সহযোগী আওয়ামী উলেমা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি মওলানা অলিউর রহমানকে গত ১১ই ডিসেম্বর কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর একদল সশস্ত্র লোক পুরাতন ঢাকা এলাকা থেকে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তারপর থেকে আজ অবধি তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানলে তা তার ছোট ভাই নিপার ইনস্ট্রাক্টর জনাব শফিউর রহমান ২৫৫০৬১/৫ অথবা জনাব সাদেককে ২৫৪৫৪২ নম্বর টেলিফোনে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

।। দুই ।।

রেজাউল করিম (বাবুলু)। বয়স ২৫ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। গায়ের রং ফর্সা, স্বাস্থ্যবান। ঢাকাস্থ সরকারি জেলা কলেজের ১ম বর্ষ বিকম-এর ছাত্র। গত ২৩শে

নভেম্বর, ১৯৭১ অপরাহ্নে ১৫নং শেখ সাহেব বাজারস্থ বাড়ি থেকে সশস্ত্র সাদা পোশাক পরিহিত কতিপয় উর্দুভাষী ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অতঃপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার কোনো খোঁজ পেলে বেগম বদরুদ্দিন আহমদ, ১৫নং শেখ সাহেব বাজার ফোন : ২৫০৭১৮ ও ২৮১০১৫-তে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

।। তিন ।।

টিএন্ডটি কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আফসারকে গত ৩০শে মে মতিঝিল গভর্নমেন্ট কলোনি থেকে রাত দেড়টায় হানাদার পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে বহু চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোহাম্মদ নুরুল আফসার সম্পর্কে কোনো সন্ধান পেলে তা তার বাবা জনাব মোহাম্মদ জহুরুল হককে ৬নং পুরানা পল্টন ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ২৩-১২-১৯

কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর আরো দুজন শিকার

কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর আরো দুজন শিকারের কথা জানা গেছে। এরা হলেন জনাব এম খুরশেদ আলম ও তার দ্বিতীয় পুত্র এ কে এম মাহবুবুল আলম।

জনাব খুরশেদ আলম টিএন্ডটি বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ট্রাংক অভ্যন্তরীণ-১) ও তার ছেলে মাহবুবুল আলম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল সোয়া ৫টায় আল-বদর বাহিনীর প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র দস্যু ৬/৩/১, টি এন্ডটি কলোনি থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়। দস্যুরা ধরে নেয়ার সময় পিতা-পুত্রের চোখ বেঁধে দিয়েছিল।

১৩ ডিসেম্বরের পর থেকে এ পর্যন্ত এই দুজনের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

দৈনিক বাংলা : ২৬-১২-১৯৭১

Kidnapped

Mr. Badaruddin Ahmad aged about 40. President of an area unit of Dhaka City Awami League, is one of those people who were kidnapped by the Al-Badar goondas.

Mr. Badaruddin Ahmad was kidnapped by Al-Badar people on December 12 from Hajee Rashid Lane, Bangshal. His family has been trying to locate him but all their attempts have proved fruitless.

Mr. Ahmad's brother Prof. Muhammad Husain has requested anybody having information of the where abouts of Mr. Badarudding Ahmad to contact him (Mr. Muhammad Husain). He said that anybody giving information about Mr Badaruddin Ahmad will be rewarded. Prof. Muhammad Husains address is -87. Hajee Abdullah Sarker Lane, Bangshal, Dhaka, Phone :252680 or 254729.

Bangladesh Observer, 28.12.1071.

Body of Salina Parveen found

By a staff correspondant

The body of Mrs. Salina Parveen editor Shilalipe was found in the kiln at the Rayer Bazar on Friday. Her body was partly mutilated and she was in a completely blind folded state.

According to her brother, who was staying with her in her Siddeshwary residence, she was taken from her house by armed men at about 2 p.m. on December 14, while the city was under curfew imposed by the occupation forces. The armed gang came in an EPRTC coach. Four of the nearly 15 members of the armed gangsters entered her house and told her at bayonet point to accompany them. While her brother asked them about the purpose of her accompanying them they told him that he should not ask anything about that. They also threatened him that the consequences would also be too bad for him if he asks anything more.

It is believed that she was also the victim of the carnage of the Al-Badar, the armed gang of the ultra rightists Jamaat-e Islami who brutally killed the topmost intellectuals of Bangladesh during the last few days of the Pakistan occupation forces in Dhaka.

Bangladesh Observer, 29.12.1071.

3 more victims of Al-Badar carnage

Dr. Siddique Ahmed. Dr. Aminuddin both senior research officers and Mr. Shamsul Alam Laboratory Technician of the Eastern Regional Laboratory Dhaka were lifted from their quarters at noon on December 14 by Pakistani army and men of Al badar they are believed to have been brutally killed like hundred of other intellectual of this city.

Bangladesh Observer, 24.12.1971

Absconding Al-badar gangster

By A staff Correspondant

Chowdhury Mainuddin a member of the banned, fanatic Jamaat Islam Party, has been described as the 'Operation-in-Charge' of the killing of intellectuals in Dhaka by Abdul Khalegue, a captured ring leader of the Al-badar and office-bearer of the Jammat-e Islam. The Fasicst Al- Badar forces are responsible for the killing of the intellectuals backed by the Pakistan army before their humiliating surrender.

Chowdhury Mainuddin has been absconding presumably since December 16.

Bangladesh Observer, 29.12.1971.

Al-Badar leader held

By A Staff Correspondant

Abdul Khaleque a collaborator of the notorious facist Al-Badar bahini was caught on Wednesday in Rampura. He disclosed the names of nine Al-Badar members who conducted the cold blooded murders of the intellectuals in the city prior to the shameful surrender of the occupation army.

Mr. Khaleque office secretary of the City Jamaat a bootlicking organisation of the occupation army, said that the members whom he named could give the details of the murderers and plans. He denied his association with the killings, but he admitted that he was asked by the Al-badar bahini to locate the house of Shahidullah Kaiser, President of the then East Pakistan Union of Journalist. Khaleque said that he was full timer of the fascist organisation Jamaat Islam was drawing a salary of taka 325 per month.

Latest Victim of Al-badar

Syed Najmul Huq, a renowned journalist and the Chief Reporter of the former PPI and correspondent of the Columbia Bangladesh Service was picked up by a group of the Fascist and fanatically religious Al-Badar Bahini-a millitant organisation of the Jamaat-e-Islami on December 10 at 4 a.m. from his residence at 90 Purana paltan Line Dhaka. It is to be

recalled that these miscreants who were working under the direct supervision and set planning of Pakistan Army under the leadership of Major General Rao Farman Ali were wearing uniforms and masks and carrying stenguns and rifles and fired two shots to create terror in Mr. Najmul's House. Afterwards they grabbed him by his neck in his bed room and ordred him hands up. Then they took him to the open yard of his house and ordered him to sitdown. Immediately afterwards at 4-15 a.m. he was forcibly taken by them to a jeep which was escorted by another military jeep. The jeep whisked away in the wild darkness carrying Syed Najmul Huq grabbed by four members of Al-Badar bahini one of them reported to be a Bangali.

He presumed to have been taken to the Physical Training Institute at Mohammadpur blindfolded and hands tied behind along with othe intellectuals of the city before they brutally murdered him in cold blood at Rayerbazar marshy area after inhuman torture. Mr. Najmul's dead body could not be traced as yet, as is the story of many other intellectuals of the city. Other dead bodies bore the mark of Gestapo type of torture, some body's fingers were cut, some body's chest bore bayonet wounds, some body's face was disfigured with acid.

More than a hundred foreign journalists who have so far visited dead bodies lying at slaughter land at Rayerbazar and other places, have admitted that the barbarous and inhuman torture meted out to the intellectuals, have surpassed any type of cruel torture ever heard of in history. One foreign journalist even commented "its not only utterly shocking but we are ashamed that we belong to the human race which is capable of doing this."

Syed Najmul Huq, aged 30 was born in Paigramkashba in the district of Khulna. He is the fourth son of the reputed educationist Mr. Emadul Huq and younger brother of Mr. Amjadul Huq, who went first to switch over allegience to Bangladesh Government on April 6 in New Delhi. He joined PPI in 1964 and since then he was working in the same News Agency for the last seven years. He also accompanied Sk. Mujibur Rahman to London and Europe when the latter went on a tour after his release from the so-called' Agartala Conspiracy Case.'

Bangladesh Observer, 23.12.1971.

Killing of intellectuals condemned

By a Staff Correspondent

Different educational institutions employees unions of atuonomous and commercial offices and socio-cultural organisations in separate meetings held on Wednesday and Thursday in Dhaka condemned the brutal killing of intellectuals by the Fascist Al-Badar forces in collaboration with the Pakistan Army. In all the meetings heartfelt sympathies were expressed with the members of the bereaved families and demanded punishment of the culprits.

The Dhaka University Bangla Samity in its metting demanded severe punishment for the persons who are responsible for the murders of teachers, doctors, scientists, journalists and other social workers.

Presided over by Dr. Neelima Ibrahim the meeting was addressed by Professor Rafiqul Islam, Professor Maniruzzaman Professor Humayun Azad, Mr. Kabir Chowdhury. Mr. Shaukat Anwar, Mr. Al Mansur and Miss Baby Maudood.

In a resolution the meeting demanded that the culprits should not be released under the umbrella of Geneva convention and they should be duly punished after their trial in special tribunals.

The teachers of the Central Law College in a meeting held on Thursday expressed its deep sense of distress at the acts of ghastly murder and atrocities on the eminent teachers and intelligentsia of Bangladesh and called upon the Government to punish the criminals without mercy and without regard to their being prisoners of war.

Bangladesh Samabaya Union in a meeting held at Samabaya Sadan at Motijheel Commercial Area paid homage to the memory of the martyrs to the liberation movement and expressed sympathy to the members of the bereaved families.

The teachers and employees of Engineering University met under the presidentship of Dr. M.A. Naser, Vice-Chancellor of the University. The meeting demanded punishment to the criminals responsible for killing of intellectuals. The meeting also demanded immediate release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and necessary steps for his return to Bangladesh.

The teachers and staff of Dhaka College in a meeting strongly condemned the brutal killing of intellectuals by Al Badar Bahini and their collaborators and demanded open trial of the murders.

Bangladesh Observer, 24, 12, 1971.

Varsity teachers demand punishment of murderers

By a Staff Correspondent

A general meeting of Dhaka University teachers on Tuesday condoled the death of teachers and people from various other professions who fell victim to the planned massacare carried out in Bangladesh since March 25 until the surrender of the Pakistan Army. The meeting also demanded investigation of the activitics of Pak military and para-military forces and their collaborators responsible for one of the worst massacares in the history of mankind. The meeting pressed for their trial and severest punishment.

Held at the University Arts building the meeting prayed for eternal peace of the departed souls and sympathised with the bereaved families. The meeting held under the auspices of Dhaka University Teachers Association was presided over by Dr. M. A. Latif.

The meeting called for steps to ensure that defence personnel connected with the massacre were not given the Pakistan status of prisoners of war. The meeting demanded that they be treated as was criminals.

The meeting also appealed to the United Nations to take punitive action against the Government of Pakistan for the planned genocide.

Another resolution of the meeting hailed the dawn of independence and acknowledged with respect the unprecedented sacrifice of the brave warriors of the Mukti bahini and crores of struggling people of Bangladesh. Gratitude was also expressed to the friendly countries for their role in the struggle of the people of Bangladesh. The meeting also acknowledged with gratitude of world opinion and the role of newsman of various countries. The Dhaka University teachers meeting in a separate resolution. demanded the immediate release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. An othe resolution appealed to all to safeguard the dignity of independenc achieved after so much safrifice of blood and also urged all people. whatever their party affiliation or opinion to engage in the task of constructing a happy prosperus and socialistic Bangladesh.

24.12.1971

Teachers killed

The following is a list of Dhaka University teachers killed in army action in March, as mentioned in a Press release at Dhaka University.

Dr. G.C. Dev, Head of the Department of Philosophy; Dr A.N.M. Maniruzzaman, Head of the Department of Statistics; Jyotirmay Guha Thakurta of English Department; Dr. Fazlur Rahman Khan of Soil Science; Mr. A. Muktadir of Geology Department; Mr. Sharafat Ali of Mathematics Department; Mr. A.R. Khadem of Physics Department; Mr. A. Bhattacharjee of applied Physics; Mr. Mohammad Sadeq and Mr. Mohammad Sadat Ali (both of Research and Education).

Names of Dhaka University teachers picked up by army collaborators a few days before the surrender by the Pakistan Army are:

Prof. Munier Chowdhury Head of the Department of Bengali; Mr. Mufazzal Haider Chowdhury of Bengali Department; Mr. Anwar Pasha of Bengali Department; Dr. Abul Khair of History Department; Mr. Santosh Bhattacharjee of History Department; Mr. Giasuddin Ahmed of History Department; Mr. Rashidul Hassan of English Department; Dr. Serajul Huq Khan of Research and Education and Dr. Faizul Mahi of Research and Education.

Medical Officer of Dhaka University Dr. Mohammad Murtaza was also lifted away by Al-Badar. Search for them is continuing but they are believed to have been killed.

Bangladesh Observer, 24.12.1971.

Killing of intellectuals condemned

PUNISH THE CULPRITS

By A staff Correspondant

Different organisations and homage to the departed souls of journalists, professors and doctors who were killed by the armed wing of the extreme rightist, jammat-e-Islami, Al-Badar, just on the eve of the liberation of Dhaka by the Allied Forces and the Mukti Bahini. These organisations urged upon the Government of Bangladesh to find out the criminals and punish them.

The doctors of the Dhaka Medical College in a meeting at the auditorium of Dhaka Medical College at 11 a.m. on Sunday expressed

their heart-felt condolence at the inhuman killing of Professor Dr. Fazle Rabbe, Dr. Alim Chowdhury by the Fascist Al-Badar. The meeting presided by the Principal of Dhaka Medical College was adderssed, among others, by Prof. Dr. Mominul Haq, Prof Ali Ashraf, Dr. Salauddin and Prof Akram Hossain, Dr. Sarwar Ali Khan. Mr. Rafiqul Hasan and Mr. Abul Kasem addressed the gathering on behalf of the Mukti Bahini. All the speakers while addressing was found sobbing. The speakers made a strong vow that for the consolidation of our independence and as a mark of respect to the departed souls, who throughout their life envisaged a exploitation free society, we must make our Health Services people oriented. The meeting proposed to name two of the existing halls of Dhaka Medical Colleges after Dr. Fazle Rabbe and Dr. Alim Chowdhury.

The doctors, nurses and other employees of the Post-Graduate Medical Institute in a meeting expressed their deep condolences at the gruesome murder of Dr Mohammad Fazle Rabee, Dr. Abdul Alim Chowdhury and Dr. Mohammad Murtaza. The meeting decided to install memorial plaque for the departed doctors in the Post-Graduate Medical Institute.

The Students and the staff of the Salimullh Medical College in a meeting expressed heart-felt grief and anguish at the brutal killing of Prof. Abdul Alim Chowdhury and Dr. Fazle Rabee and offered their sincere condolences to the bereaved families. The meeting urged upon the doctors and professinal colleagues to take effective measures to keep the memory of these martyrs alive.

The scientists and employees of the Atomic Energy Centre, Dhaka as well as the engineers and staff of the Directorate of Works and Services in a meeting at the auditorium of the Atomic Energy Centre, Dhaka also offered their heart-felt sympathy to the members of the bereaved families who lost their dear ones in the hands of the Fascist Al-Badar. The meeting in another resolution congratulated the heroic Mukti bahini and the Allied Forces in liberating the soil from the Fascist occupation forces.

The Bangladesh Journalists Union has condemned the Fascist forces who so brutally killed the numerous intellectuals of Bangladesh. The Union in a Press release also stated that the gaibi Janaza and a condolence meeting for the departed souls will be held at the Press Club today Monday at 11 a.m.

Bangladesh Observer, 29.12.1971.

Murder of Intellectuals

...Including thos who were killed on the 25th March. They urged upon the government to provide all facilities including free education-to the members of the bereaved families.

The signatories to the statement were Poet Shamsur Rahman. Mr. Abdul Aziz Senior advocate, Supreme Court, Mustafa Kamal, Barrister, Hasan Hafizur Rahman, Ahmed Rafique Editor Nagarik, Begum Ferdousi Rahman, Sardar Jainuddin, Mr. Ahmed Humayun, Neamul Bashir, Fazal Shahabuddin. Aminul Islam Bedu, Mr. Anwar Husain Khan and Mr. Mustafa Jaman Abbasi.

Bangladesh Observer, 28.12.1971.

হত্যাকারী কারা?
৩৯ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি
খুনীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে

গতকাল সোমবার মুজিবনগরে ৩৯ জন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কোনোরূপেই ক্ষমা করা যায় না।

বিবৃতিতে তারা বলেন, উক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দি নয়, বরং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, সিকান্দার আবু জাফর, জনাব শওকত ওসমান, ড. আনিসুজ্জামান, ড. এ আর মল্লিক, জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী, ড. সরওয়ার মুর্শেদ, মিসেস সনজিদা খাতুন, রণেশ দাশগুপ্ত ও জনাব কামরুল হাসান।

বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে উপরোক্ত বিষয় প্রচার করা হয়।

রাও ফরমান আলীই দায়ী

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ বেতার ও ভারতীয় বেতারের এক খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি ৩৪০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পেছনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত গভর্নর ড. মালেকের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ অন্যান্য সামরিক অফিসারের হাত রয়েছে। এতে বলা হয় যে এই ঘৃণ্য নারকীয় হত্যালীলার জন্য দায়ী অন্যান্য সামরিক অফিসারদের নামও শিগগিরই প্রকাশ করা হবে।

গতকাল সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের একজন বিভাগীয় সেক্রেটারি উপরোক্ত বিষয় জানান বলে বেতারে উল্লেখ করা হয়।

দৈনিক বাংলা, ২১,১২,১৯৭১

এরাই হলো নরপিশাচ আলবদর

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নির্বিচার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যে খুনীবাহিনী গড়ে তুলেছিল, যারা তাদের পাকিস্তানী প্রভুদের রক্তলোলুপতা ও জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার পৈশাচিক উল্লাসে অসংখ্য নিরীহ বাঙালির রক্তে হোলি খেলেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতন করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়েছে, নারী নির্যাতন করেছে, দুধের শিশুকে বেয়নেটের খোঁচায় আর বুটের তলায় পিষে মেরেছে সম্প্রতি সেই আলবদর পশুবাহিনীর একটি দলের নেতা ও তাদের রক্তপিপাসু সহচরদের নাম জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানায় এহেন একটি দল সম্পর্কে এজাহার দেয়া হয়েছে। আলোচ্য দলটির সদস্যরা সকলেই ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার বিশেষ একটি দলের সদস্য। এদের নেতা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসা ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নূরুল হক।

এই দলটিতে মোট কতজন সদস্য আছে তা জানা যায়নি, তবে বকসিবাজার অঞ্চলের জনসাধারণ অনেকেই তাদের নৃশংস কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখেছেন। বস্তুতপক্ষে আলবদর বাহিনীর ঐ দলটি উক্ত অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।

উপরের ছবিতে এই খুনিদের নেতাকে দেখা যাচ্ছে। এদের একটি গ্রুপফটো ও আমাদের হস্তগত হয়েছে। রমনা থানায় এ সম্পর্কীয় জিডি নম্বর হচ্ছে ১৪৮২।

আলিয়া মাদ্রাসা বদর বাহিনী ইউনিটের অন্যান্য সদস্য হচ্ছে সাঈদ আহমদ, সাব্বির আহমদ, হেলাল উদ্দীন, আলতাফুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, জোবায়ের, শফিকুল্লাহ খান, হাবিবুর রহমান ও আবদুল্লাহ।

দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার চক্রান্তের আরও দলিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসে বসে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবীদের হত্যালীলা চালাবার নাটগুরু যে ছিলেন তার আরো প্রমাণ ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে।

গভর্নমেন্ট হাউসে তার নির্দিষ্ট কক্ষের টেবিলে ফাইল চাপা যেসব নোটিশ ইতস্তত রয়েছে তার একটিতে বিবিসির ও এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতা জনাব নিজামউদ্দিন আহমদকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকেত রয়েছে। জনাব নিজামউদ্দিন পিপিআই'র ব্যুরো চীফ ছিলেন।

নোটিশটি জনাব নিজামউদ্দিন প্রেরিত সংবাদ সম্পর্কে নাখোশ হওয়ার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। নোটিশটি অন্যান্য ৩টি বিষয় সম্পর্কে ও জরুরি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা নোটিশটির পূর্ণ পৃষ্ঠাই ছেপে দিলাম।

কুখ্যাত আলবদর পাণ্ডা গ্রেফতার

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকায় গেরিলা বাহিনী গতকাল বুধবার ঢাকা শহর জামাতে ইসলামের দফতর সম্পাদক ও কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর অন্যতম নেতা আবদুল খালেককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার হাজিগঞ্জ থানার বাড্ডা গ্রামের জনাব আবদুল মজিদের পুত্র আবদুল খালেককে রামপুরার একটি গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়।

গেরিলা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদের ফলে সে স্বীকার করে যে সে প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের বাসা বদরবাহিনীর ঘাতকদের দেখিয়ে দেয় তবে, তাকে কোথায় হত্যা করা হয়েছে, সে কথা সে জানে না বলে জানায়।

সে মোট ৯ জন আলবদর বাহিনীর নেতার নাম প্রকাশ করেছে।

আবদুল খালেকের বাসা তল্লাশি করে অনেকগুলো ছবি পাওয়া যায়। যাদের ছবি রয়েছে তারাও আলবদরের লক্ষ্য ছিল কিনা জিজ্ঞেস করা হলে সে অস্বীকার করে। বলে যে এগুলো তার বন্ধু বান্ধবদের ছবি।

সে আরো জানায় যে, মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে আলবদর বাহিনীর লোকদের ট্রেনিং দেওয়া হত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার আলবদর বাহিনীর শিকারে পরিণত হওয়ার সংবাদ জানার পর কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম কায়সার সাহেবের বাসায় গিয়ে জানান যে জামাতে ইসলামের উপরোক্ত আবদুল খালেক কয়েকদিন আগে জনাব কায়সারের ঠিকানা তার কাছে জানতে চায়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে গেরিলা বাহিনীর সদস্যগণ দ্রুত সন্ধান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।

কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর আবদুল খালেক আলবদর বাহিনীর যে ৯ জনের নামোল্লেখ করেছে তার অপারেশনাল ইনচার্জ ছিল দৈনিক পূর্বদেশ-এর স্টাফ রিপোর্টার চৌধুরী মঈনুদ্দীন। সে প্রকাশ্যভাবেই জামাতে ইসলামীর সদস্য ছিল। প্রকাশ, সাংবাদিকদের বাসস্থানের ঠিকানাও সেই জোগাড় করত।

দৈনিক বাংলা, ২৩.১২.১৯৭১

এদের ধরিয়ে দিন

জল্লাদ বদর বাহিনীর সদস্যদের আরো কয়েকটির নাম

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করার জন্য বাংলার জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামী যে মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আলবদর নামে জল্লাদ বাহিনী গঠন করেছিল। তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে।

এই জল্লাদদের ট্রেনিং কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লালমাটিয়ার শরীরচর্চা কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা এইসব তথ্যে বদর জল্লাদদের আরো কয়েকজনের নাম পরিচয় ঠিকানা পাওয়া গেছে।

নিচে এই নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হলো। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য বলে উল্লেখিতদের সবারই স্থানীয় ঠিকানা দেয়া রয়েছে ১৪ পুরানা পল্টন। এটি ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যালয়।

প্রথম চোদ্দজনের নাম ঠিকানা ও বিবরণ সাইক্লোস্টাইল করা ফরমে পাওয়া গেছে। এদের ধরে থানা বা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছে দেবেন। কেউ নিজের হাতে এদের শাস্তি দেবেন না। কারণ এদের কাছে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

১. মো. শাহজাহান ভুইয়া, দ্বিতীয় বর্ষ বিএ অনার্স, ২৬০ মহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঠোঁটে বসন্তের দাগ আছে। পিতা মৃত হাজী মো. আফসারউদ্দিন ভুইয়া, গ্রাম খলাপাড়া, পো. বাজার হাসনাবাদ, থানা. রায়পুর, টঙ্গী, ঢাকা।

২. মো. আক্তারুজ্জামান, পিতা মুন্সী এ আলী, দশম শ্রেণীর ছাত্র। ডান হাতে একটি কালো দাগ আছে। পো. ও গ্রাম. তরগাঁও, থানা কাপাসিয়া, ঢাকা। ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য।

৩. ওসিউদ্দিন আহমেদ, পিতা মো. সামসুল হক, শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি. বাম হাতের কনুইয়ের বিপরীত দিকে একটি কাটা দাগ আছে। গ্রাম ঃ ভাওয়ার ভিটি, পো. বাঘের, থানা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য।

৪. মো. মোমদেদুজ্জামান, পিতা সাজেদুল মোনায়েম, এসএসসি পরিক্ষার্থী, গ্রাম উজুলী, পো. টুকনয়ন বাজার, থানা-কাপাসিয়া, ঢাকা, বাঁ হাতে একটি কাটা দাগ। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৫. ফিরোজ মাহবুব কামাল, পিতা মো. শাহাবুদ্দীন, দ্বিতীয় বর্ষ এমবিবিএস পরীক্ষার্থী, চোখের দুই ভুরুর মাঝখানে একটি কালো চিহ্ন। গ্রাম কাদিরপুর, পো. খোকসা, জেলা কুষ্টিয়া। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৬. এস এম জহুরুল ইসলাম, পিতা কফিলুদ্দীন, এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম বেলদি, পো. পুতিনা, স্থানীয় ঠিকানা গ্রাম, পো. ও থানা জয়দেবপুর ঢাকা।

৭. মো. আবুল হোসেন, বয়স ১২ বছর, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। পিতা মো. আবদুল হামিদ হাওলাদার, স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম ঘাটাশিয়া, পো. গাবুয়া, থানা মির্জাগঞ্জ, জেলা পটুয়াখালী। স্থানীয় ঠিকানা ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি কাটা দাগ।

৮. মো. কবিরুদ্দীন, পিতা মো. আবুল হাশেম, পো. ও গ্রাম সারিফল, থানা গৌরনদী, জেলা বরিশাল, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ হাতের আঙ্গুলে একটি তিল।

৯. মো. শামসুল ইসলাম খান, পিতা মো. সোবেদার আলী খান, আই এ পরীক্ষা দিয়েছে। মুখে স্মল পক্সের দাগ ও ডান হাতের তিন আঙ্গুলে পোড়া দাগ। স্থানীয় ঠিকানা ১০৯, হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা-১। স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম সোনাতলা, পো. শিকারীপাড়া, থানা নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।

১০. মো. আবদুল মতিন, পিতা নূর মোহাম্মদ, চতুর্থ বর্ষ এমবিবিএস ছাত্র, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, ডান চোখের ভুরুতে একটি কাটা দাগ। গ্রাম তুলাছরা, পো. গোপালপুর, জেলা নোয়াখালী।

১১. মো. নসর-এ খুদা, পিতা. ডা. নওশের আলী, ২য় বর্ষ এমবিবিএস, ইসলাম ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ পায়ে একটি কাটা দাগ। গ্রাম নাসিমপুর, পো. সিরাজগঞ্জ বাজার, পাবনা।

১২. এম এম আবদুল হাই, পিতা : এফ এম আনোয়ারুল্লাহ, ঢাকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এমএম। স্থায়ী ঠিকানা. গ্রাম মহম্মদপুর, পো. থানারহাট, জেলা নোয়াখালী, স্থানীয় ঠিকানাঃ আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেল, বক্সীবাজার, ঢাকা।

১৩. মো. মাজেদ আলী (বিবাহিত), পিতা মো. ওয়েজউদ্দীন হাওলাদার, বিকম প্রথম বর্ষ। গ্রাম ও পো. এনায়েতনগর, থানা কালকিনি, জেলা ফরিদপুর। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। উচ্চতা ৫ফুট ৪ ইঞ্চি, পাতলা গড়ন।

১৪. খোন্দকার নজমুল হুদা, পিতা খোন্দকার আবদুল মান্নান, ১ম বর্ষ এমবিবিএস, বাঁ হাতের অনামিকায় পাতার দিকে একটি দাগ আছে। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। গ্রাম শোসালিয়া, পো. সাহাপুর, জেলা নোয়াখালী।

নারায়ণগঞ্জের আল-বদরের তালিকা :

১৫. মো. মুইনুদ্দীন, পিতা মো. আবদুল হাকিম, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা. পো. ও গ্রাম কুকুটিয়া, থানা : শ্রীনগর, ঢাকা।

১৬. মো. নাসিরুদ্দীন, পিতা মো. বসিরুদ্দীন, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। পো. ও গ্রাম. গোয়ালমারি, থানা. দাউদকান্দি, জেলা. কুমিল্লা।

১৭. মো. জামালউদ্দীন, পিতা আবদুল গনি সিকদার, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা. গ্রাম ঈশ্বরকাটি, পো. ও থানা নরিয়া, ঢাকা।

১৮. জালালউদ্দীন মো. মনসুর আলম, পিতামৃত এম এ সালাম, ৭৪ উত্তর চাষাড়া, পো. নারায়ণগঞ্জ, থানা ফতুল্লা।

১৯. মো. সোলায়মান, পিতা মো. আজিজউল্লাহ, বর্তমান ঠিকানা পো. ও গ্রাম নবিগঞ্জ, থানা নারায়ণগঞ্জ।
২০. মো. বোরহানউদ্দীন, পিতা আবদুল বারিক মিয়া, গ্রাম সিঙ্গাপাড়া, পো. কোলা, থানা. শ্রীনগর, জেলা ঢাকা।
২১. মো. রিজওয়ান আলী, পিতা মো. মনসুর হিলাল, গ্রাম ও পো. নবিনগর, থানা নরায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ২৯-১২-১৯৭১

এ লোকটিকে এখনও ধরা যায়নি

(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

বধ্যভূমি শিয়ালবাড়ির জল্লাদদের একজন এই এস. খান। তার আসল নাম এখনও জানা যায়নি। তবে এ কথা সত্যি যে, শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে বাঙালিদের নিধন করার জন্য হানাদার বাহিনী যে ক'জন জল্লাদকে নিযুক্ত করছিল তার অন্যতম প্রধান ছিল এই এস, খান।

বড়ই দুর্ভাগ্য, এই নরঘাতক পশু এখনও ধরা পড়েনি। অথচ এস, খানের অত্যাচার অনাচারের কথা জানে না এমন লোক মীরপুর এলাকায় নেই।

এস, খান জীবিত আছে এবং নিরাপদে মীরপুরের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কথা শুনে শিয়ালবাড়ির প্রত্যেকজন আতংকিত সন্ত্রস্ত। এই খুনীকে কয়েকদিন আগে ১২ নম্বর সেকশনে দেখা গিয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'পূর্বদেশে'ই প্রথম মীরপুরের খুনীদের আড্ডাখানার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ বাহিনী খুনীদের বিভিন্ন আড্ডাখানায় তল্লাশি চালিয়ে বহু অস্ত্রসহ তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।

কিন্তু এই নরঘাতক পশুটি ধরা পড়েনি।

পূর্বদেশ, ১-৩-১৯৭২

বদর বাহিনীর কমান্ডার

ঢাকায় বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের অন্যতম নেতা শওকত ইমরান গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাকে খুঁজছেন। সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র।

প্রসঙ্গত, বলা যায় যে কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর অফিস সেক্রেটারি আবদুল খালেক পুলিশের কাছে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সে বিবরণ দেয়, তাতে শওকত ইমরানের নামও রয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী এই নরপশু ধানমণ্ডিস্থ সিটি নার্সিং হোমে অবস্থিত তৎকালীন আলবদরের ক্যাম্প কমান্ডার ছিল।

তার বাড়ি ফেনী শহরে। পিতার নাম ডা. বশীর। সে ছাত্র জীবনের শুরু থেকে ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন সক্রিয় কর্মী এবং পরে নরঘাতকদল আলবদরের সদস্য। শওকত ইমরান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা ও অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিনের প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। এই খুনী জল্লাদ এখনো ফেরার এবং একে ধরা গেলে তার কাছ থেকে এরো তথ্য জানা যাবে।

আবু হানিফা আফ্রাদ

আবু হানিফা আফ্রাদ নামক রাজাকার বাহিনীর এই সদস্যটিও ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। এই খুনী ও বর্তমানে ফেরার।

বুদ্ধিজীবী সকল মহল থেকে হত্যার বিচার দাবি

নিহত বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে শোকসভা

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতবাদে এবং তাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য গতকাল সোমবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতি

মেডিক্যাল রিপোর্টার কর্তৃক প্রদত্ত খবরে বলা হয় যে, গতকাল সোমবার তোপখানা রোডস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমিতির পরলোকগত চিকিৎসক সদস্যদের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওষুধ শিল্প সমিতি

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি সংগঠন কমিটির এক সভায় পাকিস্তান সামরিক চক্রের এজেন্টদের দ্বারা বাংলাদেশের চিকিৎসক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

দৈনিক বাংলা, ২১-১২-১৯৭১

ঢাকা প্রেসক্লাবে শোকসভা দখলদার বাহিনীর গণহত্যার সব তথ্য উদ্ধারের আহ্বান

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাবেক পিএফইউজের সভাপতি জনাব কে জি মুস্তাফা গতকাল সোমবার মিত্রবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল জে এস অরোরাকে দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার সমস্ত তথ্য উদ্ধারের জন্য আহ্বান জানান।

বিপিআই পরিবেশিত এই সংবাদে বলা হয় যে, এই সমস্ত গণহত্যার তথ্য যদি হত্যাকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা না হয়, তবে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গতকাল সোমবার ঢাকা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক শোকসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বর্বর পাকিস্তানে সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ৩৫ লাখের ও বেশি নির্দোষ মানুষকে হত্যা করেছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চরম ও লজ্জাকর পরাজয়ের প্রাক্কালে তাদের সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী ফ্যাসিবাদী জামাতে ইসলামীর অঙ্গদল আলবদর বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় যেসব সাংবাদিক শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এই শোকসভার আয়োজন করা হয়। জনাব কে, জি মুস্তাফা এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আশরাফ ও জনাব আবদুল রহিম আজাদও এই সভায় বক্তৃতা করেন।

শোকসভার আগে সাংবাদিক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা প্রেসক্লাবে আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

বিপিআই পরিবেশিত রিপোর্টে আরো বলা হয় : জনাব কে জি মুস্তাফা তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশে নিহতদের যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে, প্রকৃত নিহতের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি বলেন যে, পল্লী এলাকার কোনো গ্রাম বা শহরাঞ্চলে কোনো শহর এই বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান সেনাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাদ পড়েনি।

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে যেসব লোক সাংবাদিক, চিকিৎসক, লেখক, শিক্ষক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা, ২১-১২-১৯৭১

শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত : নূর খান

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান বলেছেন, এতদিন পূর্ব পাকিস্তান নামে যে এলাকা পরিচিত ছিল গত কয়েক মাসে সেখানে কি ঘটেছে তার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত।

বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মর্যাদাহানি করার জন্য যেসব ব্যক্তি দায়ী তাদের বিচারের তিনি দাবি জানান বলে আকাশবাণীর এক খবরে প্রকাশ।

বাংলা একাডেমীতে শোকসভা
স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত বীর শহীদদের স্মরণে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর শোকসভায় অবিলম্বে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুনর্নির্মাণের দাবি জানানো হয়।

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেও সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বেগম সুফিয়া কামালের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং একাডেমীর সংস্কৃতি অধ্যক্ষ সদ্য কারামুক্ত সরদার ফজলুল করিম ও জনাব বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে যেসব সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যরা বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন বা বিরোধীদের সহযোগিতা করেছেন তাদের বিচার ও অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড দান, বাংলাদেশের জনসাধারণকে হত্যার পরিকল্পনার পেছনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার যেসব জেনারেল ও তাদের অনুচররা রয়েছে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের জন্য জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার প্রয়াস চালাবার জন্য জাতিসংঘ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ভারতের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও বৃটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

শোক প্রস্তাব পেশকালে জনাব কবীর চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধের চরম বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে বাংলা ভাষা সাহিত্যে সংস্কৃতি ও বিভিন্ন বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিভাবান মনীষা বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলা সংস্কৃতির সাথে যা কিছুরই সম্পর্ক রয়েছে তাই তাদের আক্রোশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সেই জন্য তারা বাংলা একাডেমী ভবনের ওপরও কামানের গোলাবর্ষণ করে এই ভবনের সংস্কৃতি বিভাগ, গ্রন্থাগার ও পরিচালকের কার্যালয় কক্ষের বিরাট ক্ষতিসাধন করেছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসকার্যের নমুনা হিসেবে তিনি কামানের গোলার একটি অংশ ও বিনষ্ট বইপত্র শ্রোতাদের দেখান। তিনি বলেন, কিন্তু তবু আমরা জানতাম বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের এই সংস্কৃতিতে কখনও ধ্বংস করা যাবে না। আমাদের সেই ধারণা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, লজ্জা ও কলংকের কথা যে এদের মধ্যে আমাদের দেশের লোকও রয়েছে এবং এদের অনেকেই আবার মুখোশ পরে ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে।

জনাব বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, দালাল ও বিশ্বাসঘাতকরা এখনও আছে এবং ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, দালাল ও অপরাধীদের তালিকা আমরা টাঙিয়ে দেব। সরকার যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে আমরা নিজেরাই তাদের টুটি টিপে ধরব। জনাব জাহাঙ্গীর অপরাধীদের কিছু নাম সভায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র, শিক্ষক ও মহিলাদেরও অনেকে দালালদের সাহায্য করেছে।

সভানেত্রীর ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলার মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা : ২৩.১২.১৯৭১

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজো বাস্তবায়িত হয়নি

ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে জনমতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। মন্ত্রিসভা স্থির করেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি ও রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, মুক্তিসংগ্রামে শহীদদের স্মরণে ঢাকা নগরীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণে ওয়ার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হবে। মন্ত্রিসভা বিএনআর, পাকিস্তান কাউন্সিল ও প্রেস ট্রাস্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের আরো সিদ্ধান্ত চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।

দৈনিক বাংলা, ২৫-১২-১৯৭১

'৭১ সালের দাবি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে

ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামীর বিশেষ শাখা কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর নরপিশাচেরা ঢাকা শহরে যে ভয়াবহ হত্যালীলা চালিয়েছে তা সবাই জানেন। শুধু রাজধানী ঢাকা শহরেই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মনুষ্য নামধারী এসব হিংস্র পশুরা চরম নৃশংসভাবে সাংবাদিক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপকদের হত্যা করেছে। ধর্মের নামে যে অধর্মের পরিচয় তারা দিয়েছে তার কোনো নজির নেই। যেসব বুদ্ধিজীবীদের আল-বদরের ঘৃণ্য জল্লাদেরা হত্যা করেছে তাদের একমাত্র অপরাধ যে তারা ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল। যে সমাজে মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যে সমাজে প্রগতিশীল ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যায় সে সমাজে তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যবসা ফাঁদা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এসব ধর্মান্ধ খুনিদের শিকারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। হানাদার শত্রুরা এদেশে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য এখানকার প্রগতিশীল, মেধাবী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করার এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, এ তথ্য সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এবং এই কালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে হানাদার শত্রুরা সাঙাত হিসেবে খুঁজে নিয়েছিল আল-বদরের দানবদের।

নিহত বুদ্ধিজীবীদের অনেকের লাশ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি, এখনো বহু লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত, আল-বদরের নরঘাতকেরা বাংলাদেশের মোট ক'জন বুদ্ধিজীবীকে খুন করেছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি এখনো। এ সম্পর্কে অবিলম্বে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত জরুরি। এই সঙ্গে আল-বদরের নরপিশাচদের গ্রেফতার করার সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আল-বদরের কোনো কোনো চাই অবশ্য ইতোমধ্যে ধরা পড়েছে, তাদের সবাইকে খুঁজে বের করতে না পারলে জনসাধারণের মধ্যে পুরোপুরি নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসবে না। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা আতংকমুক্ত হবে পারবেন না।

আল-বদর বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।

দৈনিক বাংলা, ২৫-১২-১৯৭১

৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য দায়ীদের প্রকাশ্য বিচার দাবি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার ঢাকার ৫২ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের জঘন্যভাবে হত্যা করার পূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বেগম সুফিয়া কামাল ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ মোট ৫২ জন স্বাক্ষর করেছেন।

তারা আরো বলেন যে, যারা এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে তাদের জেনেভা কনভেনশনের আওতার মধ্যে না ধরে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাক্ষরকারীগণ ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য পরলোকগত লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল, জাঁ পল সাঁত্রে ও আঁদ্রে মালরোর নেতৃত্বে যেমন আন্তর্জাতিক বিচারকদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল, বাংলাদেশে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তেমনি কমিশন গঠন করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা, ২৫-১২-১৯৭১

১৩ জন লেখক শিল্পী ও আইনজীবীর যুক্ত বিবৃতি

যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করুন

আত্মসমর্পণের ঠিক প্রাক্কালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সাথে যারা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে যোগসাজশ করেছে সেই অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে একদল লেখক, আইনজীবী ও শিল্পী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

এপিবি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে এদেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসকদের নির্মমভাবে হত্যার ব্যাপারে জামাতের আলবদর বাহিনীকে সাহায্যদানকারী অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত সকল অপরাধী ও সামরিক অফিসারসহ যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করার জন্য লেখক ও শিল্পীরা সরকারকে তার সমস্ত রকমের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানান। অপরাধীদের বিচারের জন্য তারা একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনেরও দাবি জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, কোনো জঘন্য অপরাধী সামরিক অফিসারই জেনেভা সম্মেলনের আওতায় পড়ে না।

তারা বলেন, দখলদার বাহিনী ও যোগসাজশকারীদের এই নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের নজির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা বলেন, বাংলাদেশের দখলদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের সাথে নাজিদের বর্বরতারই তুলনা করা চলে। বিবৃতিতে এসব বুদ্ধিজীবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও তাদের এজেন্টদের আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : কবি শামসুর রাহমান, জনাব আবদুল আজিজ, ব্যারিস্টার মুস্তফা কামাল, হাসান হাফিজুর রহমান, আহমদ রফিক, বেগম ফেরদৌসী রহমান, সরদার জয়েনউদ্দিন আহমদ হুমায়ূন, নেয়ামুল বশীর, ফজল শাহাবউদ্দিন, আমিনুল ইসলাম বেদু, আনোয়ার হোসেন খান ও মুস্তফা কামাল আব্বাসী।

দৈনিক বাংলা, ২৮-১২-১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন মামলা

ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট

(স্টাফ রিপোর্টার)

আল বদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় ঢাকার উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ড. এম,এ,এ, আজাদ পিএইচডি, হত্যা মামলায় গোয়েন্দা বিভাগ দুজনের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যা ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঢাকার ইভনিং পোস্ট পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুল বাশার গত ২৪শে জানুয়ারি লালবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টার সময় আলবদর বাহিনীর ৫ জন লোক শাহ সাহেব বাড়ির শাহ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র জুবায়েরের সাথে ড. আজাদের আজিমপুরের দায়রা শরীফস্থিত বাড়িতে হানা দেয় এবং ড. আজাদকে অপহরণ করে।

বাদি তার অভিযোগে আরো বলেন যে, তিনি আজাদের বড় ভাই এবং অপহরণের খবর পেয়ে বাড়ি ছুটে আসেন। ঘটনার সময় সেই বাড়িতে তাদের ভাই আবুল খায়ের, জাকির হোসেন ও বোন সালমা ও সেলিনা উপস্থিত ছিল এবং তাদের মাও ছিলেন। সেলিনা বাদিকে বলেন যে, একজন বদর বাহিনীর লোককে তিনি চিনতে পেরেছেন এবং দেখলে শনাক্ত করতে পারবেন। বদর বাহিনীর লোকরা মুখোশ পরে এসেছিল। জুবায়ের বাদিকে জানায় যে, ড. আজাদকে আজিমপুরের রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হাজী কাশেমের বাড়িতে খোঁজ করে ড. আজাদকে না পাওয়ার পর লালবাগ থানায় যোগাযোগ করলে ওসি সাহেব বলেন যে, ড. আজাদকে বদর বাহিনীর লোক ধরে নিয়ে গেছে তাকে উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাদি এজাহারে বলেন যে, ১৭ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার ডোবা থেকে মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সহায়তায় ড. আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে এবং বুকে, মাথায় গুলির দাগ এবং বেয়নেটের খোঁচা ছিল।

হাবিবুল বাশারের এজাহার দাখিলের পর লালবাগ থানায় একটি মামলা রুজু হয়।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে আসামি মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে উল্লেখ করেন যে ড. আজাদকে অপহরণ করার পর দুষ্কৃতকারীরা আজিমপুর মহল্লার কাজী মন্টু, কাজী মতিউর রহমান এবং ভুলু ওরফে বদরউদ্দীনকে অপহরণ করে এবং যে মাইক্রোবাসে ড. আজাদকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই একই বাসে সবাইকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জানুয়ারি মাসের দুই তারিকে আসামি মকবুল ও আয়ুব আলী যখন একটি লঞ্চে মুন্সিগঞ্জে যাচ্ছিল তখন অপহৃত মতির ভাই মুস্তাফিজুর রহমান তাদের চিনে ফেলে এবং লঞ্চের যাত্রীদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করে। মুক্তিবাহিনীর কাছে লঞ্চের যাত্রীরা আসামিদ্বয়কে সোপর্দ করার পর তারা আসামিদের লালবাগ থানায় নিয়ে আসে। আসামি মকবুল হোসেন ১৫ই ডিসেম্বর অপরাধ সংঘটনের সময় যে কালো চশমা পরেছিল তাকে আটক করার সময়ও তার চোখে সেই চশমা লাগানো ছিল। পুলিশ চশমাটি আটক করে। তদন্তকালীন আসামিদের শনাক্তকরণ প্যারেডে হাজির করা হলে সাক্ষীরা তাদের শনাক্ত করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর তার দায়েরকৃত চার্জশীটে উল্লেখ করেন যে, অপরাধ সংঘটিত হয় দেশের মুক্তির পূর্বের দিন। এটা স্থির যে আসামিদের সে সময় খুবই শক্তি বা ক্ষমতা ছিল এবং তারা কার্যকরভাবে দখলদার পাকবাহিনীর সহায়তা করেছে এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করেছে। ড. আজাদকে অপহরণ ও হত্যা তারাই করেছে এবং এভাবে দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে।

ঢাকার এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এ মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরিত হওয়ার পর স্পেশাল জজ সৈয়দ সিরাজউদ্দীন আহমদ আগামী ১৯ জুন আসামিদের বিচারের দিন ধার্য করেছেন।

দৈনিক বাংলা, ১৩-৬-১৯৭২

অবিলম্বে তদন্ত কমিশন গঠন করুন : জহির রায়হান

(স্টাফ রিপোর্টার)

দৈনিক সংবাদ-এর যুগ্ম সম্পাদক জনাব শহীদুল্লা কায়সারের অনুজ বিশিষ্ট লেখক ও চিত্রপরিচালক জনাব জহির রায়হান কুখ্যাত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের জন্য আর কালবিলম্ব না করে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের জোর দাবি জানিয়েছেন। তিনি আল-বদর এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল বদর ছাড়াও তাদের সহযোগীদের তালিকা পাওয়া গেছে। সুসংগঠিত সরকারি উদ্যোগে এদের গ্রেফতার করা আশু কর্তব্য। এছাড়া এই বিরাট ষড়যন্ত্রের নায়ক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এ সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য সরকারের জানা দরকার।

তিনি নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্যে সরকারের মুক্তিবাহিনীর ও গেরিলাসহ সকল স্তরের জনসাধারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রতি মহল্লা, পাড়া, গ্রাম, গঞ্জে জনগণের ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় সশস্ত্র পলাতক অপরাধীদের খুঁজে বের করা অসম্ভব নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, যেসব দলিলপত্র পাওয়া গেছে তাতে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ও নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে অনেকে ভোল পাল্টে আবার সাধারণের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এদের ও গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

তিনি মনে করেন যে, ব্যাপক তল্লাশি চালালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সন্ধান হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া শনাক্ত করা যায়নি এরূপ ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোকে মর্যাদার সাথে সমাহিত করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

মরহুম অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ভাই জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সাপ্তাহিক হলিডের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব এনায়েতুল্লাহ খান ও বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের জনাব গিয়াস কামাল ও এ আলোচনায় অংশ নেন।

এ সম্পর্কে আশু কর্মসূচি গ্রহণ ও সরকারের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য আজ বুধবার সকাল ১১টায় প্রেসক্লাবে একটি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ২৯-১২-১৯৭১

বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক এবং তাদের গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার ঢাকা প্রেসক্লাবে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী।

গঠিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব জহির রায়হান, জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব হাসান ইমাম ও ড. সিরাজুল ইসলাম।

জনাব জহির রায়হান কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সভায় বক্তৃতা করেন, জনাব জহির রায়হান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডা. সিরাজুল ইসলাম, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব আলী আশরাফ, হাসান ইমাম, সরদার জয়েনউদ্দিন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আতাউস সামাদ ও জনাব খোন্দকার আবদুল কাদের।

সভায় আলোচ্য কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিকেলে প্রেসক্লাবে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এক সভায় কমিটির নাম 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ত্বরান্বিত করার তাগিদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্য সমবায়ে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সংগঠন অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে সমস্ত মৃতদেহ এখনও রায়েরবাজারের বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পড়ে রয়েছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার জন্য কমিটির আবেদন জানিয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত মৃতদেহ এলোপাতাড়িভাবে মাটিচাপা পড়ে আছে সেগুলোকে উপযুক্ত স্থানে দাফনের ব্যবস্থা করার জন্যে এবং প্রয়োজনবোধে এলাকাকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।

কমিটি জানিয়েছেন যে, প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই হত্যাকাণ্ডে খবরাখবর কমিটিকে দেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়া নিখোঁজ ব্যক্তি ও নির্যাতন সম্পর্কে কমিটিকে তথ্য জানানোর জন্য 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা-২, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ করতে চান তাহলে উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিটির সাথে দেখা করতে পারবেন।

পূর্বদেশ, ৩০-১২-১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ড তদন্তের আশ্বাস

ঢাকা, ৩০শে ডিসেম্বর (এপিবি)।-'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র একটি প্রতিনিধিদল আজ বিকেলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেছেন। প্রতিনিধিদলটি পাকবাহিনী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী আল-বদর কর্তৃক সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে তদন্ত চালানোর জন্যে মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী, সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

ফ্যাসিবাদী নরঘাতকদের দালাল এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদদের ব্যাপারে অবিলম্বে এই কমিটির কাজ শুরু করার জন্যে এই প্রতিনিধিদলটি জোর দাবি জানান।

প্রতিনিধি দলটি প্রেসিডেন্টের কাছে এখনও রায়েরবাজার এবং অন্যান্য এলাকায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্যেও দাবি জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটরি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রতিনিধিদলটির দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে অবিলম্বে 'কার্যকরী ব্যবস্থা' গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এখনও যে এসব কুখ্যাত ব্যক্তি জনগণের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেজন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন এবং জাতির এই শত্রুদের নির্মূল করার জন্যে কমিটি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেজন্যে তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

যারা এই কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি ও তিনি গভীর সমবেদনা জানান।

পূর্বদেশ, ৩১-১২-১৯৭১

বুদ্ধিজীবীদের নিধন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করুন

ফ্যাসিস্ট আল-বদর ও অনুরূপ অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা সম্পর্কিত কোনো তথ্য, কাগজপত্র, দলিলপত্র ও এতদসংক্রান্ত খবরাখবর 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এপিবির খবরে প্রকাশ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করা যেতে পারে এমন কোনো সূত্র কারো জানা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তা উক্ত কমিটিকে জানাতে বলা হয়েছে।

প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ১টা পর্যন্ত ঢাকা প্রেসক্লাব উক্ত কমিটির কাছে এসব তথ্যাদি পেশ করা যাবে।

দৈনিক বাংলা, ৩১-১২-১৯৭১

সৈয়দ নজরুল সকাশে তথ্যানুসন্ধান কমিটি বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ

বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক প্রতিনিধিদল গতকাল বৃহস্পতিবার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেন। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশে যে পাইকারি গণহত্যা সম্পন্ন করেছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তারা একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্ট আল-বদর বাহিনী এবং কোনো কোনো বিদেশী সংস্থা ও পাকিস্তানি বাহিনীস্থ আল-বদরের উপদেষ্টারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে, সে সম্পর্কে ও উক্ত কমিটি তথ্যানুসন্ধান করবে।

মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি নাগরিকদের নিয়ে উক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্যে ও তাঁরা সুপারিশ করেন। কুখ্যাত হত্যাকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার এবং রায়ের বাজার ও অন্যান্য স্থানে এখনো যে সব লাশ পড়ে রয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে সেগুলোকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করার জন্যেও তাঁরা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এপিবি জানান যে তাদের এসব দাবি সম্পর্কে অবিলম্বে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কমিটিকে আশ্বাস দেন।

পূর্ববর্তী খবরে প্রকাশ, গত বুধবার ঢাকা প্রেসক্লাবে বুদ্ধিজীবীদের এক বৈঠকে বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের সংঘবদ্ধ হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক ও এর পশ্চাতে যে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে তা উদ্‌ঘাটন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের অনুরোধ করা হয়। এই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি।

এই কমিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ত্বরান্বিত করার তাগিদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে মুক্তিবাহিনী এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্য সমবায়ে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সংগঠন অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে সমস্ত মৃতদেহ এখনো রায়ের বাজারের বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পড়ে রয়েছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার জন্য কমিটি আবেদন জানিয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত মৃতদেহ এলোপাতাড়িভাবে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকে উপযুক্ত দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে এলাকাটিকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য কমিটি সু'রিশ করেছেন।

কমিটি প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। নিখোঁজ নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্যও কমিটিকে জানাবার অনুরোধ করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেও কমিটির কাছে উপরোক্ত সময়ে বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে।

দৈনিক বাংলা, ৩১-১২-১৯৭১

বদরবাহিনীর নেপথ্য কাহিনী

(আজাদের রিপোর্ট)

বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর কমিটির দফর সম্পাদক 'মওলানা' আবদুল খালেক গতকাল শুক্রবার জানায় যে, বিগত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ডিসেম্বর 'পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা' কাজে নিয়োজিত তিনজন জামাত কর্মীকে মোট সাত হাজার টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বে-আইনী ঘোষিত ইসলামী ছাত্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক শওকত এমরান পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করে।

গতকাল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক কথিত বদর বাহিনীর দুর্ধর্ষ পাণ্ডা আবদুল খালেক 'আজাদ' প্রতিনিধির সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ তথ্য প্রকাশ করে সে জানায় যে, ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর আমীর 'অধ্যাপক' গোলাম সারওয়ারের নির্দেশেই এই টাকা প্রদান করা হয়।

সাক্ষাৎকারে আবদুল খালেক আরো বলে, জামাতকর্মী ও পূর্বদেশ-এর ষ্টাফ রিপোর্টার চৌধুরী মঈনুদ্দীন গত ১৩ই ডিসেম্বর তাকে জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের বাসা চিনিয়ে দিতে বলেছিল।

উল্লেখ্য যে, উক্ত চৌধুরী মঈনুদ্দীনই ছিল ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানের 'অপারেশনাল চীফ' এবং আবদুল খালেক কায়েতটুলীতে অবস্থিত জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের বাসভবনের সন্নিকটে বসবাস করত। ফ্যাসিস্ট বদর বাহিনী গত ১৪ই ডিসেম্বর কড়া কারফিউর মধ্যে জনাব কায়সারকে অপহরণ করে এবং সম্ভবত তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে কথিত বদর বাহিনীর পাণ্ডা আবদুল খালেক [মজুমদার] এই রিপোর্টারকে জানান যে, ঢাকায় বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানে আড়াই শতাধিক ব্যক্তি তৎপর ছিল। এই অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী চৌদ্দজনের নাম সে ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে কলেজের শিক্ষক, পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও ছাপাখানার মালিকও রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে আবদুল খালেক স্বীকার করে যে, জামাতে ইসলামীর তহবিল থেকে সে মাসিক সোয়া তিনশত টাকা ভাতা গ্রহণ করত।

দৈনিক আজাদ, ১৫.১.১৯৭২

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্তের ব্যাপারে গঠনমূলক কাজ হয়নি : নাফিসা কবীর

।। স্টাফ রিপোর্টার।।

বেগম নাফিসা কবীর সরাসরি অভিযোগ করেছেন বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্তের ব্যাপারে কোনো গঠনমূলক কাজ করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন অব্যাহত এই বুদ্ধিজীবী অপহরণে শুধু দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীই নয় বিদেশী শক্তিরও হাত রয়েছে।

তিনি বলেন, জহির রায়হান এমন সব তথ্য উদ্ধার করেছিলেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেগম নাফিসা কবীর গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে একাডেমীর স্মরণ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, দু'মাস পেরুতে চলে, এখনো এই হত্যারহস্যের কোনো কিনারা হলো না। বেগম কবীর বলেন, আল-বদর, আল-শামস জাতীয় বাহিনীতে শুধু অবাঙালি ছিল না, বাঙালিও ছিল। যারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে।

বেগম নাফিসা কবীর দাবি করেন, সরকারের এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত যাতে জনগণ নিঃশঙ্ক হতে পারেন এবং বাকি বুদ্ধিজীবীরাও নিরাপদ বোধ করতে পারেন। তিনি গভীর অনুতাপের সাথে বলেন, যদি তা না হয় তাহলে আমরা নিজেরাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হবো।

উল্লেখযোগ্য যে, বেগম নাফিসা কবীর শহীদ শহীদুল্লা কায়সার ও এখনো রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ জহির রায়হানের বোন। তিনি সপ্তাহখানেক আগে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন।

বাংলা একাডেমী আয়োজিত এই আলোচনা সভায় ড. নীলিমা ইব্রাহিম সভানেতৃত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে শহীদ অধ্যাপক ও অন্যদের সম্পর্কে ভাষণদানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, অধ্যাপকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছেন তারা শুধু শিক্ষক হিসেবে কৃতী ছিলেন না, ছাত্রজীবনেও তারা ছিলেন উজ্জ্বল। তিনি বলেন, তারা সবাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ছিলেন।

শহীদ সাংবাদিকদের কীর্তি নিয়ে আলোচনাকালে বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কেজি মুস্তফা বলেন, শহীদ সাংবাদিকদের শূন্য স্থান পূরণ করা কষ্টকর হবে। জনাব মুস্তফা

---

* সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী দলের সহসভাপতি। ১০ আগস্ট '৭১ ঢাকার অদূরে মীরকাদিমে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা এই কুখ্যাত দালালকে গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ সাংবাদিকদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সভায় ডা. এম এ কাদরী ও অধ্যাপক আবদুল হালিম ও বক্তৃতা দেন।

দৈনিক বাংলা, ১৮-২-১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাই
শহরে বিক্ষোভ সভা ও মিছিল

॥ স্টাফ রিপোর্টার॥

বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী গতকাল রোববার বলেন যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার জন্যে দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিচার করা না হলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের দাবিতে গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত বিরাট বিক্ষোভ সভায় জনাব কবীর চৌধুরী একথা বলেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে।

এর আগে বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের সদস্য-সদস্যাগণ রাজপথে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

অশ্রুসজল ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাংলাদেশের মানস সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার আশু বিচার ও হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দেন বেগম লিলি চৌধুরী, বেগম শহীদুল্লা কায়সার, বেগম সুচন্দা রায়হান, বেগম আলতাফ মাহমুদ, বেগম সাইদুল হাসান, বেগম আলীম চৌধুরী, চিত্রনায়িকা ববিতা, বেগম শামসুদ্দিন প্রমুখ এবং নিহত বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পত্নী ও প্রিয়জন।

তাদের এ দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি জসীমউদ্দীন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কমরেড অনীল মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আসম আবদুর রব, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হায়দার আনোয়ার খান জুনো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহসানুল হক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডক্টর আলী হায়দার, বাংলাদেশ স্থপতি সমিতির জনাব মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান ইমাম, বাংলাদেশ চিকিৎসা সমিতির সভাপতি ডা. আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে কাজী মমতা হেনা, 'পূর্বদেশ' সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী. ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ শান্তি

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ, ছায়ানটের অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন, সাহিত্যিক জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক জনাব শওকত আনোয়ার, সাংস্কৃতিক মুক্তি শিবিরের পক্ষে জনাব আলী নকী ও এ সভার আহ্বায়িকা শহীদ শহীদুল্লা কায়সার-জহির রায়হানের বোন বেগম নাফিসা কবীর।

সভাপতির ভাষণে জনাব কবীর চৌধুরী বলেছেন যে, স্বাধীনতা-উত্তরের তিন মাস পরে ও নিহত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণ কেন আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, বাংলাদেশের সরকারকে অবশ্যই তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও দেশের বাইরে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে।

কমরেড অনীল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত আল-বদর মূলত এখানে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের স্বার্থেই কাজ করেছে।

সংগ্রামী ছাত্রনেতা জনাব আসম আবদুর রব বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাইতে আজ সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে কেন? বাংলাদেশ সরকার জনগণেরই সরকার। এটা সরকারেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, নিহত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। তাই তাদের পরিবারবর্গের পাশে আমরাও রয়েছি।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার জন্যে দায়ী বদর বাহিনীর লোকেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে আত্মগোপন করে রয়েছে। এদের খুঁজে বের করে বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে অনেক আগেই আরো সক্রিয় হয়ে উঠা উচিত ছিল।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দখলদার পাক বাহিনী ও কুখ্যাত বদর বাহিনী ছাড়াও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

দৈনিক বাংলা, ২৮-২-১৯৭২

শিগগিরই প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

কুয়ালালামপুর, ৬ই জুন (পিটিআই)- 'মানবতা বিরোধী অপরাধের' দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ও প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজ একথা বলেন।

চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরশেষে জনাব সামাদ আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধাবন্দিদের বিচার শিগগিরই শুরু হবে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করানো হচ্ছে। রয়টার জানিয়েছে, পরে কুয়ালালামপুর থেকে সিঙ্গাপুর পৌছে জনাব সামাদ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের লুকোবার কিছুই নেই। যাদেরকে বিচার করার জন্য আনা হবে তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমরা জড়িত করব না।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এমন সব যুদ্ধাপরাধী রয়েছে যাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এসব যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দেয়ার জন্য জনাব ভুট্টোর ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমরা এসব যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দিতে রাজি হব না।

দৈনিক বাংলা, ৭-৬-১৯৭২

বাংলাদেশে দখলদার বর্বর পাক বাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম দেয়া হল :

১. অধ্যাপক আবদুল সাত্তার, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।
২. মাওলানা রুহুল আমীন আতীকী, বেআইনী ঘোষিত নেজামে ইসলাম ও খলিফারহাট, নোয়াখালী থেকে নির্বাচনে পরাজিত এম এন এ।
৩. তসলিম উদ্দিন আহমদ, সাবেক এসডিও, ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর।
৪. আবদুল ওহাব, উকিল, বেআইনী ঘোষিত নোয়াখালী জেলা পিডিপির সেক্রেটারী।
৫. মাসুদ মুক্তার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, নোয়াখালী জেলা সিএমএল (নিষিদ্ধ ঘোষিত)।
৬. খুরশেদ আলম তালুকদার, বেআইনী ঘোষিত পিএমএল, বগুড়া।
৭. আবদুল মজিদ, এডভোকেট, বাকেরগঞ্জ।
৮. জালাল আহমদ, এনএসএফ, নোয়াখালী।
৯. মাসুদুল হক, নিষিদ্ধ ঘোষিত পিএমএল, নোয়াখালী।
১০. আবদুস সালাম (রাজাকার কমান্ডার), বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ।
১১. আবদুল কবীর (রাজাকার), বরগুনা পটুয়াখালী।
১২. মো. মেহের আলী মোড়ল (রাজাকার), মনিরামপুর, যশোর।
১৩. সোমর আলী সরদার (রাজকার), সাতক্ষীরা, খুলনা।
১৪. আবদুর রাজ্জাক (রাজাকার), চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।
১৫. আতিক (রাজাকার), মীরপুর, ঢাকা।
১৬. মো. লিয়াকত আলী (রাজাকার), নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী।
১৭. খুরশেদ আলী (রাজাকার), নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী।
১৮. আবদুল লতিফ (রাজাকার), মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৯. নাজমুল হক (আল-বদর), নকলা, ময়মনসিংহ।
২০. খলিলুল্লাহ (আল-বদর), নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।
২১. সিপাই আবদুল হামিদ গাজী, মনিরামপুর, যশোর।
২২. পুলিশ কনস্টেবল আশরাফ হোসেন, ঢাকা।
২৩. আবুল কালাম আজাদ, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

২৪. কমরউদ্দিন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
২৫. মনির আহমদ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।
২৬. কাজী গোলাম সারোয়ার, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৭. আবদুল খালেক, বাঞ্ছারামপুর, কুমিল্লা।

(*দৈনিক বাংলা*, ৭-১-১৯৭২)

আরও ১২৮ জন দালাল গ্রেফতার

ইয়াহিয়ার জল্লাদ চক্রের আরো বহু দালালদের গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে কয়েকজনের নাম দেয়া হলো :

অধ্যাপক সিদ্দিক আহমদ, নড়াইল কলেজ যশোর; চট্টগ্রাম রেলওয়ের সাবেক সিনিয়র পারসোনাল অফিসার, এসএম সোলায়মান, বগুড়ার খোরশেদ আলম তালুকদার (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), বগুড়া শহরের মোহাম্মদ এজাহারুল হক (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী), সাতকানিয়ার ফারুক আহমদ চৌধুরী (নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ) বগুড়ার তবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান নাজির আহমদ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের নুরু মিয়া (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), বগুড়ার হাবিবুর রহমান (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী) চট্টগ্রামের আবদুল জলিল চৌধুরী (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের আখতার আহমদ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক (মুজাহিদ), চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মোহাম্মদ মিয়া (রাজাকার), চট্টগ্রামের মোহাম্মদ নূরুল মোস্তফা (মুজাহিদ), চট্টগ্রামের নাজির হোসেন (রাজাকার), চট্টগ্রামের মহেশখালীর নুরুল হক (রাজাকার), চট্টগ্রামের চকোরিয়ার শামসুল হুদা (রাজাকার), চট্টগ্রামের টেকনাফের বাচা মিয়া, চট্টগ্রামের সাব্বির আহমদ্দ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার দর্শনার আবদুল সাত্তার, কুষ্টিয়ার দামুর হুদার ওসমান আলী, কুষ্টিয়ার দামুরহুদার শাহ আলম, বগুড়ার পাঁচবিবির জয়দার আলী মন্ডল, কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গার মোহাম্মদ হানিফ, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর আয়াজউদ্দিন, কুষ্টিয়া শহরের মোহাম্মদ ইসমাইল, বগুড়ার আব্বাস আলী মণ্ডল, (রাজাকার), বগুড়ার সিদ্দিক তালুকদার (রাজাকার), বগুড়ার বুদ্ধা শেখ, চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর আবদুল জলিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার মোহাম্মদ শফি, চট্টগ্রামের ডবল মুরিংয়ের এসএম মহিবুল হক, চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনীর মোহাম্মদ জাকারিয়া, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের সাজিদুল হক, পটুয়াখালীর আবদুল কাদির, চট্টগ্রামের পটিয়ার আবদুস সাত্তার, চট্টগ্রামের ইমাম হোসেন, চট্টগ্রামের আনোয়ারার আহমদ সফা, চট্টগ্রামের ডবলমুরিংয়ের মোহাম্মদ রমজান, ঢাকার আবুল বাসার খান, ঢাকার তেজগাঁর জাহাঙ্গীর কবীর, ঢাকার কমলাপুরের শেখ শামসুদ্দিন, ফরিদপুরের মোকসেদপুরের মিয়া আবদুল সালাম, বাখরগঞ্জের রফিকউদ্দিন তালুকদার (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী), ঢাকার মিরপুরের মমতাজ আলী (আলবদর),

ঢাকার সুত্রাপুরের চুনু মিয়া (রাজাকার), ডা. আবদুল রহমান ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামীর সভাপতি), মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান ওরফে কাঞ্চন মিয়া) নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ), এম সৈয়দ আবদুল মজিদ সাবেক জেলা কৃষি অফিসার পটুয়াখালী, রাজবাড়ীর ওবায়দুল্লা মজুমদার (নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ) ফরিদপুরের কোতোয়ালী থানা শান্তি কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান খোন্দকার নূরুল হোসেন, পটুয়াখালীর গলাচিপার রাজাকার কমান্ডার মোহাম্মদ শাহজাদা, বাখরগঞ্জের আবদুল খালেক মুক্তার, ফরিদপুর শহরের গোলাম গফুর, মোক্তার, পটুয়াখালীর বেতাগীর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী আবদুল আজিজ হাওলাদার, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের মোহাম্মদ আলী, ঢাকার সাভারের ফুলচাঁদ। নোয়াখালীর সেনবাগের আবদুল করিম, ঢাকার সুত্রাপুরের আবদুল রশিদ, ঢাকার সাভারের ইসমাইল হোসেন, কুমিল্লার কচুয়ার আবদুল মজিদ, ফরিদপুরের চাঁদমিয়া, কুমিল্লার জামাল আহমদ, ঢাকার তেজগাঁর তমিজউদ্দিন, ঢাকার মানিকগঞ্জের কায়েদ আলী, ঢাকার মীরপুরের শরীফ হোসেন, ফরিদপুরের জান হাবিব, ফরিদপুরের মানিকদার হান্নান চৌধুরী, ফরিদপুরের সাইফুল্লাহ মিয়া, ফরিদপুরের আবুল খায়ের, ফরিদপুরের ইউসুফ আলী বেপারী, ফরিদপুরের রাজবাড়ীর নাশিম আহমদ, ঢাকা শহরের আলী আহমদ, ঢাকার লালবাগের আবদুল মালেক, ঢাকার সুত্রাপুরের নবাব মিয়া, পটুয়াখালীর মোসলেম শিকদার, বাখরগঞ্জের কাঠালিয়ার আবদুল কাদের মীর।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর, মুজিবুর রহমান মোল্লা, সাবেক এমপিএ, শান্তি কমিটির সদস্য, বাকেরগঞ্জ, আবদুল জলিল খান, সাবেক এমপিএ, মুলাদী, বাকেরগঞ্জ, মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, পিরোজপুর সরকারী বিদ্যালয়ের সাবেক হেডমাস্টার, বাকেরগঞ্জ, ডা. সায়েদ আলী, এমবিবিএস, ফরিদপুর; শাহ আলম চৌধুরী, (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ভোলা : আবদুল মজিদ মুন্সী, এডভোকেট, নলিছিটি, বাকেরগঞ্জ; হাসমত আলী খান, মুক্তার (বেআইনি ঘোষিত পিএমএল) মাদারীপুর, ফরিদপুর; আবদুল করিম মোল্লা, (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ফরিদপুর; খোন্দকার আবদুল হামিদ (বেআইনী ঘোষিত পিডিপি), ফরিদপুর শহর; খন্দকার মহিউদ্দিন, এডভোকেট (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), ফরিদপুর; মওলানা আবদুস সাত্তার (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), মাদারীপুর, ফরিদপুর, মিনহাজউদ্দিন আহমদ খান, এডভোকেট, কোতওয়ালী, বাকেরগঞ্জ; আবদুর রাজ্জাক, হাবিব ব্যাংক, ফরিদপুর; আবদুল জব্বার হাওলাদার (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল) মাদারীপুর, ফরিদপুর; মোহাম্মদ হায়দর হোসেন, ক্লার্ক, এসডিও অফিস, মাদারীপুর; মোহাম্মদ ওয়ারেস মাস্টার (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল) ভোলা; জিএ তরিকুল আলম, ভোলা; আবদুল্লাহ (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ভোলা; মোস্তফা আবু ইসহাক, এডিবি, পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; মওলানা মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, তজমুদ্দিন, ভোলা; আবদুল বারী খান, নাজিরপুর শান্তি কমিটির সদস্য, বাকেরগঞ্জ; খন্দকার আবদুল বারী, পুলিশের এস আই,

বাকেরগঞ্জ জেলা। আবদুল জলিল, পুলিশের এএসআই বাকেরগঞ্জ; হেড কন্সটেবল সোহরাব হোসেন, বাকেরগঞ্জ, মোহাম্মদ ইসমাইল (আল-মুজাহিদ), পটুয়াখালী; মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (আল-শামস), গলাচিপা, পটুয়াখালী। আজিজুর রহমান, কোতওয়ালী, বাকেরগঞ্জ; বসিরউল্লাহ (আল-শামস), লালমোহন, বাকেরগঞ্জ; মোহাম্মদ জালালউদ্দিন (আল-বদর), পটুয়াখালী, ওবায়দুর রহমান (আলবদর) লালমোহন, বাকেরগঞ্জ; আবদুল জলিল সিকদার, (আল-বদর), পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; হাবিবুর রহমান (আল-বদর,) মুলাদী, বাকেরগঞ্জ; এ কে, এম. আবদুল্লাহ (রাজাকার), ভোলা শহর; আবদুল বারেক (রাজাকার), ভোলা শহর; মোহসিন বিল্লা, দৌলতপুর, বাকেরগঞ্জ; হারুনুর রশীদ (রাজাকার), পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; জাবেদ আলী বেপারী (রাজাকার), মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ; জামিল আহমদ (রাজাকার), বাকেরগঞ্জ; আবদুল মালেক (রাজাকার), ঝালকাঠি; রুস্তম আলী গাজী (রাজাকার), বাকেরগঞ্জ; আবদুল রশীদ জমাদার (রাজাকার কমান্ডার), মাদারীপুর, ফরিদপুর টাউন, এস আই অব পুলিশ, এম এ মুহিত চৌধুরী, ফরিদপুর, লুৎফর রহমান খান, এসআই অব পুলিশ, ফরিদপুর, ফজলুল হক হাওলাদার (বেআইনী ঘোষিত পিডিপি), মাদারীপুর, ফরিদপুর; এসআই অব পুলিশ ফজলুল হক, বাকেরগঞ্জ।

দৈনিক বাংলা, ১৩-১-১৯৭২

আরও ৩৭ জন দালাল গ্রেফতার

বাংলাদেশে বর্বর পাক দখলদার বাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও বহুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে তাদের নাম দেওয়া হলো :

সৈয়দ ইকবাল আহমদ, ঢাকা রেডিওর সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর : এ আর এম ফজলুর রহমান, বড় মগবাজার, ঢাকা, সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী, সিভিল এফেয়ার্স; আবদুর রাজ্জাক, (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), কুমিল্লার মতলব থেকে তথাকথিত উপনির্বাচনে নির্বাচিত এমপি এ; সোলেমান, (সাবেক এমপিএ), ভেদরগঞ্জ, ফরিদপুর; গোলাম রব্বানী খান, রাজশাহী বেতারের সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেকটর; আবু শাহাদত, ঢাকা বেতারের সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর; ফজল করিম, ভাইস চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম পৌরসভা; মওলানা হাবিবুর রহমান (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, জীবননগর, কুষ্টিয়া, ডা. কাজী শামসুজ্জোহা, কুষ্টিয়া; এম আর সারোয়ার, সাবেক মেজর, পাক-সেনাবাহিনী, চট্টগ্রাম; সৈয়দ মনজুরুল আহসান, নাজিমউদ্দিন রোড, ঢাকা; তোফাজ্জল হোসেন, চেয়ারম্যান, টাউন কমিটি, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম; সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (রাজাকার), কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; আজিজুর রহমান, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পাক কেপি ওয়ার্কস লিমিটেড, চট্টগ্রাম; পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, মুজাফফর ইসলাম, সাবেক ওসি, জয়দেবপুর, ঢাকা; শরাফত আলী (বেআইনী ঘোষিত পি এম এল), চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন কাউন্সিল শ্রীপুর, ঢাকা ; মসিউল আজম (বেআইনী

ঘোষিত পিএমএল, চট্টগ্রাম; মাহবুবর আশরাফ, সেকেন্ড অফিসার, মুসলিম কমার্সিয়াল ব্যাংক, চট্টগ্রাম; আবদুল হাকিম (রাজাকার), কোতওয়ালী ঢাকা; আবুল খায়ের (আল-বদর), হাজিগঞ্জ, কুমিল্লা; শেখ মুসলিম আহমদ, এএসআই পুলিশ, খুলনা; এ.কে.এম জাহাঙ্গীর (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল), এডভোকেট হাফিজ মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, বুরহানউদ্দিন, বাকেরগঞ্জ, মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ; মোহাম্মদ শাহজাহান, মনোহরদী, ঢাকা; তোফায়েল আহমদ, রায়পুরা, ঢাকা; এসএম রিজভী, সাবেক ওসি; কোতওয়ালী, ময়মনসিংহ; নওয়াব আলী, জয়দেবপুর, ঢাকা; মফিজউদ্দিন, জয়দেবপুর, ঢাকা; আবদুল হাকিম, (রাজাকার), মোহাম্মদপুর, ঢাকা; সিরাজুল ইসলাম (আল-বদর) মনোহরদী, ঢাকা; শেখ জাফর ফারুক, জেটি সুপারভাইজার, চট্টগ্রাম; শামসুল হক, যশোর শান্তি কমিটির সদস্য, সদরউদ্দিন মোল্লা, যশোর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী; আবদুল জলিল, যশোর কমিটির সদস্য; বিল্লাল বিশ্বাস (রাজাকার কমান্ডার), যশোর ও আজমল হোসেন, তেজগাঁও, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ১৪-১-১৯৭২

আরও ৩৮ জন দালাল গ্রেফতার

বাংলাদেশে দখলদার বর্বর পাকবাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও বহুসংখ্যক দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নীচে তাদের নাম দেওয়া হল :

হাফিজুল ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ঢাকা; মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পাবনা থেকে বেআইনী ঘোষিত পিডিএম'র টিকেটে তথাকথিত উপনির্বাচনে নির্বাচিত এমপিএ; নূর হোসেন, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর, ময়মনসিংহ শান্তি কমিটির সদস্য; আলী হায়দর মোল্লা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, বিশেষ ব্রাঞ্চ; আবদুল হাই (রাজাকার কমান্ডার), গফরগাঁও ময়মনসিংহ, আবদুল হাকিম, হালুয়াঘাট শান্তি কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ; মোহাম্মদ মুসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; মোহাম্মদ হোসেন, রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম; আজিজুদ্দিন আহমদ, একাউন্টেন্ট, ফিশারী বিভাগ রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আবদুল হাকিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর আলম, কোতওয়ালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; আবেদ আলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান, কুমিল্লা; আবদুল করিম, সূত্রাপুর, ঢাকা; সায়েদ আলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; পাকোন মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা সাইদুর রহমান, নবীনগর, কুমিল্লা, কালাচাঁদ (রাজাকার), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; নাসিরুদ্দিন আহমদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; আবুল হোসেন, লক্ষীপুর, নোয়াখালী; চানমিয়া (রাজাকার), মুরাদনগর, কুমিল্লা, সরাফুল আলী চৌকিদার, ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী; জয়নাল আবেদীন; আজমিরীগঞ্জ, সিলেট; আবদুল ওয়াদুদ, লাকসাম কুমিল্লা। মোহাম্মদ হানিফ খান, টঙ্গিবাড়ী, ঢাকা; মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সূত্রাপুর, ঢাকা; জহুরুল

হক, রায়পুরা, নোয়াখালী; আবুল মনসুর আহমদ, কাপাসিয়া, ঢাকা আবদুস সোবহান, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা; আবদুল (রাজাকার), রায়পুরা, নোয়াখালী; এ এ তারেক, (আল-বদর কমান্ডার), মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ফয়জুল্লা খান, রেলওয়ে কলোনী, ঢাকা; আমীর হোসেন (রাজাকার), পটুয়াখালী; নাজিম আহমদ (রাজাকার), হাজারীবাগ, ঢাকা; মোহাম্মদ সেলিম, (রাজাকার) হাজারীবাগ, ঢাকা; রমিজউদ্দিন (রাজাকার), দোহার, ঢাকা; আবু মুরিদ চৌধুরী (রাজাকার) ঢাকা ও মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন, কুষ্টিয়া।

দৈনিক বাংলা, ১৫-১-১৯৭২

৮৮ জন আল-বদর পাণ্ডা ভালমানুষ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজও এদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুমিল্লা, ৬ই মার্চ। কুমিল্লার গণহত্যায় পাক দস্যুদের অন্যতম দোসর (জামাতে ইসলাম ও ছাত্রসংঘের সদস্য) ফ্যাসিস্ট আলবদরের ৮৮ জন পাণ্ডার একটা তালিকা বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া গেছে। এরা মাসিক মাষ্টার রোলে বেতন পেত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরা জঘন্য অপরাধ করেও বর্তমানে গ্রামে গ্রামে ভাল মানুষ সেজে সমাজে বেড়াচ্ছে। অথচ এদের চোখ না এড়ায়ে তখন শহরে চলা ভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সদস্যের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এদের চক্রান্তেই নিহত হয়েছিল কুমিল্লার প্রখ্যাত আইনজীবী যতীন ভদ্রের দুই পুত্র কাজল আর রতন। ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের বহিঃক্রীড়া সম্পাদক প্রিয়লাল ঘোষ, শাহওনেওয়াজ, মিন্টু এবং আরো অনেকে। জল্লাদের কারাগারে অবর্ণনীয় ও অসহ্য মরণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আলী হোসেন চৌধুরীর ন্যায় অসংখ্য ছাত্রকর্মী। এরাই যোগিয়েছিল কেপ্টিন বোখারী, মেজর মস্তফা ও মেজর সেলিমসহ অন্যান্য নরখাদকের যৌন ভোগের সামগ্রী। নীচে এসব পাণ্ডাদের নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা দেয়া হলো।

কুমিল্লা

আবু খায়ের, হাজিগঞ্জ, কোম্পানী কমান্ডার শাহমুস্তবা জাহাঙ্গীর, (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, ৩য় বর্ষ সম্মানের ছাত্র, ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি) পিতা শাহ আলম চৌধুরী, চরখালী মুরাদনগর কুমিল্লা। প্লাটুন কমান্ডার সামছুল হক, (ছাত্রসংঘ জেলা শাখার সেক্রেটারি) পিতা–আবদুল জাব্বার, কাশীনাথপুর কোতয়ালী কুমিল্লা। আবদুর রব, পিতা আবদুল লতিফ, নরপায়া, লাকশাম, কুমিল্লা। আবদুল বারি, পিতা ডাঃ আবদুল আজিজ, জঙ্গালপুর, কোতয়ালী কুমিল্লা। আবদুল জলিল পিতা মৃত মুকসুদুর রহমান, সায়েস্তানগর চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা। মো. ইসমাইল পিতা আলী আহমদ, জাঙ্গালীয়া কোতয়ালী, কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম পিতা মো. হোসেন মাষ্টার শ্রীরামপুর,

কচুয়া, কুমিল্লা, এ. কে. এম আতিকুল হক পিতা মুন্সী মুহাম্মদ ইয়াহিয়া প্রতাপপুর চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা। সৈয়দ আহমদ ছিদ্দিক পিতা মওলানা নুর মোহাম্মদ, মোগলটুলী, কোতয়ালী, কুমিল্লা। খোরশেদ আলম পিতা মো. সোনা মিয়া, দৌলতপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. হারুন মিয়া, পিতা আছমত আলী, বলারামপুর, কোতআলী কুমিল্লা। শহিদুল হক পিতা আবদুল মজিদ, কাশীনাথপুর, কোতআলী, কুমিল্লা, মঞ্জুরুল কাদের পিতা আবুল হোসেন, কোটবাড়ী কুমিল্লা। মো. মহসীন, পিতা মো. সুরুজ মিয়া কাশীনাথপুর কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. আমান হোসেন, পিতা মইদার আলী, বলারামপুর, কোতয়ালী কুমিল্লা। ছগীর আহমদ চৌধুরী, পিতা আবদুর রসিদ চৌধুরী, বজ্রপুর কুমিল্লা। মো. আবদুল মান্নান, পিতা মো. তানু মিয়া, ছারপাড়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। এ, মজিদ সরকার পিতা এ, হামিদ সরকার, শিবপুর, কচুয়া, কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম মজমুদার পিতা ডাঃ ইজ্জত আলী, জোটপট্টি কোতয়ালী, কুমিল্লা। মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা মো. এ আউয়াল, শ্রীরামপুর কচুয়া কুমিল্লা। আবু সুফিয়ান, পিতা আজিজুর রহমান হরিচাইল কচুয়া কুমিল্লা। এ ছালাম পিতা তৈয়বুর রহমান হরিপুর লাকসাম কুমিল্লা। মো. আমিনুল হক পিতা মজিবুল হক, কুরকুটা ঐ। মো. নাজমুল হুদা পিতা সেকান্দার আলী দেবপুর হাজিগঞ্জ। মো. একরামুল হক পিতা মো. শামছুল হক, নাটেরা চৌদ্দগ্রাম, আবদুর রহমান পিতা জব্বার আলী, ছোট বেরুলা লাকসাম কুমিল্লা। মো. আবদুল হাই, পিতা আলহাজ মো. হোসেন চৌদ্দদোনা, লাকসাম কুমিল্লা। মো. আলী পিতা মো. আম্বর আলী মোহাম্মদপুর লাকসাম, কুমিল্লা। মো. শহিদউল্লা পিতা মো. সুলতান আহমদ গুলিয়ারা, ঐ, মো. আবুল হাশেম, পিতা আনোয়ারউল্লা শ্মশানপুর, ঐ। আজিজুর রহমান মজুমদার, পিতা আবদুল জাব্বার মজুমদার চৌদ্দদোনা, ঐ, আবু তাহের পিতা মফিজুর রহমান, বেতীহাটা ঐ। খালেদ বিন জমির, পিতা অধ্যাপক জমিন উদ্দিন উজীর দীঘির দক্ষিণপাড়, কোতয়ালী, কুমিল্লা। এ রহিম পিতা সেকান্দার আলী বেতাহাটা লাকসাম কুমিল্লা। নজরুল ইসলাম পিতা মাস্টার বজলুর রহমান, আদ্রা, ঐ। নুরুল আমীন, পিতা মুন্সী সেকান্দর আলী, দৌলতপুর, ঐ। মোস্তফা কামাল, পিতা খলিলুর রহমান নওসোদা, ঐ। গোলাম মোস্তফা, পিতা মকবুল আহমদ কুরকুটা ঐ। সুলতান আহমদ ভুইয়া পিতা এ হাকিমভুআ চক্রনিধি ঐ। মোবারক হোসেন পিতা সিদ্দিকুর রহমান, দৌলতপুর ঐ, মকবুল আহমদ, পিতা আলী আজম, হেজাখালী, ঐ, মুসলিমুর রহমান, পিতা আলী মিয়া, কামাড্ডা, ঐ; আবুল কাসেম আনসারী, পিতা-আমীর হোসেন, কুমড়ার ডোগা, ঐ এ, আউয়াল, পিতা-সুন্দর আলী সরকার, মস্তফাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা; নুরুল ইসলাম, পিতা-আলী আহমদ, সোমেশপুর, লাকসাম, কুমিল্লা। এ রউফ, পিতা-সুন্দর আলী, মস্তফাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা। ইউনুস মিয়া, পিতা-আলী আহমদ, গোপালনগর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। নইমুল হক,

পিতা-মওলানা সিরাজুল হক, বিটেশ্বর, লাকসাম, কুমিল্লা। সুলতান আহমদ, পিতা-আমীর হোসেন, মুরাদ গ্রাম ঐ, হেদায়েত উল্লা, পিতা-নুরুজ্জামান, বুছইয়া, ঐ, হোসেন আহমদ, পিতা আলি আজম, শ্রীহাসা, ঐ, সিরাজুল ইসলাম, পিতা-সফর আলী ঐ; আবুল বাসার, পিতা-সিরাজ উদ্দীন, দাউদপুর ঐ; আবুল বাসার, পিতা-ফজলুর রহমান, শ্রীহাসা, ঐ; রুহুল আমিন, পিতা-ধনামিয়া, বিষ্ণুপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, আনিসুল হক, পিতা-মোহাম্মদ আলী, নসাড্ডা, লাকসাম; মঞ্জুর মোরশেদ, পিতা-আবুল হোসেন, কোটবাড়ী, কোতয়ালী, এরশাদ উল্লাহ, পিতা এ, কাদের, মুলপাড়া, ফরিদগঞ্জ, কুমিল্লা; আফাজ উদ্দিন, পিতা-আব্দুল হামিদ, ঐ শাজাহান, পিতা-আবুল কালাম, ঐ, আবু সালেহ পিতা-মান্নান, ঢোলঘর, লাকসাম, কুমিল্লা; নুরুল আমিন, পিতা-মো. ইয়াছীন, কামতলী, ঐ আব্দুল অদুদ, পিতা-আব্দুল রফিক, চর্থা, কুমিল্লা, এ, কে, এম, আব্দুল হান্নান, পিতা-আজহার আলী, খোদকিষ্ট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, ঐ, মকবুল আহমদ, পিতা আলী আজম, হেজাখালী, ঐ, মুসলিমুর রহমান, পিতা আলী মিয়া, এ. কে, এম আবুল বাসার মজুমদার, পিতা দুদা মিয়া মজুমদার, দৌলতপুর; আতিক উল্লাহ, পিতা ইয়াকুব আলী, সোবেশপুর, ঐ, নূর মোহাম্মদ, পিতা ফজর আলী, জাহানাবাদ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী আবু তাহের, পিতা নুরুল হক, রুদাপুর, লাকসাম, কুমিল্লা, আমিন উল্লা, পিতা-মজিবুল হক, সরাসপুর, ঐ, খোরশেদ আলম, পিতা মাস্টার নোয়াব আলী, ভোসই, ঐ, হেদায়েত উল্লাহ, পিতা মজিবুল হক, দেবপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, সেরাজুল ইসলাম, পিতা সৈয়দ আলী, গালিমপুর, বরুরা, কুমিল্লা, (এ, কে, এম আজম বাহান চৌধুরী, পিতা জয়নাব আলী চৌধুরী, বরুরা, কুমিল্লা, মো. খোরশেদ আলম, পিতা ডাঃ এম, এ, বারী, দেইচর, বরুরা, কুমিল্লা; রুস্তম আলী পাটওয়ারী, পিতা রজব আলী পাটওয়ারী, শাকপুর, ঐ, এ. বি. এম. শহিদুল হক খন্দকার, পিতা আবদুস ছামাদ খন্দকার, ঐ। এ, হাই, পিতা এ জলিল, নীদপুর, কচুয়া, কুমিল্লা, খোরশেদ আলম, পিতা মো. মোজাফফর, কইত গ্রাম, মুরাদনগর, কুমিল্লা, এম, আবদুল কুদ্দুস, পিতা এ, রহমান, দাওঘর; ঐ, এ, টি, এম. নাসির উদ্দীন, পিতা এ, রহমান, ঐ, এ, মতিন, পিতা লুৎফুর রহমান, সলাপুর, লাকসাম, কুমিল্লা, মো. সোলেমান, পিতা মুসলিম মোহাম্মদ ইউসুফ, বাংঘর, লাকসাম, কুমিল্লা; আবদুল মোস্তাহার, পিতা, এ লতিফ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, মোস্তফা হোসেন, পিতা সাইয়েদুল হক, চাঁদপুর, লাকসাম, কুমিল্লা; নুরুল হক মজুমদার, পিতা গোলাম কাদির মজুমদার; মুরাদ মুরাদগ্রাম, ঐ, সফিউল্লা, পিতা, সুলতান আহমদ, শাহাপুর, ঐ; নেয়ামত উল্লা, পিতা-মজিবুর রহমান, কুমারবাগ, ঐ; এ, হক, পিতা-রহমত আলী মাস্টার।

দৈনিক আজাদ ৭.৩.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা
নাসির আহমেদের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত

গতকাল ৩রা জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমানের এজলাসে শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার শুনানীর প্রথম দিনে বাদী পক্ষের একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়।

নিহত শহীদুল্লাহ কায়সারের ভগ্নিপতি এবং এই মামলার অভিযোগ প্রদানকারী জনাব নাসির আহমদ তার সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার মুক্তিসংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। গত সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর সাত-আটজন লোক তাদের কায়েতটুলির বাস ভবনের দরোজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের কাছে স্টেনগান, রাইফেল ও রিভলবার ছিল। তাদের পরনে ছাই রংয়ের পোশাক ছিল। আমি তাদের আল-বদর বাহিনীর লোক বলে বুঝতে পারি। তারা শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পথ রোধ করে দাঁড়ালে তাদের স্টেনের বাট দিয়ে ধাক্কা দেয়া হয়। তারপর জনাব কায়সারকে খোঁজা শুরু হয়। দেশ মুক্ত হবার পর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বহু বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়। কিন্তু তার লাশ পাওয়া যায়নি। পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন যে আসামী খালেক ঘটনার দিন শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজ করছিল এবং আসামী একজন জামাত কর্মী ও বদর বাহিনীর লোক।

বাদী আসামীকে কাঠগড়ায় সনাক্ত করে বলেন যে তিনি এ মামলার অপর সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব আসামীর বাড়ী যান। তার বাড়ী তল্লাশী করা হয় এবং মিলিটারীর সাথে যোগাযোগ সম্বলিত কিছু কাগজপত্র ও কয়েকটি ফটো উদ্ধার করেন। আসামীকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করে। সাক্ষী তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে শহীদুল্লাহ কায়সারের সহোদর জহির রায়হানের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং সে সমস্ত কাগজ পত্রও এখন পাওয়া যাচ্ছে না। জবানবন্দি শেষ হবার পর আসামীর কৌশুলীর জেরার জবাবে নাসির আহমেদ বলেন যে ঘটনার দিনে টেলিফোন করে থানায় শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের কথা বলা হয়। সে সমস্ত বস্তুত পক্ষে থানায় কোনো কাজ হতো না। আর একটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মেজর হায়দারের নির্দেশে আসামীর বাড়ী তল্লাশী ও আসামীকে পরবর্তী সময়ে মুক্তিবাহিনীর গ্রেফতার করে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে গোয়েন্দ পুলিশ ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর আব্দুল খালেক মজুমদারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারা ও দালাল আদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছে। আগামীকাল পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে জনাব সাফকাত হোসেন মামলা পরিচালনা করেছেন।

দৈনিক বাংলা, ৪-৭-১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা :
দ্বিতীয় দিনে আটজনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গতকাল মঙ্গলবার (৪ জুলাই) ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এফ রহমানের এজলাসে বদর বাহিনী কর্তৃক শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিনে সরকার পক্ষের মোট আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিনে সাক্ষ্য প্রদান করেন মরহুম শহীদুল্লাহ কায়সারের কনিষ্ঠ সহোদর জাকারিয়া হাবিব, তার স্ত্রী নীলা জাকারিয়া। মরহুমের স্ত্রী সাইফুন নাহার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম হাজিফ মো. আশরাফউদ্দিন ও আরও তিন ব্যক্তি।

মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করে মরহুম শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী সাইফুন নাহার বলেন যে, গত সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর কয়েকজন বদর বাহিনীর লোক তাদের দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের পরনে ছাই রংয়ের পোশাক ও হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। শহর নিস্প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘরের আলো জ্বেলে দেন এবং এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েন যে আল-বদর ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে এবং তার স্বামী একজন বুদ্ধিজীবী ও দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত। মিসেস সাইফুন নাহার তার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে বদর বাহিনীর তিনজন লোক দোতলা থেকে তার স্বামী ও দেবরকে টেনে নিয়ে যায় এবং তিনি ও অন্যান্যরা চিৎকার করে তাদের ছেড়ে দিতে বলেন। জাকারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বদর বাহিনীর লোক তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যায়নি।

মিসেস সাইফুন নাহার আদালত কক্ষে আসামীকে সনাক্ত করে বলেন যে সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে আসামীকে তিনি কখনও দেখেননি এবং খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছিল কি না জানেন না।

বাদীপক্ষের ছয় নম্বর সাক্ষী ঢাকা জেলা প্রশাসক অফিসের একজন কর্মচারী আদালতে আসামীর রিভলভারের দরখাস্ত ও লাইসেন্সের ক্রমিক নাম্বার ইত্যাদি পেশা করে বলেন যে আসামী ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে রিভলভারের লাইসেন্স গ্রহণ করে। তার দরখাস্তটি ঢাকার তদানীন্তন মার্শাল ল সাব সেক্টর অফিসের মেজরকে দিয়ে সুপারিশ করান হয়। রিভলভার কেনার কারণ হিসেবে আসামী তার দরখাস্তে উল্লেখ করে যে সে জামাত-ই-ইসলামী অফিসের দপ্তর সম্পাদক ও একজন পাকিস্তাপন্থী। দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্যই তার রিভলভার দরকার বলে সে আবেদনে জানায়।

মামলার শুনানীর এক পর্যায়ে আসামী খালেক মজুমদার মিসেস সাইফুন নাহারকে মাননীয় স্পেশাল জজের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করেন-ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে আমাকে গ্রেফতার করে আপনাদের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় এবং আপনি আমাকে ধরে বার বার প্রশ্ন করেন, বল আমার স্বামী কোথায়?

-বলুন এটা সত্য কি না?

সাইফুন নাহার বলেন, না আমি আপনাকে দেখিনি।

মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিনে মাননীয় জজ সাহেবের এজলাসে বিপুল দর্শকের সমাগম ঘটে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যা করার দায়ে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক আবদুল খালেক মজুমদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল মামলার পুনরায় শুনানী শুরু হবে। এই চাঞ্চল্যকর মামলাটি বাদীপক্ষে স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এস এ সাফকাত হোসেন পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা, ৫-৭-১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা : তৃতীয় দিনে ১২ জনের সাক্ষ্য

গতকাল ৫ই জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এপ, রহমানের এজলাসে আলবদর বাহিনী কর্তৃক শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানীর তৃতীয় দিনে বাদীপক্ষের মোট বারোজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিনে সাক্ষ্য প্রদান করেন মরহুম শহীদুল্লাহর কনিষ্ঠা ভগ্নি সাহানা বেগম, ম্যাজিস্ট্রেট মো. সলিমুল্লা, একজন পুলিশ কর্মচারী ও মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জনাব এ, কে, এম শামসুদ্দিন।

মরহুমের ভগ্নি সাহানা বেগম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে বদর বাহিনীর লোক তাদের বাড়ীর দরোজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাঁর বড়দা শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে যায়। সাহানা বেগম এজলাসে আসামীকে সনাক্ত করেন।

আসামী পক্ষের কৌশুলীর প্রশ্নের জবাবে সাহানা বেগম বলেন যে তিনি টিআই প্যারেডের পূর্বে আসামীকে কখনও দেখেননি। আসামীর কৌশুলী এ সময় আদালতে গত সালের ২৪শে ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পূর্বদেশ আদালতে পেশ করেন। উক্ত দু'টি কাগজ আসামী আবদুল খালেক মজুমদারের ছবি সমেত মুক্তিবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার খবর ছাপা হয়েছিল।

আগামীকাল মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হবে। মামলাটি সরকার পক্ষ সিনিয়র স্পেশাল লিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এস, এম, সাফকাত হোসেন ও চৌধুরী তাহের আহমদ পরিচালনা করেছে।

দৈনিক বাংলা, ৬-৭-১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার শেষ শুনানী

গতকাল শুক্রবার ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল জজ জনাব এফ রহমানের এজলাশে শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী শেষ হয়।

মাননীয় স্পেশাল জজ এই চাঞ্চল্যকর বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলাটির আগামী ১৭ই জুলাই রায় দানের দিন ার্য করেন।

সরকার পক্ষের সাক্ষ্য প্রদান শেষ হবার পর ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পড়ে শোনানোর পর পাঞ্জাবী, পায়জামা ও টুপি পরিহিত আসামী আবদুল খালেক মজুমদার জজ সাহেবের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে সে নির্দোষ এবং তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।

বাদীপক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার খন্দকার মাহবুব হোসেন যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে বলেন যে আসামীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে তার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বেগম শহীদুল্লাহ কায়সার এবং মরহুমের ভগ্নি ও ভ্রাতৃবধূ আসামীকে সনাক্ত করেন। আসামী পক্ষের কৌশুলী জনাব সাফকাত হোসেন বলেন যে অভিযুক্ত আবদুল খালেক মজুমদার জামাতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক ও বেতনভুক্ত কর্মচারী কিন্তু জামাতের কর্মী হলেই সে দালাল আদেশে সাজা পাবে এর কোনো কারণ নেই। সাক্ষীরা সবই একত্রে মনে হয় কিছু চেপে গেছেন এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে গরমিল আছে।

আসামী পক্ষের কৌশুলী আরও বলেন যে পাক সামরিক চক্র সে সময় দেশে অমানুষিক নির্যতান করেছে এবং আলবদর ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। জামাতে ইসলামী দলের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রিয়জনকে হারানোর নিমিত্ত সাক্ষীদের মনে হয় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেই ঘৃণা ও বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ হয়েছে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদানে।

দৈনিক বাংলা, ৮-৭-১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা :

জামাত নেতা খালেকের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা

গতকাল ১৭ই জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল পাক হানাদার বাহিনীর দোসর আলবদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী নিধন মামলায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় প্রদান করে বেআইনী জামাতে ইসলামীর বেতনভুক্ত দফতর সম্পদক এ, বি, এম আবদুল খালেককে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

মাননীয় স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমান আসামীকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৬নং ধারা ও দালাল আদেশের দ্বিতীয় তফসিলের কতিপয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন যে আসামী হত্যা করার জন্য পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে। এই চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যা

মামলায় অভিযোগ আনা হয় যে, আলবদর বাহিনীর সদস্য ও জামাতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক হিসেবে আসামী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দখলদার পাক বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখার জন্য তাদের সমর্থন ও সাহায্য করে। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগে বলা হয় যে গত ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আসামী চার/পাঁচজন আলবদর সদস্য সাথে করে নিহত শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দোতলার একটি ঘর থেকে মরহুমকে ধরে নিয়ে যায় হত্যা করার উদ্দেশ্যে। আসামীদের হাতে স্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্র ছিল এবং বাড়ির মহিলারা চিৎকার করে বাধা দিলে তাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। তখন কারফিউ বলবৎ ছিল। দেশ শত্রু মুক্ত হবার পর বহু তল্লাশী করার পর মরহুমের লাশ পাওয়া যায়নি। ২০শে ডিসেম্বর থানায় এজাহার দায়ের করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দা পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে।

মামলায় সরকার পক্ষে তেরোজন সাক্ষ্য প্রদান করেন। তন্মধ্যে মরহুমের স্ত্রী, বোন, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী এরা আসামীকে সনাক্ত করে বলেন যে অপহরণকারী আলবদর বাহিনীর মধ্যে আসামী ও ছিল। আসামী ছোট কাটারা মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ধৃত হবার পর তার ছবি কাগজে ছাপা হয়েছিল এ জন্য সাক্ষীরা আসামীর ছবি দেখে সনাক্ত করছে। আসামী পক্ষের কোঁশুলীর এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞ জজ বলেন যে সাক্ষীরা শিক্ষিত এবং তাদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

জজ সাহেব রায়ে আরও উল্লেখ করেন যে দখলদার আমলে আসামী রিভলবারের লাইসেন্সের জন্য যে দরখাস্ত করেছে তাতে সে নিজেই নিজেকে পাকিস্তানবাদী বলে উল্লেখ করেছে তাছাড়া সরকার পক্ষের একজন বিশ্বাসী সাক্ষী বলেছেন যে আসামী কারফিউ এর সময় রাতে এমনকি পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পূর্বের রাতেও ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু জজ সাহেব প্রশ্ন রাখেন পাক বাহিনীর দালাল ছাড়া সে সময় অমন ভাবে ঘোরা সম্ভব ছিল কি?

সংবাদ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও অন্যতম সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় শোনার জন্য বিপুল দশকের আগমন হয়।

মামলাটি সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এডভোকেট এম. এম সাফকাত হোসেন পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা : ১৮-৭-১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা

ড. আজাদের ভ্রাতার সাক্ষ্য গৃহীত-গতকাল সোমবার ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এসএম সিরাজুদ্দিনের এজলাসে আল-বদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. এম.এ. কে আজাদ হত্যা মামলার শুনানী শুরু হয়। মামলায় শুনানীর প্রথম দিনে মরহুম আজাদের কনিষ্ঠ সহোদর ঢাকার

ইভনিং পোস্টের সম্পাদক জনাব হাবিবুল বাশার তার সাক্ষ্যে বলেন যে তাঁর ভাই উচ্চতর কারিগরি ও বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে একজন গবেষক-শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর ভাই ড. আজাদ, মা ও অন্যান্য ভাইবোন সমেত আজিমপুরের দায়রা শরিফের একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। তিনি সস্ত্রীক ঐ বাড়িরই নিকটস্থ অন্য একটি বাড়িতে থাকতেন। ভাই-এর অপহরণের খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ছুটে আসেন এবং আসামী জুবায়েরকে দেখতে পেয়ে তাকে ভাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় যে ড. আজাদকে আজিমপুরস্থ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাজী কাসেমের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাজী কাসেমের বাড়ী যাওয়ার পর ড. আজাদের কোনো খবর না পাওয়ায় তিনি থানায় টেলিফোন করেন। তারপর বাড়ী আসার পর তাঁর মা ও অন্যান্য ভাইবোন যারা ড. আজাদকে অপহরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জানান যে চার-পাঁচ জন অস্ত্রধারী আল-বদরকে আসামী জুবায়ের তাদের বাড়ি দেখিয়ে দেয়, আল বদররা বাড়ী ঢুকে সমস্ত ঘর তল্লাশী করার পর ড. আজাদকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর মা ও বোনদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

বাদী তার সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করেন যে আল বদর বাহিনী ঐ একই সময়ে তাঁদের বাড়ীর সম্মুখস্থ অপর একটি বাড়ী থেকে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের দুই ভাই মতি ও মন্টুকে ধরে নিয়ে যায়। মন্টু নিহত হয় এবং মতি জীবন্ত ফিরে আসে। এর কাছ থেকে খবর জানার পর রায়েরবাজারের বধ্যভূমি থেকে ড. আজাদের মৃতদেহ আনা হয়। মৃতদেহের গায়ে বুলেট ও বেয়নেটের মারাত্মক জখম চিহ্ন ছিল। তাঁকে উপুড় করা হয় এবং দুটি হাত বেঁধে রাখা হয়।

আসামী পক্ষের একজন কৌশুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী হাবিবুল বাশার বলেন যে মুসলিম লীগার ওয়াহিদুজ্জামানের এক পুত্র তার পত্রিকার সাথে প্রায় মাস খানেকের জন্য যুক্ত ছিল ২৫শে মার্চের পর তিনি পত্রিকা বন্ধ করে দেন কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করা শুরু করেন। কৌশুলীর অপর একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে তাঁর স্ত্রী বার্মিজ বংশোদ্ভূত এবং তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীরা করাচীতে বাস করছেন একথা সত্য নয়। আর একটি প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে ১৯৭১ সালের মে মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দশজন পত্রিকা সম্পাদকের সাথে তিনিও সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে করাচীতে একটি কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন।

ড. আজাদ হত্যা মামলায় গোয়েন্দা পুলিশ মকবুল হোসেন, আয়ুব আলী ও জুবায়েরের বিরুদ্ধে নরহত্যা, অপহরণ ও দালালীর জন্য চার্জশীট দায়ের করেছে।

বাদীর জেরা সমাপ্ত হবার পূর্বেই পরবর্তী দিনের জন্য মামলার শুনানী মুলতবী রাখা হয়।

বাদী পক্ষ স্পেশাল পিপি আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়ের, মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে মো. আজম, জোয়ারদার ও ফয়জুদ্দীন।

দৈনিক বাংলা : ১২-৯-১৯৭২

শুনানীর ২য় দিনে তিনজনের সাক্ষ্য ও জেরা

গতকাল ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এস. এম সিরাজুদ্দিনের এজলাসে আলবদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার দ্বিতীয় দিনে বাদী পক্ষে মোট তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিন বাদীর জেরা শেষ হবার পর মরহুম ড. আজাদের ভগ্নিপতি জনাব সিরাজুল হক ও সহোদর জাকির হোসেনের সাক্ষ্য প্রদান করার পর কৌশুলী পক্ষকে জেরা করা হয়। সরকার পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী জনাব সিরাজুল হক বলেন যে দেশ শত্রুমুক্ত হবার পূর্বের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর ড. আজাদের অপহরণের খবর পাবার পর তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ছুটে আসেন এবং শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে জানতে পারেন যে কয়েকজন খাকি পোশাকধারী আলবদরের লোক ড. আজাদকে ধরে নিয়ে গেছে।

গতকালের উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী জাকির হোসেন বলেন যে ঘটনার দিন সকালে তিনি বাথরুম থেকে বেরোনের পর ফিসফাঁস শব্দে জানালা খুলে দেখতে পান পাঁচজন খাকি পোশাকধারী লোক অস্ত্রশস্ত্র সমেত জোবায়ের এর সাথে কথা বলেছে। তারপর খাকি পোশাক পরা লোকজনেরা দরজা ধাক্কা দেয় এবং ড. আজাদ দরজা খুলে দেবার পর তারা প্রবেশ করে বলে যে আপনি ড. আজাদ? মরহুম হ্যাঁ সূচক জবাব দেবার পর তারা সমস্ত বাড়ী তল্লাশী করে এবং যাবার সময় ড. আজাদকে নিয়ে যাবার সময় মরহুমের মা কোহিনূর বেগম ও অন্যরা বাধা দিলে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। তারপর সাক্ষী ভাই হাবিবুল বাশারের বাড়ি ছুটে যেয়ে তাকে খবর দেয়।

সাক্ষী জাকির হোসেন বলেন যে আসামীদের মুখে রুমাল ও মাফলার জড়ানো ছিল। তবে কথা বলার সময় তাদের মুখ দেখা গেছে। একজন আসামীর চোখে একটি কালো গগলস ছিল। জাকির হোসেন আদালত কক্ষে আসামীদের সনাক্ত করেন। এ সময় আসামী পক্ষের একজন কৌশুলী আপত্তি দাখিল করেন।

আসামী জুবায়ের-এর কৌশুলী মোহাম্মদ আজমের একটি জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে তিনি মিথ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন না এবং ঘটনার সময় তিনি নিদ্রিত ছিলেন না।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি আবদুল রাজ্জাক খান, আসামী মকবুল হোসেনের পক্ষে এএম জোয়ারদার, আয়ুব আলীর পক্ষে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এডভোকেট ফয়জুদ্দীন ভুইয়া।

দৈনিক বাংলা : ১৩-৯-১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা :

ড. আজাদের মা ও বোনের সাক্ষ্য

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে জনাব এস, এম সিরাজুদ্দিনের এজলাসে ড. আজাদ হত্যা মামলার শুনানীর চতুর্থ দিনে মরহুম ড. আজাদের মাতা মিসেস কোহিনূর বেগম, কনিষ্ঠা ভগ্নী সেলিনা ও সালাম সমেত মোট দশজনের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এই মামলার অন্যতম আসামী আইয়ুব আলীর বাসস্থানের স্থানীয় ফুলপুর থানার কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে আইয়ুব আলী দখলদার আমলে উক্ত এলাকার একজন রাজাকার ছিল। সে দখলদার বাহিনীর নির্দেশে সেতু পাহারা দিত এবং জনসাধারণের পকেট তল্লাশী করতো। ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার তৎকালীন ওসি সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে তিনি আসামী আইয়ুব আলীর চরিত্র ও পূর্বাপর কার্যকলাপ তদন্ত করে বুঝতে পারেন যে সে একজন রাজাকার।

মরহুম আজাদের মা সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে ঘটনার দিন তার পুত্রের অপহরণ সম্পূর্ণভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আজাদকে যখন নিয়ে যায় তখন অপহরণকারীকে একজন জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তোমরা সবাইতো বাঙ্গালী, বল আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়।

বাদী পক্ষের দশম সাক্ষী মিস সালমা সোবহানের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হবার পর আদালতের অধিবেশন গতকালের মত শেষ হয়।

বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন স্পেশাল পি.পি আব্দুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়েরের পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ আজম, আসামী আইয়ুব আলীর পক্ষে সরকার নিযুক্ত উকিল ময়জুদ্দিন ভুঁইয়া ও আসামী মকবুল হোসেনের পক্ষে এডভোকেট এ. এম জোয়ারদার মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা : ১৬-৯-১৯৭২

মহাখালীর কুখ্যাত আল-বদর কম্যান্ডার সৈয়দ মোহাম্মদ রিজভী গ্রেফতার

মহাখালীর কুখ্যাত আল-বদর কম্যান্ডার সৈয়দ মোহাম্মদ রিজভী (৪৫) গতকাল মঙ্গলবার ধরা পড়েছে।

তেজগাঁ থানার সাব ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ আলী ও সাব ইন্সপেক্টর খন্দকার সাইফুল হুদা এই কুখ্যাত দালালটিকে মৌলভীবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন। রিজভীকে ২৯নং আবুল খায়ের রোড থেকে ধরা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে এই কুখ্যাত অবাঙালি দালালটি ছিল আল-বদর কমান্ডার ও মহাখালী শান্তি কমিটির সদস্য। এই আল-বদর পশুটি মহাখালী এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। পাক বাহিনীর অফিসারদের নারী নির্যাতনের সহযোগী ছাড়াও হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের কয়েকটি মামলা রয়েছে এর বিরুদ্ধে।

আল-বদর রিজভীকে গ্রেফতার করার পর তেজগাঁ থানায় বহুলোকের ভিড় হয়ে যায় এবং থানায় বিশেষ পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করতে হয়।

এই কুখ্যাত নরপশুর গুলিতে পঙ্গু বেশ কয়েকজন তরুণ ও মাঝারি বয়সের লোক থানায় আসেন। রিজভী নিজের হাতে তাদেরকে গুলি করেছিল। এদের একজনের তলপেটে এখনো গুলি রয়েছে। অন্যজনের পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এছাড়া বহু মুক্তিযোদ্ধাকে সে গুলী করে মেরেছে বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

দৈনিক বাংলা : ২০-৯-১৯৭২

ড. আজাদ হত্যা মামলার শেষ সওয়াল-জবাব

গত মঙ্গলববার ঢাকায় দুই নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ সৈয়দ সিরাজউদ্দিন আহমেদের কোর্টে আলবদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় বাংলার কৃতী সন্তান অঙ্কশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. এম এ কে আজাদ হত্যা মামলার সওয়াল-জবাব শেষ হয়। ট্রাইব্যুনাল আজ (বৃহস্পতিবার) এই মামলার রায় প্রদান করিবেন।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী আলবদরকে আসামী জুবাইর ড. আজাদের বাসা দেখাইয়া দেয়। তখন আলবদররা ড. আজাদের ৪৪নং আজিমপুরের বাসায় প্রবেশ করিয়া ড. আজাদকে তাঁহার মা, ভাই বোনদের সম্মুখ হইতে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিকারীরা তাহার মা ও বোনদের ধাক্কা দিয়ে ফেলিয়া দেয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুইদিন পর তাহারা রায়ের বাজারের একটি গর্ত হইতে ড. আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। দেহে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অনেক আঘাত ছিল।

আসামী মকবুলের উকিল জনাব জোয়ারদার ট্রাইব্যুনালে যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া বলেন, ড. আজাদের বাসার লোকজন ঠিকমত তাহার আসামীকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই এবং সরকার পক্ষ কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী কোর্টে আনয়ন করেন নাই। আসামী আইয়ুব আলীর পক্ষে সরকারী উকিল জনাব ফয়েজউদ্দিন ভূঞা বলেন সাক্ষী আবুল হোসেন ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী তাহার আসামীকে সনাক্ত করেন নাই। সরকার পক্ষ তাহার আসামীর বিরুদ্ধে মামলা ঠিকমতো প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

আসামী জুবাইয়ের উকিল জনাব মো. আযম যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন : আলবদরের লোক জোর করিয়া জুবাইরকে ড. আজাদের বাসা দেখাইয়া দিত। এই মামলায় সরকার পক্ষে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব আবদুর রাজ্জাক খান যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, ২৬ জন সাক্ষী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন এই আসামীরা ড. আজাদকে অপহরণ করিয়া হত্যা করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৫-১০-১৯৭২

জামায়াত ইসলামীর নেতা ও একাত্তরে মালেক মন্ত্রী সভার সদস্য মওলানা এ কে এম ইউসুফের বিচার

গত মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর '৭২) সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ কে এম ইউসুফকে এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনারের জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর কোর্টে হাজির করা হয়।

আসামী মওলানা ইউসুফ ১৯৭১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডা. মালিক মন্ত্রী পরিষদে রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। তাহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রকাশ, আগামী ১৯৭১ সালের তথাকথিত উপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া দখলদার বাহিনীর দালালী করেন। ইয়াহিয়ার পুতুল সরকারকে বাংলাদেশে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তিনি নানাস্থানে সভা করিয়া মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের খতম করিয়া পাক বাহিনী, রাজাকার ও বদর বাহিনীকে সহযোগিতা করার আবেদন জানান।

অভিযুক্ত আসামী ইউসুফের আবেদনক্রমে গতকাল মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হয় এবং আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর মামলার শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার খন্দকার মাহবুব হোসেন ও ঢাকা জেলা পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব রমজান আলী খান মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৫-১০-১৯৭২

বুদ্ধিজীবী ড. আজাদকে হত্যার দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইবুন্যালের সদস্য সৈয়দ সিরাজুদ্দীন আহমদ অঙ্কশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ড. আজাদকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত মকবুল, আয়ুব আলী ও জুবায়েরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

এই তিনজন যুবককে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ২ (খ) অনুচ্ছেদ বলে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আসামী জুবায়ের ওরফে আহমদ উল্লাহ আজিমপুর শাহ সাহেব বাড়ীর ছেলে ও ড. আজাদের ভাড়াটে বাড়ীর অন্যতম মালিক। অপর দুইজন আসামী ময়মনসিংহের লোক। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে আল-বদরের পাণ্ডারা দখলদার বাহিনীর দালাল সাজিয়া প্রদেশে যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ চালাইয়াছিল, সে সম্পর্কে ইহা ২য় মামলা। বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যার প্রথম মামলায় আসামী জামাতের আবদুল খালেককে ঢাকায় এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যার দায়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

প্রকাশ, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার সময় খাকী পোশাক পরিহিত ৫ জন আলবদরের লোক ড. আজাদকে তাহার ৪৪ নং আজিমপুর বাসা হইতে বলপূর্বক অপহরণ করে। ড. আজাদের মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য লোক ড. আজাদকে অপহরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আসামী জুবায়ের আলবদর সদস্যদিগকে ড. আজাদের বাসা দেখাইয়া দিয়াছিল। ড. আজদাকে বলপূর্বক নেওয়ার সময় তাহার মা ও বোন বাধা দিতে গেলে তাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়।

আলবদর বাহিনী ঐ একই সময়ে ড. আজাদের বাড়ীর নিকট বাড়ী হইতে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের দুই ভাই মতি ও মন্টুকে ধরিয়া নিয়া যায়।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুইদিন পর রায়ের বাজারের গর্ত হইতে ড. আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাহার দেহে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই গর্তে আরও কয়েকজনের লাশ ও পাওয়া যায়।

সরকার পক্ষে স্পেশাল পি,পি আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়ের, মকবুল ও আয়ুব আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে মেসার্স মো. আজম, জোয়ারদার ও ফয়জুদ্দিন ভুঁইয়া।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬-১০-১৯৭২

জামাতে ইসলামী নেতা

মওলানা ইউসুফের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৫ ডিসেম্বর '৭২-এর দৈনিক ইত্তেফাক থেকে : গতকাল (সোমবার) ঢাকার তিন নম্বর স্পেশাল জজ মি. এস, বি বড়ুয়ার এজলাসে বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী নেতা ও ডা. মালিক মন্ত্রী পরিষদের সাবেক রাজস্ব মন্ত্রী মওলানা এ, কে এম ইউসুফের দালালী মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। গতকাল মামলার শুনানীর প্রথম দিনে সরকার পক্ষের ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হইয়াছে। সরকার পক্ষের পহেলা সাক্ষী সি, আই, ডি ইন্সপেক্টর জনাব কে, এম, এ রাজ্জাক। তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি এই মামলার বাদী। তিনি বলেন আসামী ডা. মালিকের পুতুল সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিয়া মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় হানাদার বাহিনীকে সক্রিয়া সাহায্য দান করেন।

সাক্ষী বলেন যে, আসামী রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সভা সমিতি করিয়া জনগণকে হানাদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করিতে বলেন। তাহা ছাড়া জনসাধারণকে মুক্তিসেনাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে বলেন।

জনাব রাজ্জাক তাহার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, বাংলাদেশের উপর মিলিটারী শাসন চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত তিনি খুলনা হইতে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

আসামী পক্ষের কৌশুলীর জেরার জবাবে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের শাসন চালিত হয়। আরো একটি প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ দেখিয়াছেন।

অদ্য (মঙ্গলবার) এই মামলায় সরকার পক্ষের আরও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

সরকার পক্ষে রহিয়াছেন স্পেশাল পি পি জনাব আবদুর রাজ্জাক খান ও জনাব কফিলউদ্দীন আহমদ। আসামী পক্ষে রহিয়াছেন মেসার্স নাজিরুদ্দীন আহমেদ ও নজরুল ইসলাম।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৫-১২-১৯৭২

পরিশিষ্ট : ১

আলবদর

আলবদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড়। রাজাকার বাহিনীর পরই এটি গঠিত হয়। তবে রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তানী বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আলবদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাও ফরমান আলির নোটে আলবদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানী বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্তমান জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আলবদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী 'দৈনিক সংগ্রাম'- এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন-

'...আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিনশত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের সেই সর্বগুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আলবদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্, সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।'

'পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আলবদরের যুবকেরা এবারে বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তোজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচি দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতি ও তারা তুলে ধরতের সক্ষম। তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আলবদর বাহিনীর গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত

হয়। "জামালপুর মহকুমায় আলবদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান।...আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আলবদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। জানাচ্ছেন সাইয়িদ, "এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আশরাফুজ্জামানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আলবদর কমান্ডাররা অন্তর্ভূক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশের সুরার সদস্য শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল-

১। মোস্তফা শওকত ইমরান। ২। নূর মোহাম্মদ মল্লিক। ৩। এ. কে. মোহাম্মদ আলী। ৪। আবু মো. জাহাঙ্গীর। ৫। আশরাফুজ্জামান। ৬। আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস। ৭। সর্দার আবদুস সালাম।'

রাজাকারদের সঙ্গে আলবদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু, আলবদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুধাবন করেছিল, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও।

আলবদরদের হাতে কত জন খুন হয়েছেন তার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি। তবে, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের যে সব বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছেন তাদের একটা বড় অংশকে খুন করেছিল আলবদর বাহিনীর সদস্যরা।

জামাতে ইসলামী বিশেষত এর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ যা আলবদর নাম গ্রহণ করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল, তাদের নিষ্ঠুরতার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই আছে। বধ্যভূমিগুলোর ছবিগুলো দেখলে এবং বর্ণনা পড়লে মনে হয়, সে সময় এরা মানসিক সুস্থতা হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সেই বর্বরতার বিবরণ সুস্থ মানুষের না পড়াই উচিত, কারণ তাতে যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজেকে মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে ঘৃণা বোধ করবে। এ কারণে এই গ্রন্থে ও তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হলো না, তবে তাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা প্রদর্শনের জন্য সে সময়কার সংবাদপত্র থেকে দু'একটি প্রতিবেদন এই রচনায় উদ্ধৃত করা হবে।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে রাজাকার বাহিনী প্রধান ও শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ

অফিসারকে নিয়ে গোলাম আযম মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে যে রাজাকার ও আলবদর শিবির পরিদর্শন করেছিলেন, সেটি ছিল আলবদরের হেড কোয়ার্টার। স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকে আলবদররা প্রথমে চোখ বেঁধে এখানেই নিয়ে আসে। নির্যাতনের পরে এখান থেকেই তাঁদেরকে রায়ের বাজার ও মীরপুরের শিয়ালবাড়িসহ অন্যান্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

আল বদর বাহিনীর এই ক্রমবিকাশের বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আলবদর নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতি ও সংঘের কার্যক্রমের একটি মোটামুটি কালানুক্রমিক সারসংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য যে, আলবদর নেতারা সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের মতোই 'ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল' করার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এর পর থেকে তারা বিশেষত 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' 'ভারতীয় দালাল,' 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালাল' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মূল করার কথাই বার বার বলেছে।

১০ এপ্রিল ছাত্র সংঘের এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'দুষ্কৃতিকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে পুণ্যভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ছাত্র সংঘের প্রত্যেকটি কর্মী তাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের ঘৃণ্য চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য ছাত্র সংঘ কর্মীরা সেনা বাহিনীকে সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

১৩ মে ছাত্র সংঘের আর একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য ছাত্রসমাজকে দায়ী করা হয়। অথচ ছাত্রসংঘ কর্মীরাই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন ও সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তৎপর। ছাত্রনামধারী ভারতের সাম্রাজ্যবাদের যে সমস্ত চর তথাকথিত 'বাংলাদেশ' প্রচারণা চালিয়েছিল তারা ছাত্র সমাজের কলংক। তাদের জন্য সমুদয় ছাত্র সমাজকে দায়ী করা ঠিক নয়।

২ আগস্ট চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক ছাত্র-সুধী সমাবেশে আলবদর প্রধান মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'দেশপ্রেমিক জনগণ যদি ১লা মার্চ থেকে দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসত তবে দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ তাঁর প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ঈমানদার মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন ব্যর্থ হলো তখন আল্লাহ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেছেন।'

হাই কমান্ডের অপর সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি আবদুল জাহের মুহম্মদ আবু নাছের এই সভায় বলেন, 'ভারতের সকল চক্রান্ত নসাৎ করে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

সভাপতির ভাষণে চট্টগ্রাম ছাত্রসংঘ, রাজাকার ও আলবদর প্রধান মীর কাসেম আলী বলেন, 'গ্রাম গঞ্জের প্রত্যেকটি এলাকায় খুঁজে খুঁজে শত্রুর শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে।'

১০ আগস্ট ময়মনিসংহে ইসলামী ছাত্র সংঘ আয়োজিত সভায় মতিউর রহমান নিজামী সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বক্তারা 'রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি ও ভারতীয় এজেন্টদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রদেশের পল্লী এলাকাসমূহ সফর করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।' বক্তারা 'দেশের শত্রুদের খুঁজে বের করা এবং তাদের তালিকাবদ্ধ করার কাজে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সহায়তা করার জন্য দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান।'

১৪ আগস্ট আজাদী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংঘের সভা ও পরবর্তী মিছিলে মতিউর রহমান নিজামী নেতৃত্ব দেন। এই মিছিলে শ্লোগান দেওয়া হয় 'আমাদের রক্তে-পাকিস্তান টিকবে,' ভারতের দালালদের-খতম কর, খতম কর।' ইত্যাদি।

১৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ছাত্র সংঘের জমায়েতে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের দালালরা হিন্দুস্তান অন্তর্ভূক্তির আন্দোলন শুরু করেছিল। পাকিস্তানকে যারা আজিমপুরের গোরস্তান বলে আখ্যায়িত করেছিল, তাদের স্থান আজ পাক মাটিতে না হয় আগরতলা, কিংবা কোলকাতার শ্মশানে হয়েছে।'

এই সভায় করতালির মধ্যে আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ বলেন, 'ঘৃণ্য শত্রু ভারতকে দখল করার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদেরকে আসাম দখল করতে হবে। এ জন্য আপনারা সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।'

২৩ সেপ্টেম্বর আলবদর ক্যাম্প ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক চা-চক্রে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাদের এ দেশীয় দালালরা যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকরাই তাদেরকে কার্যকারীভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। যারা ইসলামকে ভালোবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালোবাসে। এইবারের উদঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

১৫ অক্টোবর প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় 'রাজাকার ও আলবদরদের ভূমিকা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ জনাব ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতি মাহমুদের তীব্র সমালোচনা করেন বলে গত বুধবার পি পি আই প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করছে।'

'অথচ সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যেমন জনাব জেড. এ. ভুট্টো, কাউসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার,

আলবদর ও অন্যান্য দেশহিতৈষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করছেন।'

'এসব নেতার এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।'

'পরিশেষে ছাত্র সংঘ নেতা ক্লাসে যোগদানের জন্য এবং সেই সঙ্গে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর ও দেশহিতৈষী ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।'

২৫ অক্টোবর তারিখে এক বিবৃতিতে আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ ১৭ রমজান বদর দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা আজ ইসলামী বিরোধী শক্তি এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই পবিত্র দিবসে আমরা জাতির স্বার্থে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করব।'

ইসলামী ছাত্র সংঘ ছিল সুশৃংখল, সুসংগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ইসলামী ছাত্র শিবির নামে পুনর্বাসিত এই দলটির সদস্যরা আজকের মতো সেদিন ও নেতৃবৃন্দের তদারকিতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ করত। আজকের মতো সেদিনও এদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিকৃত ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর ফলাফল কি হয়েছিল তা বোঝাবার জন্য এখানে ৭ নভেম্বর বদর দিবস উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত মাহফুজুল হক নামে জনৈক আলবদর কমান্ডারের লেখা 'আলবদর আলবদর আলবদর-থ্রি ওয়ান থ্রি, থ্রি ওয়ান থ্রি, নামক একাঙ্কিকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো। উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত মুষ্টিবদ্ধ হাতে সঙ্গীন রাইফেলের চিত্রসহ একাঙ্কিকাটির প্রথম অংশটি এরকম:

প্রস্তাবনা

ফারাবী, আজাদ, ফারুক, আশফাক, বদরুল। এরা ক'জন তরুণ সঙ্গীদের সাথে করেছে অঙ্গীকার। এরা বলে সঙ্গীন আমার বন্ধু। প্রশ্ন করলে এরা হাতের দু'আঙুলে তুলে দেখায় 'ভি' অর্থাৎ ভিক্টোরি। নিশ্চিত বিজয়। তিনশ' তের এদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাই প্রত্যয়দৃপ্ত শপথে এরা হাতিয়ার তুলে নেয়। রাইফেল, স্টেনগান, এল. এম. জি.র মাঝে খোঁজ নেয়া জিন্দেগির স্বপ্নিল ফুলঝুরি।

এক

(মোহসিন হলে ফারাবীর কক্ষ। টেবিল, চেয়ার, আলনা, এক গাদা বইতে সাজানো কক্ষ। ফারাবী আধশোয়া অবস্থায় বই পড়ছে। আজাদ ও ফারুকের প্রবেশ।)

আজাদ - কিরে এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?

ফারাবী - আরে তোরা -আয়- আয়-বোস্

ফারুক - কি পড়ছিলি?

ফারাবী - এই সাইয়েদ কুতুবের বইটা

আজাদ - তারপর কবে যাচ্ছিস?

ফারাবী - কোথায়?

আজাদ - কেন আশরাক তোকে কিছু বলেনি?

ফারাবী - ওহ, আলবদর ট্রেনিং এর কথা?

আজাদ - হ্যাঁ, আমরা তো সবাই আগামী দশ তারিখে যাচ্ছি ক্যাম্পে। তুইও যাচ্ছিস তো?

ফারাবী - নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যাব না কি বলছিস (একটু থেমে) সত্যি এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ এই দেশের বুকে দাঁড়িয়ে এমন প্রকাশ্যে সশস্ত্র ট্রেনিং লাভের সুযোগ পাচ্ছি দেখে। এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে- (থেমে) সত্যি তোদের আনন্দ লাগছে না?

আজাদ- কিন্তু এ আনন্দের সাথে মিশে আছে অনেক বেদনা, অনেক কান্নার ইতিহাস। আজ সারা দেশে কত শত শত মানুষকে শুধুমাত্র ইসলাম অনুসারী হবার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। খেজুরের কাঁটা বিছানো গর্তে জীবন্ত কবর দেওয়া হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিকভাবে চোখে, মুখে, বুকে গজাল ঠুকে ঠুকে হত্যা করা হচ্ছে। গরম লোহার শলাকা দিয়ে চোখ উপড়ে দিয়ে বলছে, বল আরও ইসলাম ইসলাম বলবি না কি? শুধু তাই নয়, এদের কেটে টুকরো টুকরো করে ছালায় ভরে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের রক্তে পদ্মা-যমুনার রক্ত লাল লাল হয়ে যাচ্ছে-

ফারুক - থাম, থাম আজাদ- থাম।

আজাদ - এদের দোষ, এদের দোষ এরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটা সুন্দর দেশরূপে গড়ে তুলবে। এরা চেয়েছিল এখানে আল্লাহর শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যাতে পাকিস্তানের মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, মোটা কাপড়, একটা আশ্রয়, একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। সারাদিন মাটির ঘর্মক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পায় কিছু সুখের হাতছানি-

ফরাবী-সেদিন শুনলাম মওলানা মাদানী* সাহেব শহীদ হয়েছেন-

আজাদ - শুধু মাদানী সাহেব কেন, এরকম প্রতিদিন কত শত শত মাদানী অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তার খবর রাখিস! গতকাল নোয়াখালী হতে টেলিগ্রাম এল, মাত্র দশ দিনে সেখানে পঞ্চাশ জন ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী শহীদ হয়েছেন (উদগত কান্না রোধ করে)- এসব ইতহাস বড় কান্নার ইতিহাস রে-বড় করুণ ইতিহাস-

ফারাবী - আচ্ছা আমরা ক'জনা যাচ্ছি তা হলে?

আজাদ - প্রথম ব্যাচে প্রায় শ'দুয়েক - পরে আরও আসতে পারে-

---

* সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী দলের সহসভাপতি। ১০ আগস্ট '৭১ ঢাকার অদূরে মীরকাদিমে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা এই কুখ্যাত দালালকে গুলি করে হত্যা করে।

ফারাবী - সত্যি আমার কি যে আনন্দ লাগছে আজ। আগে যখন ইসলামের ইতিহাস পড়তাম-বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধের ইতিহাস পড়তাম, তখন মনে হতো, আচ্ছা আমরাও অমন ইসলামী মুজাহিদ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারি না কেন? কেন আমরাও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পাই না? (একটু থেমে) সত্যি আজ সেই সোনালি সুযোগ এসেছে, সত্যি আজ কি যে আনন্দ লাগছে-কি আনন্দ!

ফারুক-আল বদর, আল বদর।

সমস্বরে-জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ

(সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে)

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় জামাতের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের লেখা এই সমস্ত রচনায় যে চিত্র বিধৃত হয়েছে সেটি তখনকার বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। এই শৃঙ্খলা এবং ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে আলবদর খুব তাড়াতাড়ি সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থী দল হিসেবে পাকিস্তানী বাহিনীর নজরে পড়তে সক্ষম হয়। এছাড়া এদের মূল উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাকারী সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ায় পাকবাহিনী এদেরকে দিয়ে তাদের নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীবীদেরকেও নির্যাতন ও হত্যা করার কাজ করিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেপ্টেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা পেশের পর পরই সরাসরি পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যে আল বদরকে সুসংগঠিত করে তুলতে থাকে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে উল্লেখিত নিউ এইজ পত্রিকার রিপোর্টটিতে লেখা হয়- 'আলবদর সংস্থা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি কিছু জানা গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অস্ত্র সজ্জিত দলটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দল জামাতে ইসলামীর দোসর। আলবদর বাহিনীর সদস্যদের (প্রধানতঃ ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের তরুণরাই এর অন্তর্ভূক্ত) মাথায় এই কথাটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী ও ভারতীয় চরদের দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

'বিগত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জনপ্রিয় গেরিলা তৎপরতা যখন চরমে পৌছে, তখন পাকিস্তানী জেনারেলরা স্থানীয় পুলিশের ওপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাকবাহিনীর সেনাপতির ডায়েরিতে লিখিত বক্তব্য থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়-'পুলিশ বাহিনীকে উঠিয়ে নিতে হবে। আলবদরকে ব্যবহার করতে হবে- তাদেরকে অবশ্যই উত্তম অস্ত্র দিতে হবে।

এ সময় আলবদর বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত দলিলটি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়তা হতে পারে আশায় এই দলিলটিও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো। সংগ্রাম পত্রিকার ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যার 'সম্পাদক সমীপেষু,' কলামে জনৈক আলবদর কমান্ডারের লেখা এই পত্রটি নিম্নরূপ

'জনাব,

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'আলবদর' বাহিনীর নাম আজ প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে পৌছে গেছে। গত ২৭ জুন জামালপুর মহকুমায় আলবদর বাহিনী গঠিত হবার পর আজ সমগ্র মোমেনশাহী জেলা ও প্রদেশের আরও দু'একটি জেলায় এর কাজ শুরু

হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আলবদর বাহিনীর পাকিস্তানবাদী ইসলামীপন্থী দেশপ্রেমিক ছাত্রদের দ্বারা গঠিত। এতে ইস্কুলের ১২ বছরের ছেলে থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র রয়েছে।

'যত দূর জানা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জামালপুর মহকুমাতেই পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ৪০% থেকে ৫০% ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। জামালপুর মহকুমার শেরপুর, নলিতাবাড়ি, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুর শহরে দুষ্কৃতিকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

'জামালপুরের বিভিন্ন জায়গায় সীমান্তবর্তী এলাকায় আলবদর বাহিনী সাহসিকতা ও সাফল্যের সাথে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবেলা করেছে। আলবদর বাহিনীর তৎপরতা দেখে ভারতীয় অনুচর নাপাক বাহিনীর লোকেরা জামালপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে ক্রমাগত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আলবদর বাহিনীর বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিটি ছেলেই শিক্ষিত এবং নামাজ পড়ে। ধন সম্পদ ও নারীর প্রতি কোনো লোভ নেই। বদর বাহিনীর গত তিন মাসের কাজে কোনো চরিত্রগত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়নি। এজন্যেই জনগণের কাছে বদর বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মোমেনশাহী জেলার জনগণের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় নাম আলবদর। জামালপুরে রাজাকার, পুলিশ, মুজাহিদ ও রেঞ্জাররা পুল ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাহারা দিচ্ছে আর পাক ফৌজ ও আলবদর বাহিনী অপারেশন করছে।

'আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থী ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাচ্ছি সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে দ্রুত প্রদেশের সর্বত্র আলবদর বাহিনী গঠন করতে। বদর বাহিনী ছাড়া শুধু রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে রাজাকার, বদর বাহিনী বা মুজাহিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা সবাইকে মনে করি সমান। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তার দালালদের শায়েস্তা করতে আজ তাই প্রদেশের সর্বত্র আলবদর বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন।

দেশের বর্তমান এ নাজুক ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যত তাড়াতাড়ি আলবদর বাহিনী প্রদেশের সর্বত্র গঠন হয় ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল। আল্লাহ আমাদের তার পথে কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মোহাম্মদ আব্দুল বারী

ইনচার্জ, আল বদর ক্যাম্প, ইসলামপুর থানা,

মোমেনশাহী ও প্রচার সম্পাদক, জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটি'

স্বাধীনতার পর আব্দুল বারীর ব্যক্তিগত ডায়েরিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১০ মার্চ ১৯৭২ দৈনিক ইত্তেফাক মুদ্রিত ডায়েরির প্রধান প্রধান বিবরণগুলি হচ্ছে' :

'টাঙ্গাইলে Successful Operation হয়েছে। হাজার দেড়েকের মতো মুক্তিফৌজ মারা পড়েছে আলবদর ও আর্মিদের হাতে।'

1. Haider Ali 2. Nazmul Hoque. Rs. 2500.00

তিতপল্লার শিমকুড়া গ্রাম-জাব্বারের কাছ থেকে ২০/১০/৭১ (তারিখে) আর তিন হাজার নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।...

"26-10-71........Prostitution Quarter

24-10-71.Raping Case ......Hindu Girl"

সম্পাদক সমীপে আবদুল বারীর বক্তব্য এবং তার ডায়েরির বিষয়বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য ইসলামের ধ্বজাধারী দালালদের তৎকালীন এবং বর্তমান মিথ্যাচারের স্বরূপ প্রকাশে উপযোগী বিবেচিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে ২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চিফ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আশরাফুজ্জামানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আলবদর কমান্ডাররা অর্ন্তভূক্ত হয়। বর্তমানে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরার সদস্য শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল-১। মোস্তফা শওকত ইমরান ২। নূর মোহাম্মদ মল্লিক ৩। এ. কে. মোহাম্মদ আলী ৪। আবু মো. জাহাঙ্গীর ৫। আশরাফুজ্জামান ৬। আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস ৭। সর্দার আবদুস সালাম।

নভেম্বরের প্রথমার্ধে এভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার তোড়জোড় সম্পন্ন হয়। এ সময় থেকেই আলবদর নেতারা প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ারী দিতে থাকে। ৭ নভেম্বর সারাদেশে মহাঘটা করে পালন করা হয় আলবদর দিবস। এই উপলক্ষে জামাতে ইসলামী এবং ছাত্র সংঘ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। নাখাল পাড়া আদর্শ শিক্ষায়তনে তেজগাঁ থানা জামাতে ইসলামী প্রধান মাহবুবুর রহমান গুরহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল খালেক বলেন, 'পাকিস্তানে অনৈসলামী মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলামবিরোধী শক্তির সর্বতোমুখী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের জীবনকে বাতেল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্তমান প্রতীক হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। এ জন্য আলবদর বাহিনীর মতো পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য ভুলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।'

আলবদর দিবসে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মসূচির বর্ণনা দিয়ে ৮ নভেম্বরের দৈনিক সংগ্রামে লেখা হয়-'আলবদর দিবসে প্রদেশের জিন্দাদিল তরুণ সমাজের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। তারা একবাক্যে ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর মানচিত্রে মানবতার দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আলবদরের অনুপ্রেরণা দিয়েই আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব।

'আলবদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র-গণ মিছিল বের করা হয়। পবিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথম আলবদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের পদভারে রাজধানীর রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। মিছিলকারী জিন্দাদিল তরুণরা 'বীর মোজাহিদ অস্ত্রধর, ভারত ভূমি দখল কর' 'দুনিয়ার মুসলমান এক হও' 'ভারতীয় দালালদের খতম কর' 'হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্তান' 'হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এক হও' 'ইসলামের সমাজ কায়েম কর' 'আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে' প্রভৃতি শ্লোগানে রাজধানীর রাজপথ মুখরিত করে তোলে।

'পূর্বাহ্নে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে, এক বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ও সমাবেশে সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী বক্তৃতা করেন।

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন, 'এ দেশের তৌহিদবাদী মানুষ মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। দুনিয়ার মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে মুছে ফেলা না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরাম নেই।

'হিন্দুস্তানের সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে জনাব মুজাহিদ বলেন, 'আগামীকাল থেকে কোনো লাইব্রেরি হিন্দুদের ও হিন্দুস্তানি দালালদের বই-পুস্তক বেচাকেনা করতে পারবে না। আগামীকাল থেকে কোথাও হিন্দু ও হিন্দুস্তানি দালালদের বই-পুস্তক বেচাকেনা হতে দেখলে তা ভস্মিভূত করা হবে।

'পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রধান ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় দালালরা পাকিস্তানবাদী স্বেচ্ছাসেবীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাচ্ছে। এদের মুখ আমরা চিনি। তিনি জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান।'

'তিনি বলেন, পাকিস্তান শুধু এখানকার মুসলমানদের জন্যই গঠিত হয়নি। পাকিস্তান বিশ্ব মুসলিমের আশ্রয়স্থল। দুনিয়ার মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানকেই বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দিল্লির বুকেই বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

'পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্র সংঘের নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী তার বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তানীরা কোনো অবস্থায়ই হিন্দুদের গোলামী বরণ করতে প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও দেশের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখবো। সমাবেশ শেষে এক জঙ্গী মিছিল বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে সমাপ্ত হয়।'

এ সময় সম্ভবত বুদ্ধিজীবী হত্যা চক্রান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ৭ নভেম্বর তারিখেই প্রাদেশিক ছাত্র সংঘ প্রধান আলী আহসান মো. মুজাহিদ সংঘের প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এরা হলো-মুহম্মদ শামসুল হক

(ঢাকা শহর), আব্দুল হাই ফারুকী (রাজশাহী জেলা), সরদার আব্দুস সালাম (ঢাকা জেলা), মোস্তফা শওকত ইমরান (ঢাকা শহর), মতিউর রহমান খান (খুলনা), মীর কাশেম আলী (চট্টগ্রাম), আব্দুল জাহের মুহম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম), আশরাফ হোসেন (মোমেনশাহী)। দু'জন মনোনীত সদস্য ছিল এ.কে. মুহম্মদ আলী (ঢাকা শহর) এবং মাজহারুল ইসলাম (রাজশাহী জেলা)।

বিভিন্ন জেলা সদরে নিযুক্তি প্রাপ্ত এই নেতারা ছিল স্ব-স্ব জেলার আলবদর প্রধান। বিভিন্ন বিভাগে বুদ্ধিজীবী অপহরণের কার্যক্রম এরাই পরিচালনা করেছিল। ঢাকা শহরে আলবদরের প্রধান জল্লাদ আশরাফুজ্জামান খানের উদ্ধারকৃত ডায়েরিতে মুহম্মদ শামসুল হক ও শওকত ইমরানের নাম লিখিত হয়েছিল শহর আলবদর প্রধান হিসেবে। এই ডায়েরিতেই লিখিত ছিল নিহিত বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা।

১৪ নভেম্বর তারিখে সংগ্রাম পত্রিকায় আলবদর সর্বাধিনায়ক (বর্তমানে জামাতে ইসলামীর আমীর) মতিউর রহমান নিজামী 'বদর দিবস, পাকিস্তান ও আলবদর' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয়তে লেখেন, 'বিগত দু'বছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশি।...

হিন্দুবাহিনীর সংখ্যা শক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রেও তারা পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুসজ্জিত। দুর্ভাগ্যবশ্যত পাকিস্তানের কিছু মুনাফিক তাদের পক্ষে অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদেরকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের মুকাবিলা করেই-তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে; শুধু পাকিস্তান রক্ষার আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালিয়েই এ' পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না।

'বদরের যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখবার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকরা কেউ পেশাদার বা বেতনভুক সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক, তারা সবাই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, ঈমানের তাগিদেই তারা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিরাট শক্তির মুকাবিলায়। বৈষয়িক কোনো স্বার্থই ছিল না তাদের সামনে। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী-এই ছিল তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ। ঈমানের পরীক্ষায় তারা ছিলেন উত্তীর্ণ। সংখ্যার চেয়ে গুণের প্রাধান্য ছিল সেখানে লক্ষণীয়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের লেশমাত্র ছিল না তাদের মাঝে। এক রসুলের নেতৃত্বে তারা সবাই ছিলেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছিল তাদের সম্বল। আর আল্লাহর সন্তোষ ছিল তাদের কাম্য। আজকের কাফেরদের পর্যুদস্ত করতে হলে আমাদের মধ্যেও অনুরূপ গুণাবলীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটাতে হবে।'

'আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী

গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসিলম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি।

আল বদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ সেই সব গুণাবলী আমরা দেখতে পাব।'

'পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আলবদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, যাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতি ও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর পরই প্রাদেশিক ছাত্র সংঘ সভাপতি আলী আহসান মো. মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে 'সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য দেশের দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি আহ্বান জানান।'

এ সময় থেকেই দেশের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয়ে যায়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার জন্য হুঁশিয়ারী দেওয়া আল বদরদের চিঠিও এ সময় এসে পৌঁছতে থাকে। এই চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ :

শয়তান নির্মূল অভিযান
শয়তান,
ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পা-চাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তম আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনোটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুঁশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।-শনি

এই সময়ই পাকবাহিনী আলবদরের কেন্দ্রীয় কমান্ডারদের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে চূড়ান্ত 'ব্রিফিং' করে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটির অস্থায়ী দপ্তর ঢাকা প্রেসক্লাবে পাকবাহিনীর সাথে আলবদরের যোগাযোগের বহু দলিল সংগৃহীত হয়। একটি দলিল ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঢাকার আলবদর ক্যাম্পের নামে ইস্যু করা একদিনের নির্দেশ। এই দলিল থেকে বুঝা গিয়েছিল এ সময় পাক সেনাবাহিনীর এই ক্যাম্পকে হত্যার উপকরণ, যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। পাক সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই খুনীদেরকে হত্যা কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এতে কোনো এক ক্যাম্পে ক্লাশ অনুষ্ঠানের সময়সূচিও

দেখা গিয়েছিল। এ সমস্ত মস্তিষ্ক ধোলাই ক্লাসের সমস্ত লেকচারই উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনা অফিসাররা দিতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

২ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপ-ইউনিটগুলো পূনর্বিন্যাস করা হয় এবং আটক করা, নিপীড়িন করা ও হত্যা করা প্রভৃতি কাজে আলাদা আলাদা ইউনিট সমূহকে নিযুক্ত করা হয়।

আলবদর বাহিনীর হত্যাকারীদেরও এ সময় বিভিন্ন ইউনিট বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় অপহরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপহরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীর বাড়িতে হানা দিতে হবে তার আলাদা আলাদা লিস্ট এদের হাতে দেওয়া হয়।

৪ ডিসেম্বর শুরু হয় বুদ্ধিজীবী অপহরণের উদ্দেশ্যে আরোপিত সেই কার্ফু এবং ব্ল্যাক আউট। এ দিন থেকে ঢাকা শহরে আলবদর বাহিনী 'গণসংযোগ অভিযান' শুরু করে। আলবদর ব্যানার শোভিত জীপে মাইক লাগিয়ে আলবদররা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'দাঁত ভেঙ্গে দাও, দাঁত ভেঙ্গে দাও হানাদার হিন্দুদের', 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালালেরা, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার', 'ইসলামের শত্রুরা, হুঁশিয়ার সাবধান', 'ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান' ইত্যাদি ধ্বনি দেয়। পুরনো ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, নাজিরাবাজার, বংশাল এবং নতুন শহরের নিউ মার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, মোহাম্মদপুর প্রভৃতি এলাকায় তারা পথসভার আয়োজন করে। এ সমস্ত সভায় ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে আলবদরদের প্রস্তুত থাকতে বলে।

এ উপলক্ষে ছাত্র সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে হানাদার হিন্দুস্তানি বাহিনীর আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, 'এবার ও হিন্দুস্তান তস্করের ন্যায় পাকিস্তানের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। ইতিমধ্যেই হিন্দুস্তানের সাথে আমাদের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাতে আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছি।

'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তানি হামলাকে সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করার জন্য আমরা মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

'হিন্দুস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে এসে হিন্দুস্তান নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের গতকালের বেতার ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরাও ঘোষণা করছি যে, এদেশের ছাত্র-জনতা '৬৫ সালের মতোন এবার ও ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাবে।

আমাদের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য যে, মুসলমান কোনো দিন পরাজয় বরণ করেনি। এবারও ইনশাআল্লাহ্ আমরা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে ইসলামের বিজয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাব।

পরিশেষে এদেশের ১২ কোটি তৌহিদী জনতাকে বলি, কোরআনের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এক হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে সৈনিকের ভূমিকা পালন করে দুশমন হিন্দুস্তানের ওপর মারণ আঘাত হানুন।' ডিসেম্বরের প্রথম দশদিন এভাবে বুদ্ধিজীবী নিধনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সেই অতি নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য আলবদররা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা শুরু করে ১০ ডিসেম্বর থেকেই। কার্ফু এবং ব্ল্যাক আউটের মধ্যে জিপে করে আলবদররা দিনরাত বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদেরকে প্রথমে সারা গায়ে কাদা মাখানো একটি বাসে তোলে। এরপর বাস বোঝাই বুদ্ধিজীবীসহ নানা স্তরের বন্দিকে প্রথমে মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আলবদর হেড কোয়ার্টারে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা অনেক বন্দিকে কাকরাইল মসজিদ, ধানমন্ডি হাইস্কুল এবং এম. এল. এ হোস্টেলের আলবদর নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আলবদরদের এই অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিত হয় কোনো আলবদর কমান্ডার নতুবা পাকিস্তানী বাহিনীর অনধিক ক্যাপ্টেন মর্যাদার কোনো অফিসার। সম্ভবত পাকবাহিনীর নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীবীদের অপহরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যই পাক সেনা অফিসার অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিত।

অপহরণের সময় বুদ্ধিজীবীদের যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, আলবদররা তাঁদেরকে সে অবস্থায়ই ধরে নিয়ে যায়। কাউকে গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে, কাউকেবা দুপুর বেলায় খাবার টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লুঙ্গি, গেঞ্জি, যিনি যে পোশাক পরে ছিলেন, সেই পোশাকেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণের পর পরই গামছা বা পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে প্রত্যেকের হাত পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়।

আলবদর হেড কোয়ার্টারে রেখে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গভীর রাতে বাস ভর্তি করে বুদ্ধিজীবীদেরকে রায়েরবাজার ইটখোলায় নিয়ে গিয়ে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

আত্মবিস্মৃত, অকৃতজ্ঞ আমরা আলবদরের এই সমস্ত উন্মাদ খুনিদের পুনর্বাসিত হতে দিয়েছি তাদের সাংগঠনিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে। আজকের ইসলামী ছাত্র শিবির এবং ৭১-এর ইসলামী ছাত্র সংঘের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু নামের শেষের একটি শব্দের পরিবর্তন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আলবদরদের শিবির ছেড়ে মূল সংগঠন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান ছাড়া।

৭২ থেকে মোটামুটিভাবে ৭৫ সাল পর্যন্ত আলবদর নেতারা আত্মগোপন করেছিল। গোপনে গোপনে চলছিল সংঘের পুনর্গঠনের কাজ। অর্থ সংস্থানের জন্য

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে 'বাংলাদেশে ইসলামী পন্থীরা নির্যাতিত হচ্ছে' এই ধুয়া তুলে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। জামায়াত ও আলবদরের সবচেয়ে জঘন্য খুনীদের কয়েকজন আজও এ সমস্ত দেশে উচ্চ পদে আসীন হয়ে আছে। এ সময় তাদের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা 'মওলানা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সিরাত মাহফিল, আজিমুশ্বান জলসা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদিতে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াজ করতে থাকে। ৭২-এর জানুয়ারি মাসেই আলবদরের খুনিরা ছদ্মবেশে তবলীগ জামাতে ঢুকে প্রচারণা শুরু করে। ৬ ফেব্রুয়ারি '৭২ দৈনিক আজাদের 'বদর বাহিনী তবলগে ঢুকে পড়েছে' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, এ সময় ওরা ৬০টি তবলীগ দল গঠন করে সারা বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা করেছিল। ৭৭ সালের শুরু পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে আলবদরদের সংগঠিত করার কাজ।

এরপর, ১৯৭৭ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সিদ্দিক বাজার কম্যুনিটি সেন্টারে একাত্তরের আলবদর হাইকমান্ডের নেতৃত্বে আলবদরদের নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার সময় পরিবর্তন হিসেবে শুধু কুখ্যাত ইসলামী ছাত্র সংঘ থেকে সংঘ বাদ দিয়ে জুনিয়ার আলবদরদের সংগঠন 'শাহীন শিবির' থেকে 'শিবির শব্দটি' জুড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া পতাকা, মনোগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই ছিল অবিকল ইসলামী ছাত্র সংঘের। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বভাবত ধর্মভীরু, ছাত্র সংঘের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও তরুণকে এরা দলভূক্তি করতে সক্ষম হয়।

১৬ ডিসেম্বরের পর হাতেগোনা মাত্র দশ-বারো জন আলবদর খুনি দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছিল। ৭১ থেকে ৭৭ এই ৬ বছরে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের। এছাড়া স্বাধীনতার পর ছাত্র সংঘের অবাঙালি কয়েকজন কর্মী পাকিস্তান চলে যেতে সমর্থ হয়। আলবদর হাইকমান্ডের অধিকাংশ সদস্যসহ বাদবাকি সমস্ত আলবদর নামধারী ছাত্র সংঘকর্মী ছাত্র শিবিরে যোগ দেয়। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের জন্য অন্য কোনো দলে যোগদান বা অনুপ্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ। এ কারণেই, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গণহত্যায় নেতৃত্ব দানকারী অন্যান্য দল বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং এদের অনেক নেতা ও কর্মী পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন দলগুলিতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ৭৭ সালে পুনরুত্থিত ইসলামী ছাত্র শিবির ছিল একেবারে অভগ্ন ৭১-এর আলবদর বাহিনী। এদের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবই ৭১-এর ছাত্র সংঘের অবিকল অনুকৃতি।

ছাত্র শিবির এবং জামায়াতে ইসলামীতে অন্তর্ভূক্ত সমস্ত আলবদরের পরিচয় দেওয়া এই পরিসরে সম্ভব নয়, তবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যারা ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে আজকের শিবিরই একাত্তরের আলবদর।

এদের মধ্যে আলবদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদের ৭১ সালের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে। জামায়াতের রাজনীতির প্রকৃতিই হচ্ছে ধাপে ধাপে কর্মী গড়ে তোলা; বয়স অনুযায়ী শাহীন শিবির, ইসলামী ছাত্র শিবির এবং জামায়াতে ইসলামীর মূল দলে

কর্মীরা অন্তর্ভূক্ত হয়। এর প্রথম দু'টি স্তরে যে কোনো একটির কোনো কর্মীর বয়স বাড়লে তাকে পরবর্তী স্তরে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠার সময় উপরোক্ত দু'জন ছাত্র সংঘ নেতা শিবিরে যোগ না দিয়ে পরবর্তীতে সরাসরি জামায়াতে যোগ দেয়। বর্তমানে দু'জন যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামীর সহ্ সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা শহর আমীর।

ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মীর কাসেম আলী ছিলেন আলবদর হাই কমান্ড সদস্য, চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্র সংঘ সভাপতি এবং চট্টগ্রাম জেলা রাজাকার ও শহর আলবদর বাহিনী প্রধান। 'পুনর্বাসিত রাজাকার, আলশামস ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' অধ্যায়ে কিভাবে তিনি শান্তি কমিটির সভায় বক্তব্য পেশ করেন তা উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর এবং রাবিতাই-আলম আল ইসলামীর বাংলাদেশ শাখার পরিচালক। ছাত্রশিবিরের দ্বিতীয় সভাপতি কামরুজ্জামান ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক, ইতিপূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক।

ছাত্র শিবিরের তৃতীয় সভাপতি আবু তাহের ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র সংঘ সভাপতি দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং জেলা আলবদর বাহিনী প্রধান।

বস্তুত এভাবে তালিকা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন নেই। এখানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যেক ইউনিটের প্রায় প্রত্যেকটি নেতা একাত্তরের খুনি আলবদর। শেষে আলবদর হাইকমান্ডের কে কোথায় আছে সেই তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

এই খুনিরাই বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী। এদের নৃশংতার পরিচয় কিছু কিছু ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে; তবু আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলার জন্য এখানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৯৮০-৮১ সালের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক মঞ্জু কিভাবে ১৯৭১ সালে বাঙালি নির্যাতনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সামান্য বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

এনামুল হক মঞ্জু ৭১ সালে ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ইসলামী ছাত্র সংঘ সভাপতি এবং আলবদর প্লাটুন কমান্ডার। চট্টগ্রাম শহরের টেলিগ্রাফ হিল রোডের হোটেল ডালিমে ছিল তার অফিস এবং নির্যাতন কেন্দ্র (হিন্দুদের কাছ থেকে ভবনটি কেড়ে নিয়ে এর মুসলিম নামকরণ করা হয়েছিল)। এই নির্যাতন কেন্দ্রে কিভাবে বন্দি অবস্থায় বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দেবার জন্য ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'হানাদারদের নির্যাতন কক্ষে' প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে-'এ বন্দি শিবিরে যাদের আটক রাখা হতো তাদের প্রথম তিনদিন কিছুই খেতে দেওয়া হতো না। এ সময় যারা পানি চাইত-তাদের বেশির ভাগকে দেয়া হতো মানুষের প্রস্রাব। কাঁচা নারকেলের পুরনো খোলসে করে যেদিন আমাকে পানি হিসেবে তারা খেতে দিল এতটুকু পানীয়, তখন আমি ভেবেছিলাম হয়তোবা অপরিষ্কার কোনো নালা-নর্দমার পানি হতে পারে। প্রতিদিনের ঘড়ি ধরা বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক নির্যাতনের ফলে শরীরের অবস্থা এমন

হয়েছিল যে, আর কিছু খেতে ইচ্ছা না হলেও মধ্যে মধ্যে পানির তেষ্টায় বুক ফেটে পড়তে চাইতো। তাই পানি চাইতাম আর তারা এনে দিত এ জাতীয় জলীয় পদার্থ। প্রথম দিন মুখে দিতেই ধরা পড়ে যায়, তাই গলাধঃকরণের আগে ফেলে দিয়েছিলাম। সে জন্য আরও কিছু শাস্তি সে মুহূর্তেই আমার ওপর পড়ল। এরপর আর পানি খেতাম না।

আলবদরের বন্দি শিবির চট্টগ্রামের 'হোটেল ডালিম' থেকে ১৭ই ডিসেম্বর খালাস পেয়ে পশ্চিম মাদারবাড়ির জনাব আবুল কাশেম পেশকারের ছেলে ১৮ বছর বয়সের নজমুল আহসান সিদ্দিকী (বাবুল) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এসব কথাগুলো বলেছিল।

'হোটেল ডালিম' চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম অফিসের পেছনে অবস্থিত। শত্রু বাহিনীর বর্বর পশুরা হোটেলটিকে দখল করে আল-বদরের বন্দি শিবির হিসেবে ব্যবহার করতে ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাবুল জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনশ' লোক ১৭ তারিখে ঐ হোটেলটির বিভিন্ন কামরা থেকে মুক্তি পেয়েছে। ১৭ তারিখের আগে ঐ হোটেল থেকে কত লোককে নরখাদকরা হত্যা করেছে বাবুল তা বলতে পারেনি। তবে সে বলেছে, প্রতিটি সিঙ্গেল রুমে ১০ থেকে পনের জন লোককে চোখ বেঁধে আটক করে রাখা হতো। ফলে একই রুমে কোনো পরিচিত লোক থাকলে তাকেও কথা না বলে চিনবার জো ছিল না, সুতরাং প্রতিটি রুমে আটক লোকসংখ্যা ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন ছিল। প্রত্যেকটি রুমের সামনে ছিল সশস্ত্র পাহারাদার। সময় হলেই তারা এসে নির্যাতন চালিয়ে যেত।

'বাবুল বলল, মধ্যে মধ্যে রুমের ভেতর নতুন কণ্ঠস্বর ও শুনতাম আর কোনো কোনো সময় পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে না পেয়ে ভাবতাম, সে হয়তো নেই। দিনের বেলা একটু নির্যাতন বন্ধ করা হতো। রাতের বেলা প্রায় সারাক্ষণই নির্যাতন চালানো হতো। অনেক সময় রাত-দিন আলাদা করে নিতেই পারতাম না। কারণ চোখে তো আর আলোর কোনো প্রতিফলন পড়ছে না। যা খেতে দিত তাই খেতে হতো-কেবল পানি ছাড়া। কারণ না বললে কেউ পানি দিত না।

'সারারাত কেবল হোটেলময় মানুষের আর্তচিৎকারই শুনা যেত। সম্ভবত এ সব শব্দ বাইরে প্রকাশ হতো না।

'কি কি ধরনের শাস্তি দেয়া হতো জিজ্ঞাসা করলে-বাবুল চুপ করে যায়। শুধু বলে-সব রকমের শারীরিক শাস্তি। জিজ্ঞেস করলাম যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের সবাই কি অক্ষত ছিল? সে বললো-'না'। অক্ষত কেউ আসতে পারেনি। সবাইকে কিছু কিছু স্থায়ী নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে আসতে হয়েছে। যেমন, কারো শরীরের হাড়ভাঙ্গা, কারো আঙ্গুল কাটা অথবা কারো এক চোখ, এক কান, এক হাত বিনষ্ট ইত্যাদি। বাবুল জানাল তার একটি পা এবং কয়েকটি আঙ্গুলে ভীষণ লেগেছে। তবে একেবারে বিনষ্ট হয়ে না গেলেও স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগবে।

'বাবুল জানায় যে, মধ্যে মধ্যে হোটেলের অভ্যন্তরে গুলির শব্দ শোনা যেত। কিন্তু সে গুলি কেন বা কি ব্যাপারে তা তাদের জানবার উপায় ও অবকাশ ছিল না।

মুক্ত হবার পর সে দেখেছে, হোটেলের একটি রুম খালি ছিল এবং সে রুমের দেওয়াল এবং মেঝেতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু রক্তকণিকার ছাপ রয়েছে। সম্ভবত এ রুমে পর্যায়ক্রমে লোকদের এনে গুলি করে হত্যা করে তারপর অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হতো।

'১৭ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত হবার পর বাবুল বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এসে চারদিন যাবৎ কারো সাথে কোনো কথা বলতে পারেনি। শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের দরুন স্বভাবতই সে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করেছিল। তদুপরি তার যেন খানিকটা মানসিক বিকৃতিও ঘটেছে বলে সবাই ধারণা করছিলেন। চারদিন পর সে প্রথম কথা বলেছিল, 'আমি গোসল করবো।' তারপর থেকে দু-চারটি কথা সে বলতে থাকে। কিন্তু তার ভেতর বেশির ভাগ কথাবার্তা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মনেরই অভিব্যক্তি বলে সবাই আশংকা করছেন। আজও বাবুল ঘুমের ঘোরে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে ওঠে। সামান্য শব্দেও সে আতংকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।'

মূল জামায়াতে ইসলামীতে পুনর্বাসিত খুনি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য এখানে তথাকথিত মওলানা এ.বি. এম. খালেক মজুমদারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে।

সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার হত্যা মামলার প্রধান আসামি এ.বি.এম. খালেক মজুমদার ১৯৭১ সালে ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ইতিমধ্যে শহীদুল্লা কায়সারের আলবদর বাহিনীর শিকারে পরিণত হবার খবর জানার পর স্থানীয় কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন শহীদুল্লা কায়সারের বাড়িতে গিয়ে জানান, স্থানীয় খালেক মজুমদার কয়েক দিন আগে তাঁর কাছে শহীদুল্লা কায়সারের ঠিকানা এবং তিনি রাত্রে কোথায় থাকেন জানতে চেয়েছিল। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ছোট [illegible] গেরিলা বাহিনী খালেককে রামপুরার টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছাকাছি একটি গোপন আড্ডা থেকে গ্রেফতার করে। খালেককে আটক করার পর ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে শনাক্ত করেন।

গ্রেফতারের সময় খালেকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১টি পিস্তল, ৪০ রাউন্ড গুলি, বদর বাহিনীর ট্রেনিং সংক্রান্ত কাগজ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ব্যাপারে জামায়াতের সর্বশেষ সার্কুলার, সামরিক ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ অনেকগুলি ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যায়। এছাড়া তার ডায়েরির পাতায় কার্ফু জারি করা সংক্রান্ত একটি স্বাক্ষরবিহীন নোটিশ, অপর পাতায় মীরপুর মোহাম্মদপুর থানার ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানার ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাঁ থানার ব্রিগেডিয়ার শরীফ, সূত্রাপুর থানার ব্রিগেডিয়ার বশির এবং ধানমন্ডি থানার ব্রিগেডিয়ার শফীর নাম পাওয়া যায়। এই সামরিক অফিসাররা বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল।

গ্রেফতারের পর খালেক মজুমদারের স্বাক্ষরকৃত ও পেশকৃত এক বিবৃতিতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আরও ৯ জনের নাম পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এদের অনেকেই সুপরিচিত হওয়ায় সংবাদপত্রগুলি 'সঙ্গত কারণেই' এদের নাম প্রকাশে বিরত থাকে।

এছাড়া খালেকের উদ্ধারকৃত বিভিন্ন কাগজপত্রে আরও দেখা যায় যে, তার সাথে এবং জামায়াতের অন্যান্য নেতার টেলিফোনের বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। উল্লেখ্য, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য তুলে নিয়ে যাবার সময় তাঁদের সবার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

শহীদুল্লা কায়সার হত্যা মামলার রায় থেকে জানা যায় যে, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর পরই কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউটের মধ্যে এ.বি. এম. খালেক মজুমদার আরও ছ'সাত জন আলবদরকে নিয়ে দরজা ভেঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের বাড়িতে ঢোকেন। তাদের পরনে ছিল ছাই রঙের পোশাক, সাদা কাপড়ে মুখ বাঁধা ছিল। হাতে ছিল রিভলবার, রাইফেল এবং স্টেনগান। দলের তিনজন লোক দোতলা থেকে শহীদুল্লা কায়সার এবং তাঁর অনুজ জাকারিয়া হাবিবকে ধরে নিয়ে আসে। এ সময় শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, ছোট বোন শাহানা বেগম, ভগ্নীপতি নাসির আহমেদসহ উপস্থিত সবাই তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য চিৎকার করে অনুনয় করতে থাকেন। এ পর্যায়ে খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গীরা জাকারিয়া হাবিবকে ছেড়ে দিয়ে শহীদুল্লা কায়সারকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং ছোট বোন আলবদরদের বাধা দেন। তখন খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গীরা স্টেনগানের বাঁট দিয়ে ভয়ার্ত আত্মীয়স্বজনকে পিটিয়ে তাদেরকে পথ থেকে সরিয়ে শহীদুল্লা কায়সারকে ধরে নিয়ে চলে যায়।

শহীদুল্লা কায়সার হত্যা মামলায় খালেক মজুমদারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ডিস্ট্রিক স্পেশাল জজ এফ. রহমান আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন, 'আসামি হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকবাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লা কায়সারকে অপহরণ করেছে।' অথচ শাস্তি হিসেবে তাকে মাত্র সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়।

এ.বি.এম. খালেক মজুমদার এখন জামায়াতের একজন কেন্দ্রীয় নেতা ও ধনী ব্যবসায়ী। একজন 'বিশিষ্ট আলেম' হিসেবে ও পরিচিত, জামায়াতের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। সম্প্রতি তিনি তার কারাবাসের দিনগুলি নিয়ে 'শিকলপরা দিনগুলো' নামে লাল মলাটের একটি বই বের করেছেন। বইটির পাতায় পাতায় মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদুল্লা কায়সারের পরিবারবর্গের প্রতি তার উষ্মা ও আস্ফালন লক্ষ্য করার মতো। অক্টোবর ১৯৮৫তে প্রকাশিত এই বইয়ের দুয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো-' ...যখন ১৬ই ডিসেম্বর তাদের (পাক বাহিনী) আত্মগ্লানির ঘোষণা শোনা গেল তখন সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়।...ওখানে (ঢাকা শহর জামায়াত অফিস) গিয়ে বৃত্তান্ত শুনে হতাশায় ছেয়ে গেল সারা মন। শিউরে উঠল প্রতিটি লোমকূপ।'

'দিনের শেষে নেমে এলো রাতের অন্ধকার। আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিদায় নিল সৌভাগ্যের শুকতারা। কয়েক দিন ধরে চলে আসা নিষ্প্রদীপ মহড়ার রুটিন বাতিল হলো। জ্বলে উঠল শহরে বিজলি বাতি।'

ওই রাতে 'আল্লাহতায়ালার কুদরত ও রহস্যের কাছে 'মূর্খদের আত্মসমর্পণের কথা জানিয়ে' খালেক মজুমদারের প্রার্থনার অংশবিশেষ-'হে খোদা! হে মহামহিম! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে উদ্ভূত ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দাও।...খোদাদ্রোহীদের ওপর আমাদেরকে বিজয় বখশিষ কর।'

আত্মগোপন অবস্থা থেকে ধরা পড়া এবং জেলে অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন-'খ্যাতনামা না হলেও এবার আমার অখ্যাত ও কুখ্যাতপনাই আমাকে বিখ্যাত করে তুলেছে।'

জেলখানায় তাঁর প্রার্থনা-'তোমার শত্রুদের (মুক্তিযোদ্ধা) সাথে-খোদাদ্রোহীদের সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তারা (আলবদর) খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার অপরূপ বাগিচার নির্মূল সরোবরে তাদের রক্ত-রঞ্জিত দেহ গোসল দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও। সংখ্যা-স্বল্পতার পরওয়া তো তারা করেনি।'

মুক্তিকামী জনতার বিজয় সম্পর্কে-'হে আহকামুল হাকেমিন! দেশের এ বিপর্যয় অনেকেই ভুল করবে-এ ভুল থেকে মানুষদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। ওদের সমূহ বিজয়ে কারো মনে যেন ওদের ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিকতার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না করে।'

৭২-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আলবদররা জেল ভেঙ্গে পালাতে চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে কয়েকজন আলবদর নিহত হয়। এদের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে-' দেশবাসী জানতে পারেনি তাদের শাহাদাতের প্রকৃত কারণ। তারাও দেখে যেতে পারেনি ভুল উপলব্ধি করার পর তাদের প্রতি জাতির অবনত মস্তকের শ্রদ্ধার দৃষ্টি ও মিনতি ভরা আহবান-'তোমরা বেরিয়ে এসো-শিকল টুটে ফেলো। আমরা ভুল করেছি। জাতির ভাগ্য নির্মাণের কাজে সব শক্তি নিয়োগ করো। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।'

১৬ ডিসেম্বরের পর পত্রপত্রিকায় রাজাকার-আলবদরদের নৃশংসতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে-'সারা দেশে যখন আলবদর-রাজাকারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে বিষোদগার ছড়াচ্ছিল এ দেশের সংবাদপত্রসহ সব প্রচার যন্ত্রগুলো...'[১]

স্বাধীনতাযুদ্ধকে 'একাত্তরের গণ্ডগোল', 'একাত্তরের বিপর্যয়,' মুক্তিযোদ্ধাদের 'খোদাদ্রোহী' রাজাকার 'আলবদরদের 'মর্দে মুমিন' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করে এই বইটি জুড়ে যেভাবে শহীদুল্লা কায়সারের পরিবারের সদস্যসহ মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী জনতা সম্পর্কে অদ্ভূত কুৎসা রটনা করা হয়েছে, তা একাত্তরের গণহত্যায় নিহত অমর শহীদদের তাদেরই খুনি দালালরা আজও কি চোখে দেখে তার অনেক দৃষ্টান্তের একটি হতে পারে।

ধরা পড়ার পর খালেক মজুমদারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র ঢাকার বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানেই বদর বাহিনীর পাঁচশত ঘাতক তৎপর ছিল। অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী চৌদ্দজনের নাম তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

এদেরকে আটক করতে পারলেই হত্যাযজ্ঞের সমস্ত ঘটনা জানা যাবে বলে তিনি তাঁর জবানবন্দিতে জানান। এদের মধ্যে একজনকে তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের

'অপারেশন ইনচার্জ' বলে উল্লেখ করেন। 'অপারেশন ইনচার্জের' সাথে তাঁর শেষ কখন দেখা হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ১৪ ডিসেম্বর সকালবেলা বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য ১৪ ডিসেম্বর ওই সময় শহরে কার্ফু বলবৎ ছিল। তিনি আরও জানান, ঐদিন সকালে 'অপারেশন ইনচার্জ' এবং জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা শহর প্রধান গোলাম সারওয়ার জামায়াত অফিসে আসেন এবং অফিসে রক্ষিত সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে যান। এরপর তাদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি বলে তিনি জানান।

বহির্বিশ্বে জামাতের দু'টি শক্ত ঘাঁটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য এবং সৌদি আরব। খুনি আলবদরদের যারা ১৬ ডিসেম্বরের আগে পরে পালাতে সক্ষম হয়েছিল তারা এই দুই জায়গা থেকেই আজও স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের ইস্ট লন্ডন মসজিদ, বার্মিংহাম সিটি মসজিদ, ম্যানচেস্টার মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে পর্যন্ত ইমামের চাকরি নিয়ে বিশেষত সিলেট জেলার খুনি আলবদররা জামায়াতী সংগঠন 'দাওয়াতুল ইসলামের' মাধ্যমে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই দু'জায়গায় অবস্থানরত আলবদর খুনিদের পরিচয় দেবার জন্য দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন এখন লন্ডনে। একাত্তরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মঈনুদ্দিন এখন লন্ডনে জামায়াত নিয়ন্ত্রিত 'সাপ্তাহিক দাওয়াত' পত্রিকার বিশেষ সম্পাদক। সাংগঠনিক কাজে তিনি প্রায়ই বাংলাদেশ সফর করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিকে চৌধুরী মঈনুদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন ঘাতককে দৈনিক পূর্বদেশে স্টাফ রিপোর্টারের চাকরি দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র অবর্জাভার ভবনে নিয়ে আসা হয়। এখান থেকে চৌধুরী মঈনুদ্দিন 'ইনটেলেকচুয়াল অপারেশন' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ, নির্যাতন এবং হত্যায় নিয়োজিত আলবদরদের পরিচালনা করেন। এছাড়া বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার বশির আহমদ প্রমুখের কাছে বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে দেওয়অ ও ছিল তার দায়িত্ব।

সৌদি আরবে পুনর্বাসিত আলবদরদের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হবে আলবদর হাই কমান্ডের সদস্য আশরাফুজ্জামানের কথা। এই আশরাফুজ্জামান খান ছিল আলবদর বাহিনীর প্রধান ঘাতক। স্বহস্তে গুলি করে সে মীরপুর গোরস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে হত্যা করে বলে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

যে গাড়িতে করে হতভাগ্য অধ্যাপকদের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার চালক মফিজুদ্দিন নামে জনৈক আলবদর আশরাফুজ্জামানকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের 'চিফ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

১৬ ডিসেম্বরের পর ৩৫০, নাখালপাড়ায় আশরাফুজ্জামান যে বাড়িতে থাকত, সেখান থেকে তার ব্যক্তিগত ডায়েরিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ডায়েরিটির দু'টি পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডা. গোলাম মুর্তজার নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের কত নম্বর বাড়িতে তাঁরা

থাকেন তা লেখা ছিল। এই ২০ জনের মধ্যে ৮জন ১৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন। এঁরা হচ্ছেন-মুনীর চৌধুরী (বাংলা), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস), রশিদুল হাসান (ইংরেজি), ড. ফয়জুল মহী (শিক্ষা গবেষণা) এবং ড. মুর্তজা (চিকিৎসক)।

ড্রাইভার মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, আশরাফুজ্জামান খান এঁদের নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল। মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়েরবাজারের বিল এবং মীরপুরের শিয়ালবাড়ির বধ্যভুমি থেকে অধ্যাপকের গলিত বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ডায়েরিতে উল্লেখিত অবশিষ্ট অধ্যাপকদেরও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ডায়েরিতে এছাড়াও যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হচ্ছেন-ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ড. নীলাম ইব্রাহিম (বাংলা), ডা. লতিফ (শিক্ষা গবেষণা), ড. মুনিরুজ্জামান (ভূগোল), ড. কে. এম. সাদউদ্দিন (সমাজতত্ত্ব), এ.এম. এম. শহীদুল্লাহ (গণিত), ড. সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস). ড. আখতার আহমদ (শিক্ষা), জহিরুল হক (মনোবিজ্ঞান), আহসানুল হক (ইংরেজি) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি) এবং কবীর চৌধুরী।

ডায়েরির আরেকটি পৃষ্ঠায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলজন দালাল অধ্যাপকের নাম। এছাড়াও ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন, আলবদর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সদস্য শওকত ইমরান এবং ঢাকা শহর বদর বাহিনীর প্রধান শামসুল হকের নাম।

ডায়েরিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বহু বাঙালিদের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। এঁদের সবাই বদর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এক টুকরো কাগজে তৎকালীন পাকিস্তান জুট বোর্ডের ফাইন্যান্স মেম্বার আব্দুল খালেকের নাম, পিতার নাম, ঢাকার ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা লেখা ছিল। ৭১-এর ৯ ডিসেম্বর আবদুল খালেককে বদর বাহিনী অফিস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে বদর বাহিনী ১০ হাজার টাকা দাবি করেছিল। আবদুল খালেকের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখিয়ে নিয়ে বদর বাহিনী তাঁর বাঁড়িতে যায়। আবদুল খালেকের স্ত্রী সে সময় মাত্র ৪৮০ টাকা দিতে পেরেছিলেন। বাকি টাকা তিনি পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বদর বাহিনীর লোকদের কাছে আবদুল খালেককে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল খালেক আর ফিরে আসেননি।

আশরাফুজ্জামান কয়েকজন সাংবাদিক হত্যার সাথে ও জড়িত ছিল। দৈনিক পূর্বদেশের শিফ্‌ট ইনচার্জ ও সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক আ.ন.ম গোলাম মোস্তফাকেও আশরাফুজ্জামান ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

[সূত্র : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়?* ঢাকা, ১৯৮৭]

পরিশিষ্ট : ২

and the same was treated as written F.I.R. This O/C. took up investigation, examined witnesses and after completion of the investigation submitted Charge sheet against the present two accused persons, namely, Rajab ali and Mvl. Kutub uddin Ahmed, U/s 364 / 302/342/ 379/380 P.C. and the provisions of Bangladesh Collaborators Order, 1972.

The complainant thereupon filed a Narazi petition before the learned S.D.C., Kishoreganj alleging that the I.O. did not arrest or Charge - sheet all the persons against whom he filed the petition of complaint and also made statement before the I.O. but he has submitted charge sheet only against two persons, one of whom was a man of Sylhet whom he does not know and it is not understood under whose advice or instruction the I.O. submitted the Charge sheet against the man of Sylhet. In this Narazi petition he mentioned the name of six persons together with the names of 15 witnesses. It is, however, said that the learned S.D.O, Kishoreganj got this Narazi petition judicially enquired and it was not accepted.

The facts of the prosecution case as it now appears from the deposition of the complainant P.W.1 Chand Mia is that the occurrence took place on 20th Aswin last at early morning time. Accused Al-Badar Rajab ali along with other Razakars and men were proceeding towards the house of the complainant and the villagers who saw them started flying away. The accused Rajab ali wit...

Sd. Rajab Ali

sub - clause (a) of Article 11 of Bangladesh Collabor tors Order, 1972 and the accused Mvl. Kutubuddin Ahmed was Charged U/s 364/109 P.C. read with sub -Clause (a) of Artic -le of Bangladesh Collaborator's Order, 1972. The respective accusations have been read over to both the accused persons and explained in Bengali who pleaded not guilty and claimed to be tried.

The prosecution in all have examined eight witnesses in this case and the accused persons who have been defended separately examined none .

The contention of both the accused persons as it transpires from the trend of cross examination of t the prosecution witnesses is that they were innocent of the guilt and further contention of accd. Rajab ali is that he has been falsely implicated out of grudge and enmity. The accused persons in their examination in chief u/s 342 Cr.p.c also maintained their plea of not guilty and they have stated that the prosecution witnesses deposed falsely and that the accused persons were not Al-Badars or Rajakars.

Points for determination :-

1. Whether the accused Rajab ali @ Aminul Islam being a collaborator committed the offence of kidnapping or abducting Abu Taher Mia in order that he would be murder-ed or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered u/s 364 P.C and also whether he has committed the offence of theft in the

the dwelling house of complainant P.W.1 Chand Mia U/s A x
38? P C.

2) Whether accused Mvi. Kutubuddin Ahmed being a collab-orator has abetted the offence of Kidnapping or abducting as stated above u/s 364/109 P.C.

Findings & Decision.

Point no.1.

With regard to the offence of collaboration and kidnapping of Abu Taher in order to commit murder charged against accused Rajab ali, P.W.1 Chand Mia, the complainant has stated that on 20th Aswin last at early morning time accused Al- Badar Rajab ali along with other Razakars and men came to the house of the complainant, caught hold of his son Abu Taher and others and they started beating them all and thereafter said Abu Taher and other persons were taken to Kachari ghat under arrest. This P.W.1 has further stated that P.W. Jahurul Haque told him that out of many persons taken to Kachari ghat by accused Rajab ali and others, 18 persons were taken to Astagram police station including his son Abu Taher, of whom five persons were killed together with Abu Taher & his son and subsequently the dead body of Abu Taher said to have been thrown in river water. From the cross examination of this P.W.1 on behalf of accused Rajab ali it appears that there were some Civil and criminal cases between one Madhu Mea, 'Fufa' of this accused Rajab ali and this P.W. 1 Chand Mia. This Madhu

6

Mia said to have been also killed after liberation ' and thereby it is suggested on behalf of this accused Rajab ali that due to grudge and enmity the complt. P.W.1 has falsely implicated this accused Rajab ali in this case. Such enmity is not much material in this particular case and we have to see whether as a matter of fact this accused Rajab Ali took away Abu Taher in order to commit murder and from the deposition of this P.W.1 he says that on 29th of Aswin last which is the date of occurrence Abu Taher along with others was taken away from his house by accused Rajab ali and others and subsequently he came to know that Abu Taher was killed and thrown in the river water. Although in his further cross - examination it shows that this P.W. 1 Chand Mia fled away from his house at the time Abu Taher was being taken away by accused Rajab ali and others it has however revealed that he saw the occurrence hiding himself from a reasonable distance.

P.W.2 Amina khatun, the wife of victim Abu Taher says that while Abu Taher was asleep in his hut the Rajakars caught hold of him at his bed and this witness would know that accused Rajab ali also caught hold of and took away Abu Taher, her husband, in tied up condition and she also says that she went up to Kacharighat and requested accused Rajab ali and others to release her husband, Abu Taher but it was in vain and subsequently out of many persons arrested

by accused Rajab ali and others 18 persons including Abu Taher were taken to Astagram Police station. On the following day she says that she heard that her husband Abu Taher was killed and his dead body was thrown in river water. In her cross examination she has stated that she does not remember if he did not name accused Rajab ali before the I.O. but from the evidence of this I.O. P.W.8 no such point appears to have been taken from him by the defence side and as such no material contradiction is found to have occurred in her deposition.

P.W. 3 Lal Banu, a neighbouring woman, has stated that while Abu Taher was asleep he was caught hold of and was taken to custody together with her husband Suruj ali and others on 27th Aswin, Thursday at about 6 or 7 A.M. She said to have also went up to Kacharighat and found so many people arrested there out of whom 18 persons were taken to Astagram police station and on next day they heard that her husband Suruj ali, victim Abu Taher and ten Hindus and another person were killed and their dead bodies were thrown in the river water. This witness in identifying this accused Rajab ali on dock has stated that he was the man with other persons who took away her husband and Abu Taher and others. In her cross - examination when she was suggested that she did not know accused Rajab ali she answered in the the negative and it appears that she could maintain that she knew accused Rajab ali well.

P.W.4 Yakub ali, another man of the locality has stated that on 29th Aswin last Thursday at about 6 A.M. Rajakars came to their village and they were arrested by some 15/16 Rajakars who were armed with rifles and those arrested persons including himself were brought to the house of P.W.1 Chand Mia where the victim Abu Taher was also caught hold of and accused Rajab ali told his party men that this Abu Taher must not be released. Thereafter all of them were taken to Kacharighat where many other persons were also brought under arrest and placed in a line out which 18 persons were retained including victim Abu Taher and others were released. The retained persons were taken to Astagram police station. On the following day they came to know from P.W. Jhurul Haque that Abu Taher, Suruj Ali and three other persons were killed and that their deadbodies were thrown in river water.

P.W.5 Mafizuddin Bhuiyan, an elderly and respectable man of the locality says that on 29 th Aswin last at about 7/8 A.M. Thursday while he was reciting Holy Quaran a Rajakar party men entered into his house being armed with fire arms and they arrested him and his son Jasimuddin Bhuyan and they were taken to Kacharighat and there he found victim Abu Taher, Suruj and others including P.W. Jahurul Haque, Ataul Haque and others. He further says that many other persons were also brought under arrest and they were all made to stand in a line and 18 persons from the said line were taken to Astagram police station ci

including himself, victim Abu Taher and others. This witness goes on saying that he asked accused Rajab ali not to kill his son Jasimuddin when he was released at the police station. Thereafter he passed his night in a nearby house of Astagram police station and on the following morning he was informed that victim Abu Taher and 4 others were killed and their deadbodies were thrown in the river water.

P.W.6 Jahurul Haque has stated that last year on 20th of Aswin between 7 to 8 A.M. he found accused Rajab ali accompanied with others armed with rifles were coming to his house and this P.W.6 and his brother P.W. Ataul Haque were put under guard by two of their men and other persons entered inside their huts for checking. Thereafter he together with his brother Ataul Haque were taken to the Kacharihat where they found about 500 men of different villages there. He also saw that victim Abu Taher, Mir Bayan Ali and others were also brought being tied up condition. Then accused Rajab ali came and they were asked to stand in a line. From the line about 14/15 persons were picked up including victim Abu Taher himself and others and they all were taken by boat to Astagram police Station. In his deposition he has narrated so many things as to how they were taken and where they were kept, etc. which of course, the other P.Ws. who were also taken to Astagram Police Station

did not state. Be that as it may from his deposition this much is clear that this accused Rajab ali as one of the members of Al-Badar or Rajakar arrested victim Abu Taher and and others including himself and [illegible] took them all to Astagram Police station and in the early morning this P.W. 6 was released and on enquiry he came to know that five persons including victim Abu Taher were killed.

P.W. 7 Ataul Haque, brother of P.W.7 Jahurul Haque has stated that on the date of occurrence accused Rajab ali along with 8 to 10 persons being armed with rifles went to their house and they arrested him and his brother P.W.6 and also they were brought to the Kacharighat when they found many other persons also under arrest and out of these arrested persons some 18/19 [illegible] including victim Abu Taher, his brother P.W.6 Jahurul Haque himself and others were taken to Astagram police station. He further says that the O/C of the Police station released him and P.W. Nafizuddin and next day he heard that five persons including [illegible] victim Abu Taher were killed.

P.W.8 Abdul Hali, the S.I. of police who recorded the written F.I.R. and also was the I.O. of this case, has stated that he took up investigation, visited locality, Prepared A [illegible] sketch map with separate index, examined witnesses and submitted charge - sheet against two persons including this accused Rajab ali on 26.2.72 . In his cross
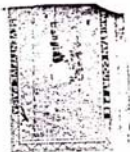
11

cross examination he wants to say that he got no paper to show that accused persons were Rajakars or Al-Badars.

Although no documentary evidence has been produced to show in this case that accused Rajab ali was a collaborator being a member either of Al-Badar or Rajakar organisation but from the evidence of the P.Ws. stated above and from the facts that this accused Rajab ali being armed with rifle arrested so many persons including victim Abu Taher and also it has transpired that the persons who were arrested particularly the victim Abu Taher supported the Awami Leaguers would go to show that this accused Rajab ali and his party men by their action on the date of occurrence must have aided or abetted Pakistan Army forces towards, maintaining, sustaining, strengthening the illegal occupation of Bangladesh. In this connection it may be stated further that the accused Rajab ali and his party men were engaged in operation on the date of occurrence and thereby actively resisted the efforts of the member of public of that locality who were supporting the Bangladesh liberation struggle. However, from the evidence on record as well as from the manners, conduct and action of the accused Rajab ali it is believed that he was a collaborator within the meaning of Bangladesh Collaborators Order, 1972. It would further appear from the facts, circumstances and evidence on record that this accused Rajab ali must have committed the

the offence of kidnapping in order to commit murder of victim Abu Taher u/s 364 P.C. as all the material prosecution witnesses appeared to ~~xxxx~~ have substantially proved ~~xxx~~ the fact that this accused Bajab ali actually took away v victim Abu Taher and subsequently he was known to have been dead. It is true that there is no evidence on record that this accused Bajab ali committed the offence of killing or murder of victim Abu Taher but it has sufficien-tly and beyond all reasonable doubt been proved that this accused ~~xxxxxxxxx~~ Bajab ali kidnapped victim Abu Taher by taking him away with others being armed with rifles in order that said victim Abu Taher may be murdered as it was so found that the deadbody of said Abu Taher was said to have been thrown in the river water immediately after the occurrence and accordingly it is found that this accused Bajab ali was guilty of the offence U/s 364 P.C. read with Bangladesh Collaborators Order, 1972.

Now coming to the charge of Committing theft U/s 380 P.C. the house of complainant P.W.1 Chand Mia against this accused Bajab ali the petition of complaint shows that 100 mds. of paddy worth Rs 2,200/- cash money of Rs 3,700/-, gold ornaments weighing 7 Tolas, worth Rs 400/- four wooden boxes and 2 leather suit case of value of Rs 70/- and 50/- respectively and clothes including Sari worth Rs 500/- were looted away.
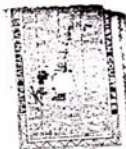
whereas during trial from the deposition of this complainant who has been examined as P.w.1 it appears that six tolas of gold ornaments, 20 mds of rice, two leather suitcases, two wooden boxes were looted away and here we get a sharp contradiction with regard to the articles alleged to have been looted away, between his own petition and deposition :-

The P.w.2, son's wife of this P.w.1 wants to say that one wrist watch, one radio and her gold ornaments, clothes, boxes, etc. were taken away by accused Rajab Ali and his party men and that also by boat and here also we find a new items of articles and other articles, namely, paddy or rice has not at all been stated by her.

P.w.3 Lal Banu and P.w.4 Yakub Ali want to say in general manner that ~~alxx~~ all belongings of the complainant were taken away and they were placed into a boat. "Excepting these witnesses namely, P.ws. 1-4 who are found also inter-related witnesses another other important and ~~indxxxx~~ independent witnesses, namely, P.ws. Mafizuddin, Jahurul Haque and ~~otxxx~~ others appear to have stated nothing about the looting away of the articles from the house of the complainant P.w.1. So, from the above facts, circumstances and evidence on record when there are so many ~~xx~~ discrepancies with regard to the articles alleged to have been looted, and also absence of any such statements of other independent witness

it may be said that the prosecution has not be

to prove the charge of offence that the accused Rajab ali looted away the articles from the house of the complainant and that thereby he could be made liable U/s 380 P.C.So, it is found that the prosecution has failed to prove the charge of offence u/s 380 P.C. against this accused Rajab ali beyond any reasonable doubt.

Point No. 2:-

This point relates to accused Mvi. MKutubod-din Ahmed and we have to see whether he is liable for the offence of abetment of kidnapping victim Abu Taher u/s 364/109 P.C. as a Collaborator under the provisions of Bangladesh Collaborators order, 1972. Admittedly his name is not found in the petition of complaint filed by the complainant. P.W.1 Now treated as a written F.I.R. of this case. It is also not available in the Narazi petition subsequently filed by the complainant stated above. Admittedly this accused did not come with the accused Rajab ali to Kidnap in order to commit murder of victim Abu Taher. There is also no evidence that at the commencement of such kidnapping of victim Abu Taher in order to commit him to murder by accused Rajab ali and others this accused passed order or accompanied Rajab ali and others or that he was any way connected with them. . Then of this accused Mvi. Kutubuddin Ahmed, however, appears the charge sheet filed by the I.O. and during the this case for the first time the complainant P.W.1 w

identifying this accused on dock that Maulavi Shaheb did not allow his son victim Abu Taher and others to be released saying that they ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ were Awami Leaguers and they should not be spared and In this connection he further says that P.W. Jahurul Haque told him this. He again from his further knowledge says that this accused Maulvi Shaheb delivered "Waz" (__ lectures) and used to pass orders against Awami Leaguers and others. In his cross examination he says that he does not know the name of this accused Maulvi Shaheb or even his whereabouts. He admits that the name of this accused was not given in his petition of complaint and he further admits that in his Marazi petition he stated that he got he case against this accused but two accused persons in this case and that he did not know how this accused Maulvi Shaheb would be made an accused in this case and that it was not in his petition of complaint too that this accused Maulvi Shaheb passed any such order not to release his son.

P.W. 2 Amina Khatun, P.W.3 Lal Banu, P.W.4 Yakub Ali and P.W. 5 Hafizuddin Bhuiyan have stated nothing against this accused Kutubuddin.

P.W.6 Jahurul Haque says that while they were ta- to Astagram P.S., the O/C of the said Police Station name be subsequently heard that he was this accused uddin and who asked that victim Abu Taher and other be dealt with at night. In his cross - examination

to say that it is not that he did not state to the I.O. that O./C of Astagram P.S. whose name he subsequently knew was accused Kutubuddin who told that at night they would be dealt with. He has further stated that he stated to the I.O. that the O/C. Shaheb ordered them to keep them in Thana Barak and that the said O/C asked other Rajakars not to illtreat them. This witness wants to say that he was examined by the I.O. after 2/3 months of the liberation in their village home and that he informed Chand Mia, the complainant that his son victim Abu Taher was killed and he narrated the full occurrence to him and he subsequently also met with the complainant and talked with him.

P.W.7 Ataul Haque, brother of P.W.6 says that he could not know the O/C then and now he identifies accused Kutubuddin that he was then O/C . In his cross examination he admits that he did not state to the I.O. that at the order of accused Kutubuddin as O/C .he was released and that he does not remember to have stated to the I.O. that accused Kutubuddin was then O/C of Astagram P.S. and further that he does not now also remember if he did not say to the I.O. that he saw the accused Kutubuddin at the Police station .

P.W.8, the I.O. in his cross - examination on behalf accused Kutubuddin states that P.W.6 Jahurul Haque did state to him that accused Kutubuddin was O/C. and he came know him it later on or that this accused as O/C told that at night they will be dealt

told him that at night they will be dealt with. He also says that the P.W.6 did not state to him that the said C/C told other Rajakars not to illtreat them. With regard to P.W. Ataul Haque the I/O says that P.W. Nurul Haque did not state to him that accused Kutubuddin was O/C of the Police station or that he saw accused Kutubuddin in Astagram police station. This I.O. gives out that P.ws. Jahurul Haque and Ataul Haque, two brothers were detained at Astagram Police station and not at their village home as said by P.W.6 Jahurul Haque. He also admits that there was no mention of accused Kutubuddin in the F.I.R.

In the deposition of P.ws. Jahurul Haque and Ataul Haque against this accused Kutubuddin a sharp and glaring contradictions are found in their own statements before the I.O. which were made immediately after the occurrence and at that time it appears that there was no mentioning of this accused Kutubuddin by any one of these two P.ws. and they even did not know this accused Kutubuddin at all. In this connection the evidence of P.W. Hafizuddin who was an aged and a respectable person of the locality may be referred to and this P.W. had also companied the P.Ws. Jahurul Haque and Ataul Haque and went to the Astagram Police station and further transpires that P.W. Ataul Haque spent his night together with this P.W. Hafizuddin by the side of the Astagram police and it is c... curiously enough that this P.

has stated nothing about this accused Kutubuddin. So, it appears from reasons best known to them these two P.ws. ., namely, Jahurul Haque and Ataul Haque, two brothers, have deposed against this accused Kutubuddin as if on after thought and this can hardly be relied upon. The ~~I.O.~~ I.O. has filed a G.D. Entry Book in this case and from its entry dated 29.8.71 marked Ext 6 it appears that ~~one~~ Mr. Mukhlsur Rahman ~~has~~ written " [illegible]"

~~Ikks~~ It is not understood who was the Daroga Moula-a Kutubuddin or to whom ~~one~~ Mukhlesur Rahman, C/C Astagram Police station made over charges. This I.O. in his cross examination says that in case ~~one~~ makes over the to another ~~xxxxxx~~ the charges as he also is to take over the charges but there is nothing to show that any such taking over of this charges was made. He further says that the ~~xxxxx~~ appointment letters of the S.I.'s and O/C s are available in the Government office and generally in the office but no such papers have been produced and that Mukhlesur Rahman even has not been ~~xxxxx~~ examined in case. The I.O. also says that they got nothing to

about any order of any Army Major or that this accused Kutubuddin if took over the charges of Astagram Thana. He cannot even say who wrote out the diary dated 29.8.71. Thus from this G.D. Entry marked Ext. 6 also it cannot be said that this accused Kutubuddin took over the charge of Astagram Thana as O/C. In view of the above facts, circumstances and evidence on record or in any view of the case it appears that the prosecution has failed to prove beyond any reasonable doubt in this case that this accused Mvi. Kutubuddin Ahmed was an O/C. of Astagram Police station as a member of Bajakars or otherwise and thereby he was a collaborator and as such being a collaborator he abetted the offence of abetment of kidnapping victim Abu Taher in order to murder him and accordingly he is found not liable for the charge u/s 364 /109 P.C. read with Art 11(a) of Bangladesh Collaborator Order, 1972, levelled against him.

In the result of the above findings it is accordingly

Ordered.

That accused Rajab ali is found guilty of the offence 364 P.C. read with Article 11(a) of Bangladesh Collaborator Order, 1972 and he be convicted and sentenced under said charges to undergo transportation for life and This Rajab ali is found not guilty u/s 387 P.C. read wi

11(b) of Bangladesh Collaborators order, 1972 and he be acquitted of said Charge.

The accused Mvi.Kutubuddin Ahmed is found not guilty of the offence u/s 364 / 109.P.c. read with Article 11(a) of Bangladesh Collaborators Order, 1972 and he be acquitted of the said Charges and set at liberty if not wanted in any other case.

Inform the learned Special P.P. and the learned defence lawyers at once.

Dictated & corrected by me.

S/- K.A.Rauf
Tri. J.
30.9.72.

S/- K.A.Rauf.
Judge, Special Tribunal
Court - 111, Mymensingh
30.9.72.

Typed by — Md. Abdul Mannan, 27.1.73
Read by — Comp Asstt 20.1.73
Compared by — Mostafa, Comp Asstt 20.

---

* ১৯৭২ সালের দালাল আইনে আটক, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আলবদর রজব আলী ওরফে আমিনুল ইসলামের বিচারের রায়। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। রায়ের মূল কপির প্রতিচিত্র এখানে ছাপা হলো। মুনতাসীর মামুন সংগ্রহ

গোলাম আযম
সব কিছুর প্রধান

মতিউর রহমান নিজামী
আল বদর প্রধান

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহীদ
উপ-আল বদর প্রধান

কামারুজ্জামান
আল বদর কমান্ডার

আব্দুল কাদের মোল্লা
আল বদর কমান্ডার

মীর কাশেম আলী
আল বদর কমান্ডার

আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকার
আল বদর কমান্ডার

এ টি এম আজহারুল ইসলাম
আল বদর কমান্ডার

বদর বাহিনীর গিয়াস উদ্দিন ও গাজী ইদ্রিস

MOHD. ABDUR RAHMAN

The holder of this Card is a tru
Pakistani. He is working for th
solidarity of Pakistan. He had alway
been fighting against anti-stat
forces. He is dependable.

25-7-71
Ghulam Azam
Member, Working Commi
CENTRAL PEACE COMMIT
East Pakistan
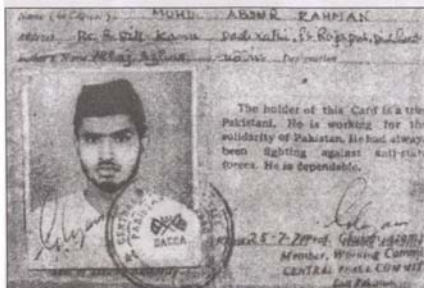
গোলাম আযম স্বাক্ষরিত আইডেন্টিটি কার্ড